بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামে সার্বজনীনতা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

402470

GIFT

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

উপস্থাপনায়

মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট, ২০০৫ ইংরেজি।

Dhaka University Library

402470

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে সার্বজনীনতা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড.মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

402470

উপস্থাপনায়
মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার
এম.ফিল. ২য় বর্ষ
রেজিঃ নং ৯৫
শিক্ষা বর্ষ ২০০১-২০০২
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

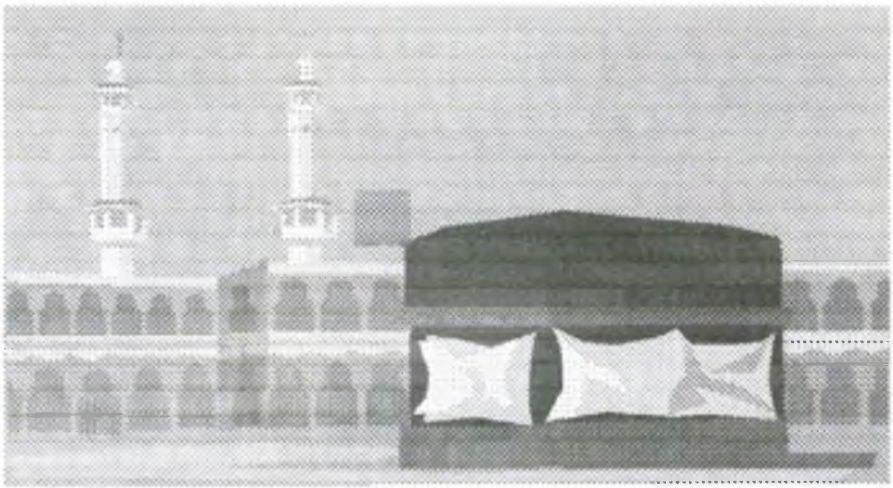

কা'বা শরীফ

402470

ইসলামে সার্বজনীনতা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
তারিখ ঃ ১৮/৮/২০০৫ইং

প্রত্যয়ন পত্র

জনাব মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার-এম. ফিল. ২য় বর্ষ - শিক্ষা বর্ষ ঃ ২০০৩-২০০৪ ; ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তার এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপাত্থাপিত 'ইসলামে সার্বজনীনতা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাধানে ও নির্দেশে লিখিত। এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য কোন গবেষণা সন্দর্ভ লিখিত হয়নি।

এ গবেষণা সন্দর্ভটি এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক ।আমি এর চুড়ান্ত পান্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখেছি এবং এম ফিল .ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্যে অভিসন্দর্ভটি জমা নেয়া যেতে পারে।

১৮/৮/০৫

তত্ত্বাবধায়ক
ড.মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'ইসলামে সার্বজনীনতা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি দীর্ঘ এক পরিশ্রমের ফসল।ইসলাম আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান।আল্লাহ হলেন বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা।একমাত্র রব। অতএব তার বিধানটাও হবে সকল জাতি, গোষ্ঠীর জন্য।ইসলাম শুধু এক গোত্রের জন্য আসেনি,বরং আল্লাহর ঘোষণা ঃ وما ارسلناك الا رحمة للعلمين

(হে নবী) আমিতো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।(সুরা-আম্বিয়া: আয়াত-১০৭) তাই এ শান্তির বাণী গোটা জাতির জন্য।এ মর্মার্থটির উপরই আমার এ অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম।বিষয়টি সংক্ষিপ্ত ভাবে সমাপ্তির রেখা টানতে পেরেছি।এ জন্য ঐ মহান সত্তা বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি; যার অসীম দয়া, করুণা অবিরত ধারায় বর্ষণের ফলে বিষয়টির সাময়িক সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি।সহস্র দরুদ ও সালাম ঐ বিশ্ব বিপ্লবী মহা নায়ক মহামানব মুহাম্মদ (সঃ) এর উপরে যার নেতৃত্বে ইসলামের শান্তির বাণী পৃথিবীতে বিকশিত হয়েছে।শত শত বছর পরও আজও তার প্রণীত বিধান শান্তি প্রিয় জনতার নিকট গ্রহণীয়, অনুকরণীয় হয়ে চির অমর হয়ে রয়েছে,থাকবে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন,মাথার তাঁজ সমতুল্য শিক্ষক জনাব অধ্যাপক ড.মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন স্যারের প্রতি। যাঁর একান্ত পরামর্শ ও সহযোগিতায় অত্র অভিসন্দর্ভটি লিখতে সক্ষম হয়েছি।অত্র অভিসন্দর্ভটি লেখার ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না।তিনি আমার গবেষণা কর্মের জন্য অতুলনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শ্রম স্বীকার করেছেন।কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় মা এবং বড় ভাই মোঃ ইউনুছ হাওলাদার এর প্রতি যাদের উৎসাহ এবং প্রেরণা আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং সফল সমাপ্তির পথে পৌছতে পেরেছি।

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার পরম প্রিয়তমা সহধর্মিনী উম্মে কুলসুম (উর্মি)কে; যার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অভিসন্দর্ভটি সমাপ্তি করতে পেরেছি। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে দিন-রাত বসে বসে আমার লেখার কাজে সহযোগিতা করেছে ।

এ ছাড়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিভিন্ন লাইব্রেরীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি যারা আমাকে বিভিন্ন বই দিয়ে সাহায্য করেছে।অত্যন্ত সম্মানের সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কুড়িগ্রাম জেলা সাব জজ জনাব মোঃ আবদুল্লাহ শহীদ আল-হুসাইন এবং ভোলা পিটিআইর সুপারিন্টেন্ডেন্ট জনাব হারুন অর রশীদ-এর প্রতি যারা আমাকে লেখার ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এ ছাড়াও যারা বিভিন্ন ভাবে আমাকে লেখার কাজে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি।পরিশেষে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব অধ্যাপক ড.মুহাম্মদ রুহুল আমীন স্যারসহ সকল শ্রদ্ধাভাজন স্যারদের প্রতি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি।

মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচীঃ

সঃ	সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
রহঃ	রহমাতুল্লাহি আলাইহ।
রাঃ	রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।
হিঃ	হিজরী
খ্রীঃ	খ্রীস্টাব্দ
ইং	ইংরেজি
ইফাবা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
বা.এ	বাংলা একাডেমি।
খ.	খন্ড
পৃঃ	পৃষ্ঠা
P.	Page
Ed.	Edition
Vol.	Volume.

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্রঃ

১ম অধ্যায় ঃ ভূমিকা..... ১

২য় অধ্যায় ঃ সামাজিক প্রেক্ষাপট..... ৮
১ম পরিচ্ছেদ ঃ নারীর মূল্যায়ন ৯
বিভিন্ন ধর্মে নারীর মূল্যায়ন..... ১০
বাংলাদেশে নারীর মূল্যায়ন/ক্ষমতায়ন..... ২১
বিভিন্ন পার্লামেন্টে নারীর প্রতিনিধিত্ব..... ২৪
ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার ঃ সার্বজনীনতা ২৬
২য় পরিচ্ছেদ ঃ বিবাহ প্রথা ৩৩
বিভিন্ন ধর্ম,আইনে বিবাহ প্রথা..... ৩৪
বাংলাদেশে বসবাসরত ইসলাম ছাড়া অন্য প্রধান জনগোষ্ঠীর বিবাহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি..... ৪০
সার্বজনীন আদর্শ..... ৪১
৩য় পরিচ্ছেদ ঃ বহুবিবাহ..... ৪৪
বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে বহুবিবাহ..... ৪৪
বাংলাদেশে বহু বিবাহ ৪৯
সার্বজনীন আদর্শ..... ৫১
৪র্থ পরিচ্ছেদ ঃ নারী নির্যাতন ৬০
নারী নির্যাতন কি?..... ৬১
অন্যান্য ধর্ম ,মতবাদে নারীর অবস্থান..... ৬১
বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের সচিত্র প্রতিবেদন..... ৬৪
এসিড নিক্ষেপ সক্রান্ত প্রতিবেদন ৬৮
নারী নির্যাতন রোধে বাংলাদেশের আইন..... ৭৩
ইসলামে নারী নির্যাতন রোধে কঠোর আইন..... ৭৬
সার্বজনীন আদর্শ..... ৮৯

৩য় অধ্যায় ঃ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট..... .. ৯৩
১ম পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম ও সমসাময়িক অর্থনীতি..... ৯৪
অর্থনীতির সংজ্ঞা..... ৯৫
ইসলামী অর্থনীতি..... ৯৭
প্রচলিত বিভিন্ন অর্থব্যবস্থা..... ১০০
অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থে অর্থনীতি..... ১০৭
ইসলামী অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি..... ১০৯
বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ..... ১১৪
তুলনামূলক বিশ্লেষণ ১১৮
সার্বজনীন আদর্শ..... ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সুদ..... ১৩৩
সুদের সংজ্ঞা..... ১৩৪
সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মীয় মতামত..... ১৩৮
সুদ সম্পর্কে আল-কুরআনের বাণী..... ১৪০
সুদ সম্পর্কে আল-হাদীসের বাণী..... ১৪২
সুদের কুফল সমূহ..... ১৪৫
সুদ ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ..... ১৪৯
ইসলামী ব্যাংক ও তাদের সুদবিহীন বিনিয়োগ..... ১৫৪
সার্বজনীন আদর্শ..... ১৫৭
৩য় পরিচ্ছেদ ঃ দারিদ্র্য বিমোচন..... ১৫৮
দারিদ্র্য কি/সংজ্ঞা..... ১৫৯
দারিদ্র্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ..... ১৬১
বাংলাদেশের দারিদ্র্যের বর্তমান পরিস্থিতি ও বিমোচন কর্মসূচী..... ১৬২
দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার ও এনজিওদের কর্মসূচী.. ১৭৪
ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত নীতি..... ১৭৫
বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের ব্যবহার...১৯০
সার্বজনীন নীতি..... ২০০
৪র্থ অধ্যায় ঃ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট..... ২০২
১ম পরিচ্ছেদ ঃ সংখ্যালঘুদের অধিকার..... ২০৩
বাংলাদেশের অবস্থান..... ২০৪
বাংলাদেশের সংবিধানে অধিকার..... ২০৪
বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের মর্যাদা..... ২০৮
ইসলামে সংখ্যালঘুদের অধিকার..... ২০৯
সার্বজনীন নীতি..... ২১৮
২য় অনুচ্ছেদ ঃ পররাষ্ট্রনীতি..... ২২২
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি..... ২২২
ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি..... ২২৬
সার্বজনীন আদর্শ..... ২৩৫
৩য় অনুচ্ছেদ ঃ মানবাধিকার ২৩৭
মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার..... ২৩৯
মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য.... ২৪২
বাংলাদেশে সংবিধানে মৌলিক মানবাধিকার ২৪২
বাংলাদেশে মানবাধিকারের সমীক্ষা ২৪৬
ইসলামে মানবাধিকার ২৫১
সার্বজনীন আদর্শ ২৬৪
৫ম অধ্যায় ঃ উপসংহার ২৬৭
গ্রন্থপঞ্জী..... ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

ইসলামে সার্বজনীনতা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

সার্বজনীন বা সর্বজনীন শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Universal.[১] অর্থ হলঃ 'Good for all [২]or beneficial to all men.' সর্বসাধারণের জন্য অনুষ্ঠিত বা কৃত,সকলের হিতকর।[৩] সকলের জন্য মঙ্গলকর।[৪]

সার্বজনীনতা হল এমন সম্পর্কিত নির্দেশনা যা সবার জন্য গ্রহণীয় এবং মঙ্গলকর। ইসলামে সার্বজনীনতা মানে পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্র সম্পর্কিত এমন কতগুলো নীতিমালা যা গোটাজাতি তথা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য গ্রহণীয় এবং আদর্শের মূর্ত প্রতীক । যেখানে আশরাফ-আতরাফ ,ধনী-গরীব,সংখ্যালঘু -সংখাগুরুর কোন পার্থক্য নেই।

মুক্তির মন্ত্র, শান্তির শ্লোগান,অনাচার -অবিচারে বিরুদ্ধে রনহুংকার , ভারসাম্য সংবিধান, ঐক্য ও সংহতির সূত্র ইসলামের ভিতরেই নিহিত । অত্যাচার-অনাচার, জুলুম-নির্যাতন ,সন্ত্রাস ,খুন রাহাজানির বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছে ইসলাম। ঘোষণা দিয়েছে এর ভয়াবহ পরিণামের। সতর্ক করে দিয়েছে এর পক্ষ অবলম্বনকারীদের । বিপরীতে দিয়েছে কিছু Formula ,সূত্র ,মন্ত্র ,নির্দেশনা। যা দ্বারা মুক্তি পাবে সমাজ।আশার আলো দেখবে বিপদগ্রস্থ জাতি। নিপীড়িত , নিগৃহীত জনতা দেখবে সুবিচারের স্বপ্ন ।বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হবে জাতি। দূরীভূত হবে বিভিন্ন ধর্ম -বর্ণের শত্রুতা। ধনী-নির্ধনের হিংসা।

ইসলামে সার্বজনীনতা বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ ঃ Islam is a complete code of life. "ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান।" সামাজিক,

---

১. Bangla Academy : English -Bangali Dictionary . P. 863

২. Samsad : Bengali English dictionary . P. 995

৩. বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান : প্রধান সম্পাদক :ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক: পৃঃ ১১৪৮-১১৪৯

৪.বাংলা একাডেমি: সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান :সম্পাদক ; আহমদ শরীফ :পৃঃ ৪৫২

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,ধর্মীয় এক কথায় সকল ক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। এ বিধানগুলো সকলের জন্যই মঙ্গলজনক। আল-কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

ان الدين عندالله الاسلام

"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।"[৫]

ইসলাম আল্লাহর বাণী আল-কুরআন এবং মহানবী (সঃ) এর মুখ নিঃসৃত বাণী হাদীসের সমন্বয় প্রবর্তিত ধর্ম। আল হাদীস হলো আল-কুরআনের ব্যাখ্যা।

তাই ইসলামের মধ্যে রয়েছে মানবতার মুক্তির চাবিকাঠী,অশান্ত আর অস্থির বিশ্ব থেকে শান্তি আর স্থিরতার মূল মন্ত্র,অনাচার আর অবিচার রোধের উপায়,অর্থনৈতিক মুক্তির পথ, দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল, রাজনৈতিক নির্দেশনা,জাগতিক বিশ্বে বিশ্ব নিয়ন্তার আইন প্রতিষ্ঠার বিধান।

ইসলামের এ ব্যাপক বিষয় থেকে গবেষণার কলেবর সীমিত রাখার লক্ষ্যে অত্র গবেষণার বিষয়টিকে ৫টি অধ্যায় বিভক্ত করা হয়েছে। এ অধ্যায়গুলোর অধীন অনেক অনুচ্ছেদ রেখেছি। আমাদের বাস্তব জীবনে চলার জন্য এবং বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে যা অনেক আলোচিত বিষয় তা নিয়েই আমি প্রতিটি অধ্যায় সাজিয়েছি।তবে এ অনুচ্ছেদ বা অধ্যায়ের বাইরে ও অনেক বিষয় রয়েছে যা সময়ের স্বল্পতা এবং অভিসন্দর্ভটির কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সে সমস্ত বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়নি।আমাদের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমার কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি তা এ গবেষণাটিতে সন্নিবেশিত করেছি।

সার্বজনীনতা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Universality.[৬] সকলের নিকট যা গ্রহণীয় এবং মঙ্গলজনক তাই হল সার্বজনীন।অত্র অভিসন্দর্ভটিতে প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনার পর বিষয়টি কেন সার্বজনীন তার যুক্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সার্বজনীনতা নিরূপনের জন্যে কতগুলো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখেছি। বিষয়গুলো হলঃ

*এ বিধানের কোন ক্ষতিকর প্রভাব আছে কি?
*এ আইন সকলের জন্য মঙ্গলজনক কিনা ?
*এ বিধান প্রযোজ্য হলে কি প্রভাব পড়বে?
*জাগতিক সমস্যার কোন সমাধান হবে কি ?
*অন্যান্য ধর্মে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে কিনা।

---

৫. সূরা আলে ইমরান :আয়াত নং ১৯

৬. Bangla Academy :Bangali - English Dictionary . P. 806

Dhaka University Institutional Repository

১ম অধ্যায় রেখেছি অত্র গবেষণার বিষয়টির উপর ভূমিকা।
২য় অধ্যায় রেখেছি সামাজিক প্রেক্ষাপট
৩য় অধ্যায় ঃ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ।
৪র্থ অধ্যায় ঃ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
৫ম অধ্যায় ঃ উপসংহার

১ম অধ্যায় ঃ ভূমিকা।

২য় অধ্যায় ঃ সামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের গবেষণার বিষয়টি হল সামাজিক প্রেক্ষাপট।মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ জীবনে চলতে হলে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হয়।যেহেতু আমার গবেষণার বিষয় সার্বজনীনতা, তাই আমাকে এমন বিষয়ের উপর লেখা প্রসারিত করতে হয়েছে যেগুলো আমাদের সামাজিক জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজন এবং বহুল আলোচিত বিষয়।
এ অধ্যায়ের অধীন চারটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। অনুচ্ছেদগুলো হলঃ

১ম অনুচ্ছেদ ঃ নারীর মূল্যায়ন
২য় অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ প্রথা
৩য় অনুচ্ছেদ ঃ বহু বিবাহ
৪য় অনুচ্ছেদ ঃ নারী নির্যাতন

প্রথমে আমার চিন্তার বহিপ্রকাশ ঘটেছে নারীর মূল্যায়নকে নিয়ে । নারী বিষয়টি আজ আমাদের বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত বিষয়।নারী অধিকার নামে বিভিন্ন সেমিনার ,সিম্পোজিয়াম , সভা, সমাবেশ হচ্ছে।তাই অভিসন্দর্ভটির ২য় অধ্যায়ের ১ম অনুচ্ছেদে রেখেছি নারীর মূল্যায়ন।
নারীর মূল্যায়ন বিষয়টির ইসলামী আদর্শের সার্বজনীনতার যুক্তি নির্ভর করতে গিয়ে এভাবে আমি আমার চিন্তা ধারা বিকশিত করেছিঃ

১.বিভিন্ন ধর্মে নারীর মূল্যায়ন
২.বাংলাদেশে নারীর মূল্যায়ন/ক্ষমতায়নঃ
৩.ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার ঃ সার্বজনীন

নারীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থান, বাংলাদেশে নারীর মূল্যায়ন, এছাড়াও বিভিন্ন দেশের ক্ষমতাধর নারীর কিছু ছবি সংযোজন করেছি।পরিশেষে ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার এবং ইসলামের আদর্শ যে সার্বজনীন তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এভাবে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য পরিচ্ছেদগুলোকে বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইসলামে সার্বজনীনতার স্বরূপ তুলে ধরেছি।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় অধ্যায় ঃ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটঃ

৩য় অধ্যায় রেখেছি অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট।অর্থনীতি আমাদের জাতীয় জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।মানব জীবনের অভাব অসীম। তবে এর মধ্যে জীবন চলার পাথেয় হিসেবে যে অর্থ দরকার তা অবশ্যই আমাদের প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক চিন্তাবিদরা বিভিন্ন ফর্মুলা প্রদান করেছেন। পুঁজিবাদী আর সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রবক্তারা অর্থনৈতিক বিপ্লব আনতে চেয়েছিল । কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছে। তাই এ বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য এ অধ্যায়ের পর্যায়ক্রমিক অনুচ্ছেদগুলো এভাবে সাজিয়েছি ঃ-

১ম অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম ও সমসাময়িক অর্থনীতি
২য় অনুচ্ছেদ ঃ সুদ
৩য় অনুচ্ছেদ ঃ দারিদ্র্য বিমোচন ।

ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে সার্বজনীনতার যৌক্তিক কারণ তুলে ধরার জন্য ইসলাম ও সমসাময়িক অর্থ ব্যবস্থার স্বরুপ তুলে ধরেছি।এ জন্য নিম্নোক্ত ভাবে আলোচনা করেছি।

১.অর্থনীতির সংজ্ঞা
২.ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
৩.প্রচলিত বিভিন্ন অর্থব্যবস্থা এবংতাদের বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
৪অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে অর্থনীতিঃ
৫.ইসলামী অর্থব্যবস্থার স্বরূপ , প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ
৬.বাংলাদেশের বর্তমান অর্থব্যবস্থাঃ
৭.সার্বজনীন ইসলামী অর্থব্যবস্থাঃ

এভাবে ২য় ও ৩য় অনুচ্ছেদে সুদ ও দারিদ্র্য বিমোচন নিয়ে যথাসম্ভব তথ্যভিত্তিক আলোচনার চেষ্টা করেছি।পরিশেষে ইসলামী সার্বজনীনতার যৌক্তিক কারণ তুলে ধরছি।

৪র্থ অধ্যায় ঃ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

বিশ্ব আজ বহু সংকটে জর্জরিত। ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত বিশ্বের কোন কোন জ্ঞান পাপী নেতা মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসবাদের মদদ দাতা হিসেবে দায়ী করছে।বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ভুলুণ্ঠিত বলে প্রচার প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে কোন মহল।আবার ইসলামী আইনে নাকি সংখ্যালঘুদের মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুন্নের কথা বলা হয়েছে।প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন অর্থহীন অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন, কাল্পনিক চিন্তাধারার মতামত নিরসনের লক্ষ্যে আমি অত্র অধ্যায়ের এভাবে পর্যায়ক্রমিক করে তুলে ধরেছি ঃ

Dhaka University Institutional Repository

১ম অনুচ্ছেদ ঃ সংখ্যালঘুদের অধিকার
২য় অনুচ্ছেদ ঃ পররাষ্ট্রনীতি
৩য় অনুচ্ছেদ ঃ মানবাধিকার

বর্তমানে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিয়ে বেশ আলোচিত হচ্ছে। সংখ্যালঘুরা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান নামে পরিষদ গঠন করেছে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের নামে।পরিষদকে স্বাগতম। আবার বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের কাহীনি।সত্য-মিথ্যা যাচাই হল পরের ব্যাপার।প্রচার করা হচ্ছে ইসলামী নীতি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অবস্থান।এ ধারণার অবসান কল্পে অত্র অধ্যায়ের ১ম অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে যুক্তিপূর্ণ মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করছি।এ অনুচ্ছেদের বিষয়গুলো হলঃ

ক)বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থান ও মর্যাদা ;
খ)ইসলামে সংখ্যালঘুদের অধিকার ;
গ)সার্বজনীন নীতি ;

এর পরে আলোকপাত করেছি ইসলামে পররাষ্ট্রনীতির বিষয়।এখানে পর্যায়ক্রমিক বিষয়গুলো হলঃ

ক)বাংলাদেশে পররাষ্ট্রনীতি :
খ)ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি :
গ) সার্বজনীন আদর্শ ।

এ অধ্যায়ের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে রেখেছি ;মানবাধিকার।মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি আজ সকল মিডিয়াগুলোতে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।পত্রিকা,টিভির পর্দায় মানবাধিকার লংঘনের ভয়াল চিত্র অবলোকন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয় ।মানবজীবনের এ ভয়াবহ পরিণতি কেন? ইরাকের আবুগারিব কারাগারে কি ভয়াবহ পরিস্থিতি? নির্যাতনের মাত্রা,ধরণ কি অদ্ভুত!কিউবার গুয়েন্তানামে বের কারাগারে কি হচ্ছে? বিশ্ব বিবেক আজ নীরব।প্রতিবাদের ভাষা আজ হারিয়ে ফেলেছে সাধারণ জনগণ।কারণ মানবাধিকার লংঘন করছে এক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।যার বিরুদ্ধে কথা বলার কেউ নেই।

জাতিসংঘ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটছে আজ আমাদের স্বীয় ভূমি বাংলাদেশে।কিন্তু ইসলামে মানবাধিকার লংঘনের বিষয় কি বলা আছে?মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে ইসলামের নীতি কি?ইসলামের মানবাধিকার বিষয়ক নীতিমালা কি সার্বজনীন? হ্যা! ইসলামের এ নীতিমালা সার্বজনীন ।এর যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে নিম্নোক্ত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

*১.মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার কিঃ
*২.মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার এর মধ্যে পাথর্ক্য ঃ
*৩.বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক মানবাধিকারঃ
*৪.বাংলাদেশে মানবাধিকারের সমীক্ষাঃ
*৫.ইসলামে মানবাধিকারঃ
*৬.সার্বজনীনতাঃ

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উপসংহার

সর্বশেষ অধ্যায় রেখেছি উপসংহার । এখানে সার্বিক বিষয়ের একটি সার সংক্ষেপ তুলে ধরেছি।

সুজলা সুফলা,শষ্য শ্যামলা স্বাধীন এ বাংলার ভূখন্ডের অধিবাসীদের অধিকার সবারই সমান । ইসলামের সার্বজনীন আদর্শ বাস্তবায়নে সকলেই পাবে এর সুফল । হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ খ্রীস্টান সকলেই বসবাস করতে পারবে নির্বিঘ্নে ,নিশ্চিন্তে । ইসলামী আর্দশ সকলের জন্যই এক গ্রহণীয় আদর্শ । তাইতো ইসলাম হল সার্বজনীন । ইসলামের এ সার্বজনীন আদর্শই আমাদের মুক্তির সম্বল।

এ অভিসন্দর্ভটিতে যে সমস্ত তথ্য দেয়া হয়েছে অনেকটাই মূল গ্রন্থ থেকে দেয়ার চেষ্টা করছি।আবার অনেকটি অন্যদের থেকে নেয়া।তবে সুত্র উল্লেখ করা হয়েছে।গবেষণার কাজটিতে সময়ের অভাব এবং অনেক গ্রন্থের অপ্রতুলতা আমাকে অনেকটা ভাবিয়ে তুলেছিল।তারপরে ওস্বীয় প্রচেষ্টা আর মহান আল্লাহর কৃপা আমাকে গবেষণা সাময়িক সমাপ্ত করতে অনেকটা সহায়তা করেছে।এ গবেষণাটিতে দৃষ্টির অগোচরে কোন ভুল থাকতে পারে।তবে ত্রুটি দূর করতে সম্ভব সব কিছু করা হয়েছে।এ গবেষণাটুকু বিশ্বমানবতার কল্যাণে মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন ।।

আমীন ।
মুহাঃ গোলাম হুরোয়ার ।
এম.ফিল. গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
সামাজিক প্রেক্ষাপট

১ম অনুচ্ছেদ ঃ নারীর মূল্যায়ন
২য় অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ প্রথা
৩য় অনুচ্ছেদ ঃ বহু বিবাহ
৪র্থ অনুচ্ছেদ ঃ নারী নির্যাতন

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক প্রেক্ষাপট

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করে এ মানব জাতি। সমাজে চলতে হলে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন মেনে চলতে হয়।পৃথিবী সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত আসা মানব জাতির প্রতি বিভিন্ন নির্দেশনার জন্য বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা নির্দেশনাকারী হিসেবে বিভিন্ন নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন নবীর আগমনের কারণে বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে। ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন হযরত মুসা (আঃ)।খৃস্টান ধর্মের প্রবর্তক হযরত ঈসা (আঃ)। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশে এছাড়াও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জাতি বাস করে।যেমন হিন্দু সম্প্রদায় ;তাদের ধর্মের প্রবর্তক রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।বৌদ্ধ সম্প্রদায় যাদের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ। বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাস করছে মুসলমান,[১] হিন্দু[২],বৌদ্ধ[৩],খৃস্টান সম্প্রদায়[৪]ও অন্যান্য[৫] সম্প্রদায়। এছাড়াও রয়েছে নানা উপজাতি।[৬]প্রত্যেক ধর্মেই সামাজিক ভাবে চলার নিয়মনীতির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

মানবতার মুক্তির কান্ডারী ইসলামের ধারক ও বাহক মহানবী (সঃ) বিশ্বমানবতাকে সামাজিক চরম অবক্ষয় থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন। যা সকল ধর্ম, বর্ণ,গোত্রের জন্য কল্যাণকর হিসেবে বিবেচিত। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা গোটা জাতি এবং গোষ্ঠীর জন্যে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু ইসলামী বিধিমালা সম্পর্কিত জ্ঞানের অনুপস্থিতির কারনে অনেক বিবেক বর্জিত জ্ঞানপাপীরা ইসলাম ও ইসলামী আদর্শের প্রতি ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করেন।আশা করি নিম্নোক্ত তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনা সন্দেহের নিরসন ঘটাবে। সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে যে ধারাবাহিকতা অনুসরণ করব তা হল ঃ

---

[১] .বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা ৮৯.৭% (সূত্র: অর্থ নৈতিক সমীক্ষা :২০০৪)

[২] .বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা ৯.২% সূত্র: প্রাগুক্ত

[৩] .বাংলাদেশে বৌদ্ধদের সংখ্যা ০.৭% সূত্র: প্রাগুক্ত

[৪]বাংলাদেশে খৃস্টানদের সংখ্যা ০.৩% সূত্র: প্রাগুক্ত:

[৫] .অন্যান্যদের সংখ্যা ০.১% সূত্র: প্রাগুক্ত:

[৬].মোট উপজাতীর সংখ্যা ৪,৬০,২৭০জন। (১৯৮১ সালের আদমশুমারী) ৫০%এর অধিক চাকমা। তাদের সংখ্যা প্রায় ২,২৪,২৭৯জন । তাদের অন্যতম শাখা তযঙ্গ্যাদের জনসংখ্যা ১৮৪৪০জন।

সূত্রঃ বাংলাদেশের উপজাতি ; সুগত চাকমা ।(প্রথম প্রকাশ : ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫) পৃঃ ৯

Dhaka University Institutional Repository

১ম অনুচ্ছেদ ঃ নারীর মূল্যায়ন
২য় অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ প্রথা
৩য় অনুচ্ছেদ ঃ বহু বিবাহ
৪র্থ অনুচ্ছেদ ঃ নারী নির্যাতন

১ম পরিচ্ছেদ
নারীর মূল্যায়ন

ইসলাম-পূর্বযুগে নারীরা ছিল অবহেলিত, অমঙ্গলের প্রতীক, নারীদেরকে বলা হত অবমাননাকর ও দুর্ভাগ্যজনক। সর্বত্রই সে ছিল পুরুষের দাসী ও বিলাসিতার সামগ্রী। পুরুষকে সন্তুষ্ট তাবেদারী করার জন্যই রমণীর সৃষ্টি। সুতরাং রমণী মানেই পরাধীনতা ও পরনির্ভরতাকেই বুঝাতো।

ফরাসী বিপ্লবের পর ১৭৮৯ সালে ঘোষিত মানুষের ও নাগরিকের অধিকার সনদের বাস্তবায়ন পাশ্চত্য সমাজ আজও করতে পারেনি। এমনকি ফ্রান্সেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ১৮০৫ সাল পর্যন্ত ইউরোপে আইন ছিল যে, পুরুষ তার স্ত্রীকে বিক্রয় করতে পারবে।

মেরী-ওলস্টোনক্রাফট (MaryWollstonecraft) উল্লেখ করেন যে, রুশো থেকে শুরু করে ডঃ গ্রেগরী পর্যন্ত যারাই নারীর শিক্ষা ও আচারণ সম্পর্কে কথা বলেছেন, তাঁরা নারীকে দুর্বল এবং নিকৃষ্ট হিসেবে বিবেচনা করেছেন।তাঁদের মতে নারীর স্বাধীনতাবোধ করার ক্ষমতা নেই। পুরুষের মধু সাথী হিসেবেই তাকে ভাল মানায়। আনুগত্য তার প্রধান গুণ। পুরুষের তুলনায় নারীর এই দুর্বলতা প্রাকৃতিক ব্যাপার। রুশোর এসব ধারণাকে মেরী ননসেন্স বলেছেন।[৭]

জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী পৃথিবীতে নারী আঞ্চলিক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বৈষম্যের শিকার। আরো উল্লেখ্য যে পৃথিবীতে ১.৩ বিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। অথচ তন্মধ্যে ৭০% হচ্ছে নারী। শ্রমবাজারে নারীদের অবাধ প্রবেশ প্রতিবন্ধকতা, মজুরী বৈষম্য-বিশ্বব্যাপী তুলনামূলক নারীর অশিক্ষাকে এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর পরিসর খুবই

---

[৭] আনু মোহাম্মাদ :নারী ,পুরুষ ও সমাজ,সন্দেশ (বইপাড়া, ঢাকা, খ্রি.১৯৯৭) পৃ: ১৮-১৯

Dhaka University Institutional Repository

সীমিত। সংসদে নারী ১০% পৃথিবীতে অনধিক মাত্র ৫% নেতৃত্ব দিয়ে আসছে।[৮]

নারী সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলাম নারীদেরকে উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করায়েছে। নারীর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানমালা সার্বজনীন।এর যৌক্তিক বিশ্লেষণের জন্য নিম্নে ক্রমানুসারে আলোচনা করা হলঃ

১.বিভিন্ন ধর্মে নারীর মূল্যায়ন
২.বাংলাদেশে নারীর মূল্যায়ন/ক্ষমতায়নঃ
৩.ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার ঃ সার্বজনীন

১.বিভিন্ন ধর্মে নারীর মূল্যায়নঃ

১.১ গ্রীক সভ্যতায় ঃ

গ্রীক সভ্যতায় নারীরা ছিল অবহেলিত।তাদের তেমন কোন মর্যাদা ছিল না।বিশিষ্ট দার্শনিক সক্রেটিস বলেনঃ

Woman is the greatest source of chaos and disruption in the world. She is like the Dafali Tree which out warily looks very beautiful, but if sparrows eat it they die without fails. [৯]

নারী জগতে বিশৃংখলা ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস।সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায় , যাহা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুই পাখি তা ভক্ষণ করলে এদের মৃত্যু অনিবার্য।

গ্রীক সভ্যতায় লোকেরা বলত ; নারী জাত সকল অকল্যাণের মূল।[১০]

সেন্ট টমাস ঘোষনা করেছেন ঃ নারী একজন অশুদ্ধ পুরুষ, ঘটনাক্রমে সৃষ্টি একটি জুরি । এটা জেনেসিসে প্রতীকী হয়েছে , সেখানে হাওয়াকে আদমের একটি হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[১১]

গ্রীক সভ্যতায় নারী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে এন্ডার সকি বলেনঃঅগ্নিতে দগ্ধ রোগী ও সর্পদংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব ।কিন্তু নারীর জাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।[১২]

---

[৮] The Vienna Declaration and Programme of action, part 1 para 18

৯. নারী :আঃ খালেক :পৃঃ ২: প্রথম প্রকাশ :জুন ১৯৯৪ : প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

[১০]. আসমা জাহান হেমা: ইসলামের ছায়াতলে নারী , (আল এছহাক প্রকাশনী ,২/৩, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার , ঢাকা ১০০০,অক্টোবর ২০০২) পৃঃ ৩০

[১১]. নারী ও সমাজ আঃ খালেক পৃঃ ২

[১২].Nazhat Afza and khurshyid Ahmad: The position of woman in Islam. P 9-10 Islamic Book publishers, Kuwait 1982

Dhaka University Institutional Repository

গ্রীক পুরাণে 'নারী পান্ডোরে' কে মানব সমাজের দুঃখ-দুর্দশার কারন রূপে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে গ্রীক সমাজে নারীর সতীত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এক ধরণের নারী পূজার ধুম পড়ে যায়।[১৩]

গ্রীক পুরাণে আছে : কামদেবী আফ্রেদিতি জনৈক দেবতার পত্নী হয়েও অন্য তিন দেবতা ও একজন মানব সন্তানের সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করে। আর এ অবৈধ সম্পর্কের ফলে যে সন্তান লাভ হয় সেই হচ্ছে গ্রীক পুরাণের প্রেম দেবতা কিউপিড।[১৪]

১.২ বৌদ্ধ ধর্মেঃ

বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা হল নারীর সহচর্যে নির্বাণ লাভ করা চলেনা। নারী হল সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। ঐতিহাসিক ওয়েস্টার মার্ক (Wostermark) বলেনঃ

Women are of all the snares which the tempter has spread for men, the most dangerous; in women are embodied all the
Powers of infatuation, which blind the mind of the world.

মানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলো ফাঁদ বিস্তার করে রাখিয়েছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে বা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।[১৫]

বেটনী (Betony)তার World's Religions. গ্রন্থে বিখ্যাত এক বৌদ্ধ পন্ডিতের ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেনঃ

Unfathomably deep like a fish' course in the water is the character of women robed with to whom a lie is like the truth and the truth is like a lie.

পানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা যেমন নির্ণয় করা সম্ভব নয়, নারীর চরিত্র তেমনি নিবিড় বা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর। তার নিকট মিথ্যা সত্য সদৃশ এবং সত্য মিথ্যা সম।[১৬]

ইহুদী ধর্মে পিতা পেয়ে থাকে পুরোহিতের অধিকার। ইহুদী পাদ্রীদের মতে সতী নারীর চেয়ে পাপীষ্ট পুরুষ ও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।[১৭]

---

১৩. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ : নারী নির্যাতনের রকমেরফের প্রকাশক ; মুনওয়ার আহমদ : সভাপতি ; বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ : প্রকাশকাল : ২য় সংস্করণ : অক্টোবর , ২০০২ ইং :পৃঃ ১৩

১৪. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ : প্রাগুক্ত: পৃঃ১৩

১৫. Nazhat Afza and khurshyid Ahmad: The position of woman in Islam. P 12-13 Islamic Book publishers, Kuwait 1982

১৬. Encyclopedia Britannica. Voll. p.732

১৭. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ : নারী নির্যাতনের রকমেরফের পৃঃ৩১

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ হিন্দু ধর্মেঃ

ভারতে হিন্দু ধর্মে নারীদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত করুণ। অধ্যাপক ইন্দ্রের ভাষায় ; নারীর ন্যায় এত পাপপংকিলতাময় প্রাণী আর নেই। নারী প্রজ্জলিত অগ্নিস্বরুপ ক্ষুরের ধারালো দিক, এ সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট। কোন কোন হিন্দু গ্রন্থে বলা হয়েছে ; বিষ ,সাপ , আগুন, মৃত্যু নরক ঝড়, বন্যা এসব কোন কিছুই নারীর চেয়ে খারাপ নয়।[১৮]

হিন্দু শাস্ত্রকার মনুর মতে, নারীর অন্তর নির্মল হতে পারে না ।কারণ মন্ত্র দ্বারা তার সংস্কার সাধন সম্ভব নয় এবং বেদ শাস্ত্রে তার কোন অধিকার নেই।[১৯]

মনুর মতে, নারীকে দিবা রাত্র অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক । কারন নারী জন্মগত ভাবেই দুশ্চরিত্রা ও লম্পট ।অতএব তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথগামী হবে।

১.৪ খ্রীস্টান ধর্মেঃ

খ্রীস্টান ধর্মযাজকরা নারীকে'নরকের দ্বার 'ও'মানবের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার হেতু' বলে গণ্য করত।এজন্যে তাদের ভাষায় নারীকে Woman [woe -to-man] মানুষের দুঃখের কারন বলে নাম রাখা হয়েছে।নারী আদতেই "মানুষ কিনা এবং তার আত্মা আছে কিনা " এ নিয়ে তারা ছিল সন্দিগ্ধ । এক পাদ্রী বলেছে : নারী সব অন্যায়ের মূল, তার থেকে দূরে থাকাই বাঞ্চনীয়।নারী হচ্ছে পুরুষের মনে লালসা উদ্রেককারী । ঘরে ও সমাজে যত অশান্তির সৃষ্টি হয় তা সব তারই কারণ। যাজ্ঞকরা নারীর শিক্ষা অধিকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।[২০]

বাইবেলে পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত আছে: "নারীর পাপের দরুণই পুরুষকে তার উপর কর্তৃত্ব করবার অধিকার প্রদত্ত হয়েছে"।[২১]
খ্রীস্টানের চোখে নারীর শরীর প্রলোভনের সোনার কলস। তার দেহ শয়তানের। নারীই পাপের পথে নিয়ে গেছে আদমকে ; তাই খ্রীস্টান সাহিত্য নারী ঘৃণায় ও তিরস্কারে মুখর।

তবে তুলিয়ানের চোখে : নারী পর প্রণালীর ওপর নির্মিত প্রসাদ।

অগাস্টিন বলেন: " আমাদের জন্ম হয়েছে মলমূত্র থেকে "।[২২]

---

[১৮]ডঃ মুস্তফা আস-সায়াফী : ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার) ঢাকা : ১৯৮১ পৃঃ ১৪

[১৯]. নারী নির্যাতনের রকমেরফের ।প্রাগুপ্ত পৃঃ ৪৩

[২০]. ডঃ মুস্তফা আস-সায়াফী : ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা : খৃঃ১৯৮১ পৃঃ১৪

[২১]Bible .Genesis 3:16 New York 1973

[২২].নারী নির্যাতনের রকমের ফের। প্রাগুপ্ত; প্র ৪২১

Dhaka University Institutional Repository

ইহুদি ও খ্রীস্টান ধর্মমতে নারীই গোটা মানবতার দুর্দশার কারণ। অতীতের বহু বিখ্যাত পাদ্রী প্রকাশ্যে নারীজাতির উপর দোষারূপ করেছেন এবং নারীকে দরকারী আপদ বলে অভিহিত করেছেন।

* আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট বলেন: নারী বলেই তার লজ্জায় আবিভূত হয়ে থাকা উচিত।[২৩]

এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী খ্রীস্টান জগত নারীজাতির হীনতা ও অমর্যাদা প্রচার করে আসছে।

১.৫ ইসলাম ধর্মে নারীর মূল্যায়ন ঃ

ইসলাম নারীর মর্যাদাকে সুউচ্চে তুলে ধরেছে। নারীদের দিয়েছে সম্মান, মর্যাদা, দিয়েছে মৌলিক ও নাগরিক অধিকার। জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও জড়বাদী সভ্যতা নারী জাতির উপর পাপ ও অপবিত্রতার যে কলঙ্ক লেপন করেছে, ইসলাম এ প্রচন্ড আঘাতে তা মোচন করে দিয়েছে।

ইসলাম ঘোষণা করেছে নারী পুরুষ একই উৎস হতে উদ্ভূত। অতএব নারী পাপী বলে গণ্য হলেও পুরুষ ও পাপী বলে গণ্য হওয়া উচিত। আর পুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের কোন স্ফুলিঙ্গ থেকে থাকলে নারীর মধ্যে তা থাকা আবশ্যক। নারীর মানসিক মর্যাদা প্রদান ও আর্থ-সামাজিক,সাংস্কৃতিক সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে নারীকে সংসার সমাজ ও সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সর্বপ্রথম স্বীকৃত প্রদান করেন মহানবী মুহাম্মাদ (সঃ)।
মারমাডিউক পিকথল তার Culture Side নামক গ্রন্থে বলেনঃ

The prophet of Islam is the greatest feminist the world has ever known, from the lowest degradation the uplifted woman to a position beyond which she cargo only in theory.[২৪]

ইসলাম সব অমানবিক ও প্রহসনমূলক অবস্থা থেকে নারী জাতিকে মুক্তি দিয়ে, তাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক মানদন্ড ও মর্যাদা-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে, সমাজে বসবাস কারী প্রত্যেককে তাদের অবস্থান-মর্যাদা-সম্পর্ক-অধিকার অনুযায়ী আচরণ করতে মুসলমানদেরকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এভাবেই ইসলামে নারীর মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে। ইসলাম নারীকে প্রথমত মর্যাদা দিয়েছে কন্যারূপে। দ্বিতীয় মর্যাদা দিয়েছে সমাজ সংস্কার রূপে ,তৃতীয় মর্যাদা দিয়েছে মা রূপে এবং চতুর্থ মর্যাদা দিয়েছে সমাজ সংস্কার সমান গুরুত্ব পূর্ণ সদস্যারূপে।[২৫]
ইসলামে নারীর মর্যাদার ক্ষেত্রগুলো পৃথক ভাবে দেখানো হল ঃ-

---

[২২] .নারী নির্যাতনের রকমের ফের। প্রাগুক্ত প্র ঃ২১

[২৩] নারী ও সমাজ : আঃ খালেক ; পৃঃ ১০

[২৩] ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা : ৪৪বর্ষ ; ৩য় সংখ্যা; পৃঃ ২০০

[২৪] . পরিবার ও পারিবারিক জীবন : মাঃ আব্দুর রহীম ; খায়রুন প্রকাশনী ; ১৩ কারকুন বাড়ী লেন, [illegible], ঢাকা , প্রকাশকাল ঃ জুলাই , ১৯৯৬ ; পৃঃ ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

১*কন্যারূপে নারী:

আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হত । তাদের জন্মকে অপমানজনক মনে করা হত।
নবজাত কন্যা-সন্তান হত্যার রীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল ।তাদের জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করা হত। পন্যদ্রব্যের মত তাদেরকে বিক্রয় করা হত।পশুর বদলে তাদেরকে বিনিময় করা হত। আরবদের ধারণা অনুসারে কন্যা-সন্তান অপমান ও অমর্যাদার কারণ ছিল বলেই তারা এসকল কাজ করত।নবজাত কন্যা-সন্তানকে বিভিন্ন প্রকারে হত্যা করা হত। কেউ কেউ গর্ত খনন করে তাতে পুঁতে তাদেরকে হত্যা করত ।কেউ কেউ খুব উচু স্থান হতে তাদেরকে নীচে নিক্ষেপ করত । আবার কেউ কেউ পানিতে ডুবায়ে মারত বা কেটে ফেলত ।এমন নৃশংস ও বর্বর ব্যবহারে নারীদের অধিকার অপহরণ করা হত যেন তারা কসাইখানায় বলি হওয়ার উপযোগী নির্বাক পশু ছিল।[২৬]

তদানীন্তন সমাজ থেকে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার ও নির্দয়ভাবে কেড়ে নেয়া হয়েছিল।আল-কুরআনে বর্ণিত আছেঃ

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? [২৭]
অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ - أَوْ
يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা করে দেন বন্ধ্যা । তিনি সর্বজ্ঞ ,সর্বশক্তিমান ।[২৮]

নবী করীম (সঃ) বলেছেন,"যে ব্যক্তির একটি কন্যা সন্তান বা বোন রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত কবর দেয়নি , অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখায়নি এবং পুত্র সন্তানকে তার কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য দেয়নি , সে ব্যক্তি জান্নাতী "।[২৯]

---

[২৬].নারী ও সমাজ : আব্দুল খালেক ; পৃঃ১৬
[২৭]. আল-কুরআন,সুরা তাকভীর, আয়াত নং ৮-৯
[২৮]. আল-কুরআন,সুরা শূরা : আয়াত নং ৪৯-৫০
[২৯].সুনানে আবু দাউদ ঃআবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (মাকতাবা রশীদিয়া ,দিল্লী,তা,বি,)আবওয়াবুন নাওম , বাব-ফী ফাযলি মান আলা ইয়াতামা।

Dhaka University Institutional Repository

নবী (সাঃ) ফাতিমা (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন; "ফাতিমা আমার (দেহেরই) একটি টুকরা । যে ব্যক্তি তাকে ক্ষুব্ধ করে সে প্রকারান্তরে আমাকে ক্ষুব্ধ করলো"।[৩০]

তিনি আরো বলেছেন , কন্যাদেরকে ঘৃণা করোনা , কেননা আমি স্বয়ং কন্যাদের পিতা। [৩১]

*মহানবী (সঃ)এর বাণীঃ

من كانت له انثى فلم يادها ولم يهنها ولم يؤثر ولده

عليها يعنى الذكور ادخله الله الجنة.

"যার কন্যা সন্তান হয়েছে অথচ তাকে জীবন্ত কবর দেয়নি বা তাকে লাঞ্ছিত ও করেনি কিংবা কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তানকে বেশী আদর যত্ন করেনি, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"

২. স্ত্রীরূপে নারী :

আরব সমাজে নারীদের সাথে দাসী-বাঁদীর ন্যায় ব্যবহার করা হতো। তাদের কোন প্রকার মর্যাদা অধিকার স্বীকার করা হতোনা । হযরত উমর (রাঃ) এর উক্তি থেকে তার প্রমান মিলে । তিনি বলেন, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, জাহিলিয়া যুগে আমরা নারীদের কোনই গুরুত্ব দিতাম না, পরে যখন আল্লাহ তাদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে অকাট্য বিধান নাযিল করলেন এবং মীরাসের অংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন তখন আমাদের আচরণ ও মনোভাবের আমূল পরিবর্তন সাধিত হলো ।[৩২]

স্ত্রীলোকদের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ,

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে "। [৩৩]

নবী (সঃ) বলেছেন , " তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম" ।[৩৪]

---

৩০. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী: জামে আস-সহীহ (মাকতাবা রশীদিয়া ,দিল্লী,তা,বি,)কিতাবুল মানাকিব ,বাব-মানাকিবই ফাতিমা।

৩১ মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার , আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী (আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা, জুলাই , ২০০৩) পৃঃ১

৩২.সহীহ মুসলিম , ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ মাকতাবা রশীদিয়া দিল্লী, খ্রীঃ ১৯৩৮ কিতাবুত তালাক ,বাব-বায়ানু আনিতাখাইউরাহু ইমরা আতাহু লা-ইয়াকুনা তালাকান ইল্লা বিন্নিয়াহ।

৩৩.সুরা নিসা: আল কুরআন :আয়াত ১৯

৩৪.সুনানে ইবনে মাজাহ :আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনি :কাযবীনি (মাকতাবা রশীদিয়া ,দিল্লী,তা,বি,)আবওয়াবুন নিকাহ , বাব-হুসনু মুআশারা তিন নিসা

Dhaka University Institutional Repository

নবী (সঃ) আরো বলেন, " সমগ্র পৃথিবীই সম্পদ, আর নারী হচ্ছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ।" [৩৫]

নবী (সাঃ) বলেন, "পূর্ণ মু'মিন সেই ব্যক্তি যে উত্তম ব্যবহারকারী এবং আপন পরিবারের প্রতি কোমল প্রাণ।"[৩৬]

আল্লাহর বাণীঃ هن لباس لكم وانتم لباس لهن-

'তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ ।'[৩৭]

فاتقوا الله فى النساء

'তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে ।'

لزوجك عليك حق

'তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে ।

خياركم خياركم لنسا ئكم

'স্ত্রীদের কাছে যারা উত্তম ,তারাই তোমাদের মধ্য উত্তম'

৩.মাতা রূপে নারীঃ

ইসলামে মা হিসেবে নারীকে যে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম ও সমাজের সাথে এ বিষয়ে তুলনাই করা চলে না।

আল কুরআনে এরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

আমি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে , তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও স্তন্য ছাড়াতে সময় লাগে ত্রিশ মাস।[৩৮]

নবী (সঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের সাথে অবাধ্যাচরণ করা হারাম করে দিয়েছেন।[৩৯]

নবী (সাঃ) বলেছেন ,

الجنة تحت اقدام امهاتكم

---

[৩৫] সহীহ মুসলিম , ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (প্রাগুপ্ত) কিতাবুল রিদা ,বাব-আল-ওয়াসিয়াতু বিন্নিসাই।

[৩৬] আল-জামে আতরিমিযী :আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (মাকতাবা রশীদিয়া,দিল্লী,তা.বি.)কিতাবুর রিদা , বাব -মা-জাআ ফী হাকিকল মারআতি আলা যাওজিহা।

[৩৭]. আল-কুরআন,সুরা আল বাকারা , আয়াত নং ১৮৭

[৩৮].সুরা আহকাফ : আল-কুরআন :আয়াত নং ১৫

[৩৯].আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী: জামে আস-সহীহ (প্রাগুপ্ত)কিতাবুল ইসতিকরাদ, বাব-মা ইনহা আন ইদাআতিল মাল।

Dhaka University Institutional Repository

মায়েদের পদতলে সন্তানের জান্নাত।[৪০]

অপর এক হাদীসে আছে, মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমা বলেন, আমার পিতা নবী (সঃ) এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল ! জিহাদে অংশগ্রহন করার ব্যাপারে আমি আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন , তোমার মা জীবিত আছে কি? তিনি বলেন : হ্যা, জীবিত আছেন । তিনি বললেন ,

মায়ের খিদমতকে অপরিহার্য করে নাও। কেননা জান্নাত তার পায়ের কাছে।[৪১]

৪*সমাজ-সংস্থার সদস্যা হিসেবে নারী

নারী কেবল কন্যা, বধু এবং মা-ই নয়, ইসলামের সমাজ সংস্থায় সে সমান মর্যাদা সম্পন্না একজন সদস্যাও বটে , ইসলামে পুরুষের কর্তব্য যেমন স্বীকৃত, তেমনি তার উপর অনেক গুরুদায়িত্ব ও অর্পিত। অনুরূপভাবে নারীকে সমাজক্ষেত্রে যেমন মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তেমনি তার ও রয়েছে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। দ্বীনি আমল আখলাক যেমন পুরুষের কর্তব্য তেমনি নারীর ও কর্তব্য।

আলকুরআনে আছে:

ومن يعمل من الصلحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك

يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا

যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী, এবং সে ঈমানদার হবে, এরূপ লোক জান্নাতে দাখিল হবে, আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।[৪২]

বস্তুত নারী জীবনের আরোহন, পুলকের সঙ্গীত,পবিত্র স্নেহ-মমতার প্রতীক, প্রতিমূর্তি, বিশ্বনিখিলের প্রাণ স্পন্দন।

৫*মানবিক মর্যাদাঃ

ইসলাম পুরুষের সঙ্গে নারীকে একই মর্যদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাদের রক্ষাকবচ হিসেবে বহু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে ।

📖আল্লাহর বাণীঃ

يايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء-

৪০.মাযমাউয যাওয়ায়েদ ও মামবাউল ফাওয়ায়িদ: হাফিজ নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবি বাকর আল-হায়সামী:(দায়রুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন, ১৪০৮/১৯৮৮) কিতাবুল বিরর ওয়াসসিলাহ বাব- মা জাআ ফিল বিররি ওয়া হাকবিল ওয়ালিদাউন, ৮ম খন্ড।

৪১.মাযমাউয যাওয়ায়েদ ও মামবাউল ফাওয়ায়িদ:(প্রাগুক্ত)

৪২.সুরা আন নিসা: আয়াত নং ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

"হে মানব সম্প্রদায়, তোমাদের প্রভুকে তোমরা ভয় কর, যিনি তোমাদের একটি মানুষ হতে সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় হতে বহু সংখ্যক স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি করেছেন"[৩২]

৬*ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষাঃ

ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা নারীকে সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে এবং স্ত্রী, কন্যা, মাতা, আত্মীয় হিসাবে তার ব্যক্তিগত মর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে।

৭.মৌলিক অধিকার সংরক্ষণঃ

ইসলাম পুরুষের মতো নারীরও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রে অন্ন-বাসস্থান ও মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে শুধু উপদেশের মাধ্যমেই নয় বরং পালনীয় আইন সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৮.রাজনৈতিক মর্যাদা ঃ

পুরুষের মতো নারীদেরও রাজনৈতিক অধিকারগুলো ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত। যেমন তাদের অবাধে মত প্রকাশের, ভোট প্রদানের কিংবা সমালোচনার অধিকার ইসলাম দিয়েছে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাই ইসলামী রাষ্ট্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

৯*জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তাঃ

ইসলাম একজন নারীকে জীবন, সম্পদ,মান-সম্ভ্রম ও সামাজিক মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করেছে।

১০*শিক্ষার অধিকার ঃ

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, ইসলামী জ্ঞানার্জন অপরিহার্য হিসেবে ঘোষণা করেছে যা ধর্মীয় জীবনের পাশাপাশি বৈষয়িক ক্ষেত্রসমূহে ও প্রযোজ্য।

মহানবী (সঃ) বলেছেনঃ

طلب العلم فريضة على كل مسلم

"জ্ঞানান্বেষণ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপরই ফরজ।"[৩৩]

১১. জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ঃ

কোন মহিলা যদি সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষা শেষ করে উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী হয়, ইসলাম তাকে উৎসাহিত করে এবং এ ব্যাপারে কোন বৈষম্য রাখেনি।

১২.সামরিক ক্ষেত্রে অধিকার ঃ

ইসলাম সামরিক ক্ষেত্রে ও জ্ঞানার্জন ও দক্ষতার্জনে নারীকে উৎসাহিত করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে যখন নিজ সম্ভ্রম ও শরীরের উপর আক্রমন আসে তখন নারী যুদ্ধে অবতীর্ণ

---

[৩২]. সূরা আন নিসা: আয়াত নং ১

[৩৩]. মিশকাতুল মাছাবীহ : শায়খ ওয়ালীদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ : কিতাবুল ইলম : পৃ ৩৪ ; মাকাতাবা মাজারেকুল কুরআন ; চকবাজার ; ঢাকা ১২১১

Dhaka University Institutional Repository

হতে পারে। এছাড়া ও ওহুদ যুদ্ধে হযরত আয়েশা ও উম্মে আওফা যোদ্ধাদের পানি পান করিয়েছিলেন যা নারীকে সহযোদ্ধা হিসেবে ইসলাম মর্যাদা দিয়েছে।

১৩.অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেঃ

প্রাক-ইসলামী যুগের বঞ্চিত নারীকে ইসলামই প্রথম অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাদের এসব অর্থনৈতিক অধিকার নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিহত এবং হস্তক্ষেপের যোগ্য নয়।

১৪.উত্তারিধকার অর্জনেঃ

প্রাক-ইসলামী যুগে কিংবা (বর্তমানে) হিন্দু ধর্মে যে নারীরা সম্পত্তির অধিকারই পেত না, সে ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদেরকে পিতা, মাতা, নিকটআত্মীয় ও স্বামীর পক্ষ থেকে উত্তারাধিকার অর্জনের অধিকার দিয়েছে।

১৫.ভরণ-পোষণের অধিকারঃ

নারীরা বিয়ের পূর্বে অভিভাবক এবং বিয়ের পরে স্বামীর কাছ থেকে ভরণ-পোষণ লাভ করবে এ অধিকার ইসলাম নিশ্চিত করেছে।

১৬.নিজস্ব সম্পদ অর্জনঃ

ব্যক্তিগত ভাবে অর্জিত টাকা পয়সা দিয়ে নারী ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। এতে স্বামী কিংবা তার অভিভাবকরা কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না। তার সম্পদের একক মালিকানা তার নিজেরই।

১৭.স্বামী নির্বাচনের অধিকার ঃ

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় স্বামী নিজ পছন্দ মতো নির্বাহন করা স্ত্রীদের অধিকার। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়াকে মহানবী (সঃ) নিরুৎসাহিত করেছেন।

১৮.তালাক গ্রহণঃ

অযোগ্য ও অপদার্থ স্বামীর কাছ থেকে মুক্তি নিয়ে নারীর বিবাহ বিচ্ছেদকরণের অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। কোন নারীকে ইসলাম নিগৃহীত হতে উৎসাহিত করেনি।

১৯.পূর্ণবিবাহের অধিকার ঃ

কোন নারীর স্বামী মারা গেলে কিংবা তালাকপ্রাপ্তা হলে, তার দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইসলাম কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি। এটি ইসলামে স্বীকৃত।

২০.মোহরানা ঃ

বিয়ের পর স্ত্রীরা নিজ অধিকারেই স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা প্রাপ্য হিসেবে পাবেন। এটি প্রত্যেক বিবাহিত মুসলমানকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। এটা কখনো মাফ হয়না।

Dhaka University Institutional Repository

২১.সদাচারণ পাবার অধিকার ঃ

স্বামীর পক্ষ থেকে কিম্বা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে নারীরা সদাচারণ পাবার অধিকারী । এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وعاشروهن بالمعروف

তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। সূরা নিসা : আয়াত ১৯

২২.ধর্মীয় মর্যাদা ঃ

পরিশেষে ইসলামী জীবন ধারায় মৌলিক উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসুল (সঃ)নর কিংবা নারীর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি করেননি। নারী -পুরুষ প্রত্যেকেই আল্লাহর উপাসনার মাধ্যমে পৃথকভাবে পারলৌকিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হতে পারেন। নিজ নিজ কৃতিত্বের জন্যে যেমনি ভাবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে , তেমনি অপকর্ম এবং অপারগতার জন্যে পৃথক জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর বাণীঃ

ومن يعمل من الصلحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك

يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا

"পুরুষ বা স্ত্রী যে লোকই নেক আমল করবে।ঈমানদার হয়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে , এ ব্যাপারে কারো প্রতি এক বিন্দু জুলুম ও করা হবে না।"[৪৪]

***অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও কর্ম সংস্থানের অধিকার ঃ**

ইসলাম জাতি -ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষ তথা প্রাণী কূলের খাদ্যের নিরাপত্তার অধিকার প্রদান করেছে।ইচ্ছা ও সামর্থ অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি যে কোন পেশা ও চাকরী গ্রহণ করতে পারে।

দুঃস্থ্য , পঙ্গু, ইয়াতীম মিসকীন ও সকল শ্রেণীর মানুষের জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদান ইসলামী রাষ্ট্র, ব্যবস্থার অপরিহার্য কর্তব্য।আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ "যাদের অভিভাবক নেই , তাদের অভিভাবক আমি"

এভাবে ইসলাম নারীদের মর্যাদা প্রদান করেছে।

৪৪.সুরা আন নিসা: আয়াত নং ১২৪

৪৪(ক).আল কুরআন: সুরা আননিসা: আয়াত নং ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

২. বাংলাদেশে নারীর মূল্যায়ন /ক্ষমতায়নঃ

প্রশাসন ও রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন শুরু হয় ১৯৭২ সাল থেকেই।তৎকালীন সরকার চাকুরীতে ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করে নারীর জন্য। বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়ন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গেজেটেড পদে শতকরা ১০ ভাগ এবং ননগেজেটেড পদে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগের শতকরা ৬০ ভাগ কোটা নারীদের জন্য সংরক্ষিত । অতি সম্প্রতি নৌ, সেনা এবং বিমান বাহিনীতে অফিসার পদে মহিলাদের নিয়োগের মাধ্যমে নারীর যোগ্যতা আরো কার্যকর করা হয়েছে।

১৯৭৩ সালে ২ জন নারীকে মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং ১৯৭৪ সালে একজন মহিলাকে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দেয়া হয়। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪৭ টি আসনে ৩৭ জন মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা হলেনঃ খুরশীদ জাহান হক , ড. হামিদা বানু, বেগম রওশন এরশাদ ও ইলেন ভুট্টো, বেগম খালেদা জিয়া (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) ও শেখ হাসিনা (বিরোধী দলীয় নেত্রী।)। এছাড়াও মন্ত্রীসভায় নিযুক্ত আছেন খুরশীদ জাহান হক (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়), সেলিমা রহমান (সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী)। ২০০২ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বহু নারী সরাসরি ভোটে চেয়ারম্যান ও মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন। এ ছাড়া বর্তমানে সচিব, উপসচিব, যুগ্ম সচিব, রাষ্ট্রদূত, বিচারপতি , কাষ্টমস কমিশনার , ডিসি, পুলিশ সুপার এমনকি ট্রাফিক পুলিশেও নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে।

বাংলাদেশে মোট নারীশক্তির পরিমাণ ২৫ মিলিয়ন। এর মধ্যে মাত্র ১০,০০০ জন নিয়োজিত প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা পেশায়। প্রায় ৭৯% নারী কাজ করেন কৃষি খাতে (কৃষি ও বনায়নসহ), ৯.৯% নারী কাজ করেন ম্যানুফ্যাকচারিং ও পরিবহন খাতে, ২.২৫ নারী বিপণন শ্রমিক ও ০.৬% নিয়োজিত করণিক পর্যায়ের কাজে।

সীমিত সংখ্যক নারী জড়িত আছেন সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্তরে । মোট ৫১ জন সচিবের মধ্যে মাত্র ১ জন নারী সচিব, ৮০ জন অতিরিক্ত সচিবের মধ্যে ১ জন নারী, যুগ্ম সচিবের ২৫১ জনের মধ্যে ৭ জন নারী রয়েছেন। ব্যাংকিং সেক্টরে ১ জন নারী জেনোরেল ম্যানেজার রয়েছেন। পুলিশ প্রশাসনে ৫ জন অতিরিক্ত নারী সুপারিন্টেন্ডেট এবং আর্মি মেডিকেল কোরে ১ জন নারী ব্রিগেডিয়ার কর্মরত আছেন ।

সংরক্ষিত কোটা পদ্ধতির ভিত্তিতে নারীরা পুরুষের সাথে সরকারি চাকরি করছেন ।সরকারি চাকরিতে ৮৫,০০০নারীর মধ্যে (কর্মরত মোট জনশক্তির ৮.৬%)মাত্র ১% মন্ত্রণালয়গুলোতে, ১৬.৫% স্বায়ত্তশাসিত

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থাগুলোতে এবং ৮২.৫%সাধারণ অফিসে নিয়োগপ্রাপ্ত । এদের মধ্যে ৭%প্রথম শ্রেণীতে, ৩%দ্বিতীয় শ্রেণীর ৭৫% তৃতীয় শ্রেণীর এবং ১৫.৪% চতুর্থ শ্রেণীর চাকরিভুক্ত। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত আসনের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত আসনের মধ্যে ৭জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং মন্ত্রীসভায় নারীর সংখ্যা হচ্ছে ৪।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৩ জন প্রেসিডিয়াম সদস্যের মধ্য ৩জন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির ৬৫ জনের মধ্যে ৩ জন নারী । বিএনপির ১৫ সদস্যবিশিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে মাত্র ১ জন এবং সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে ১১ জন নরী আছেন। ইউনিয়ন পরিষদের ৪২৭৬ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মধ্যে ২০ জন নারী, সাধারণ আসনে নির্বচিত ৩৮,৪৮৪ সদস্যের মধ্যে ১১০ জন নারী। সুনির্দিষ্টভবে নারীর বর্তমান অবস্থান নিয়ে আলোচানা করা হলো :

তৃনমুল পর্যায়ে (স্থানীয় সরকার)নারীর ক্ষমতায়ন :

নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান একটি পদক্ষেপ হলো তৃণমুল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা। নীতিনির্ধারনী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নারীর নেতৃত্ব , সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা এবং জনগণের সাথে নানা কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ খুব জরুরি একটি বিষয় ।৬ মে ২০০৩ স্থানীয় সরকার সহায়কগ্রুপ , পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআর সি)-এর উদ্যোগে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় ১৯৯৭ সালে ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে অংশ নিয়েছিলেন ১০২ জন এর মধ্যে বিজয়ী হন ২০ জন । এ সময় সাধারণ সদস্য পদে নির্বাচনে অংশ নেন ৪৫৬ জন এবং বিজয়ী হন ১১০ জন।[৪৫] ২০০৩ সালে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে ।২০০৩ সলে ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ২৩২ জন মহিলা নির্বাচনে অংশ নেন এবং বিজয়ী হন ২২ জন । সদস্যা পদে ৬১৭ জন অংশ নেন এবং বিজয়ী হন ৮৫ জন ।

*সরকার ও জাতীয়কৃত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারীর হার ৬ শতাংশের কম ।

*রাষ্ট্রীয় ও জাতীয়কৃত শিল্পে নারীর অবস্থান ৬ শতাংশ ৫৪।

*২৯টি ক্যাডারে নিয়োজিত পুরুষ কর্মকর্তা ২৪,৮৩৫ জন ।

*২৯টি ক্যাডারে নিয়োজিত মহিলা কর্মকর্তা ৪,২৬৭ জন ।

---

[৪৫].বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব :জেসমিন আরা; প্রকাশক :নারী কেন্দ্র: প্রকাশকাল, ২০০৪, পৃঃ ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের ক্ষমতাধর নারীদের কিছু ছবি

* বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা

*বৃটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের বিভিন্ন পার্লামেন্টে নারীর প্রতিনিধির একটি পরিসংখ্যানঃ

সুইডেনে পার্লামেন্টে নারীর আসন প্রায় সমান সমান ।সুইডেনে ৫৪.৭% পুরুষ এবং মহিলা ৪৫.৩%। পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধির শীর্ষ দেশগুলো হলঃ *নরওয়ে ৩৬.৪%,*আইসল্যান্ড ৩৪.৯%,*নেদার ল্যান্ড৩৬.৭%,*ডেনমার্ক ৩৮.০%,*ফিনল্যান্ড ৩৬.৫%,*অস্ট্রিয়া ৩৩.৯%,*জার্মানি৩২.২%,*নিউজিল্যান্ড২৯.২%,*আর্জেন্টিনা ৩০.৭%, *সিসিলিসি ২৯.৪%,*কোস্টারিকা ৩৫.১%,*কিউবা৩৬%,*দক্ষিণ আফ্রিকা ২৯.৮%, পক্ষান্তরে পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিত্ব সবচেয়ে কম হচ্ছে নাইজার ১.২%।* বাংলাদেশ ২.৩৩% *ইথিওপিয়া ৭.৭%,ইরান ৪.১%শ্রীলংকা ৪.৪% তুরস্ক৪.৪%,* মালদ্বীপ ৬% ও দক্ষিণ কোরিয়া ৫.৯%।

সংরক্ষিত মহিলা আসনে নারীঃ

সংরক্ষত মহিলা আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রিসভায় দায়িত্ব পালন করেছেন । এরা হলেন নুরজাহান মুরশীদ (প্রথম সংসদ) ড. আমিনা রহমান ,মাবুদ ফাতেমা কবীর ও বেগম তসলিমা আবেদ (দ্বিতীয় সংসদ), ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভুইয়া ও কামরুননেছা হাফিজ (৩য় সংসদ) সারোয়ারী রহমান ও জাহানারা বেগম (পঞ্চম সংসদ) এবং সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী (৭ম সংসদ) এছাড়াও আসন অনুযায়ী মহিলা সদস্যা ছিল।[৪৬]

পূর্ববর্তী সংসদগুলোতে সংরক্ষিত আসনে নারীদের অবস্থান ঃ[৪৭]

নির্বাচিত সাল	আসন সংখ্যা	পদ্ধতি	দলের নাম
১৯৭৩	১৫	নির্বাচিত ৩০০ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত	আওয়ামীলীগ
১৯৭৮	৩০	,,	বিএনপি
১৯৮৬	৩০	,,	জাতীয় পার্টি
১৯৯১	২৮+২=৩০	,,	বিএনপি ও জামাত
১৯৯৬	৩০	,,	বিএনপি
১৯৯৬	২৭+৩=৩০	,,	আওয়ামীলীগ ওজাতীয়পার্টি

৪৬.পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে; বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা : জালাল ফিরোজ: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, পৃঃ ১৫৮

৪৭. ড. নাজমা চৌধুরী,উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট .গাউড বুক ফর্ম প্লানারস(খসড়া রিপোর্ট) ১৯৯৪ ,সুত্র : বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্ব , জেসমিন আরা :পৃঃ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানে নারী:

এদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে।

*সংবিধানের ২৭ ধারায় বলা হয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'।[৪৮]

*২৮(১) ধারায় বলা হয়েছে ,বলা হয়েছে , 'কেবল 'ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী,নারী পুরুষ ভেদে বা জন্ম স্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রর্দশন করবে না'। [৪৯]

*২৮(২)'ধারায় উল্লেখ আছে রাষ্ট্র বৈষম্য ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে'। [৫০]

*২৮(৩)'ধারায় উল্লেখ আছে, কেবল 'ধর্ম,বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠিত বিষয়ে কোন নাগরিকের কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবধকতা, বাঁধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না'। [৫১]

*২৮(৪) ধারায় উল্লেখ আছে, 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতি জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত করবে না ।[৫২]

*২৯(১) এ বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিবেরর জন্য সুযোগের সমতা থাকবে'। [৫৩]

*২৯(২)ধারায় বলা হয়েছে:কেবল 'ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী ,নারী, পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সেক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

অর্থাৎ সংবিধানে নারীকে পুরুষের মত অধিকার ভোগ করার সুযোগ দিয়েছে।[৫৪]

---

[৪৮]. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান পৃঃ ১৩

[৪৯].প্রাগুক্ত ঃপৃঃ ১৪

[৫০].প্রাগুক্ত ঃপৃঃ ১৪

[৫১].প্রাগুক্ত ঃপৃঃ ১৪

[৫২].প্রাগুক্ত ঃপৃঃ ১৪

[৫৩].প্রাগুক্ত ঃপৃঃ ১৪

[৫৪].প্রাগুক্ত ঃপৃঃ ১৩

Dhaka University Institutional Repository

৩.ইসলাম প্রদত্ত নারীর অধিকার ঃ সার্বজনীন

ইসলাম মহান আদর্শের মূর্ত প্রতীক যা সর্বকালে এবং সর্বযুগে গ্রহণীয়, অনুকরণীয়।বর্তমানে সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে নারী এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীর মূল্যায়ন, অবমূল্যায়ন সম্পর্কিত আলোচনা উপরে যুক্তিসংগত ও তথ্যভিত্তিক উপস্থাপিত হয়েছে। ইসলামে নারীর মূল্যায়ন করা হয়েছে অত্যন্ত সম্মানের সাথে। নারীর মর্যাদাকে স্থান দিয়েছে অনেক উচ্চে ইসলামের সার্বজনীন এ আদর্শ আরো যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্যে অন্যান্য ধর্মের সাথে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা নিম্নে দেয়া হল।

খ্রিস্টানগন বলেন,

নারী হৃদয়হীন জন্তু এবং তাকে যৌন অনুভূতিহীন ভাবেই সারাজীবন অতিবাহিত করতে হবে।[৫৫]

ইসলামের নির্দেশনাঃ

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেনঃ

ان المسلمين و المسلمت و المؤمنين و المؤمنت
و القنتين و القنتت و الصدقين و الصدقت و الصبرين
و الصبرت و الخشعين و الخشعت و المتصدقين و
المتصدقت و الصآئمين و الصآئمت و الحفظين
فروجهم و الحفظت و الذكرين الله كثيرا و الذكرت اعد
الله لهم مغفرة و اجرا عظيما۔

নিশ্চয়ই আত্মসমর্পনকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পনকারী নারী,বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী,সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী,ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী,দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী,রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী-তাদের সকলের জন্যেই আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।[৫৬]

বাইবেলের উক্তিঃ

নারীই সর্বপ্রথম প্রতারিত হয়েছিল। সুতরাং নারীই হযরত আদম (আঃ)-এর পতনের জন্য দায়ী।

---

[৫৫] নারী ও সমাজ: আঃ খালেক পৃঃ ১৯

[৫৬] আল কুরআন ; সূরা আল আহযাব আয়াত নং ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

📖 **ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিঃ**

ইসলাম বাইবেলের এ অভিমতকে সমর্থন করেন না।ইসলামের ভাষা অত্যন্ত পরিষ্কার । আর তা হলঃ

হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত হাওয়া (আঃ) উভয়েই যুগপৎভাবে প্রতারিত হয়েছিলেন । সুতরাং তারা উভয়েই পতনের জন্য সমানভাবে দায়ী।

আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

وقلنا يآدم اسكن انت و زوجك الجنة وكلا منها رغدا

حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين

فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه

আর আমি বললাম, হে আদম ! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী বেহেশতে বসবাস কর এবং যা ইচ্ছা আহার কর। তবে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না । তাহলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু শয়তান তা হতে তাদের পদস্খলন ঘটালো এবং তারা যেখানে ছিল, সেখান হতে তাদেরকে বহিষ্কার করল।[৫৭]

☞ খ্রীস্টধর্মের অভিমতঃ

না পুরুষ নারীর জন্য এবং না নারী পুরুষের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

📖 **ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিঃ**

খ্রীস্টধর্মের এ মতবাদ ইসলাম স্বীকার করেনি। বরং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেনঃ

هن لباس لكم و انتم لباس لهن

তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (স্বামীগণ) তাদের পোশাক।[৫৮]

অর্থাৎ পোশাক ও দেহের মধ্যে যেমন কোন আবরণ থাকে না;বরং উভয়ের পরস্পর সম্পর্ক ও মিলন একেবারে অবিচ্ছেদ্য, তদ্রুপ সম্পর্কই তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে বিরাজমান রয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

يايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔

---

[৫৭] আল কুরআন : সুরা আল বাকারা : আয়াত নং ৩৫-৩৬

[৫৮] আল কুরআন : সুরা আল বাকারা: আয়াত ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

" হে মানব ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন ও তাদের দুজন হতে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করায়েছেন।"[৫৯]

হাদীছ শরীফে আছে, আল্লাহ তাআলা প্রথমে মাটি দ্বারা হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেন। পরে তার দেহ হতে আদি নারী হযরত হাওয়া (আঃ) কে পয়দা করেন। অতপর তিনি তাদেরকে স্বামী-স্ত্রীরূপে বিবাহে আবদ্ধ করে দেন। হাদীছ শরীফে আরও আছে, নারী পুরুষের জমজ জোড়ার অর্ধাংশ।[৬০]

☞ **কোন কোন ধর্মের অভিমত ঃ**

কোন কোন ধর্মে নারীকে An organ of Satan (শয়তানের অঙ্গ) বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৬১]

📖 **ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিঃ**

ইসলাম নারীকে সংরক্ষিত দুর্গ বলে আখ্যায়িত করেছেন। নারী কখনো শয়তানের অঙ্গ হতে পারে না।

রাসুল (সঃ) বলেন : মাতার পদতলে সন্তানের বেহেশত। এর দ্বারা নারী জাতিকে অতীব উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

☞ **কোন কোন ধর্মের অভিমত ঃ**

কোন কোন ধর্ম ও সভ্যতায় বিবাহ বন্ধনকে অবহেলা করা হয়েছে। বিবাহকে ক্ষতিকর অপমানজনক মনে করা হয়েছে।

📖 **ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিঃ**

ইসলামে বিবাহকে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসুল (সঃ) বলেনঃ

"বিবাহ আমার সুন্নাত এবং যে ব্যক্তি আমার সুন্নত পরিত্যাগ করে , সে আমার দলভুক্ত নয়।"[৬২]

তিনি আর ও বলেনঃ "যে ব্যক্তি বিবাহ করল সে ধর্মের অর্ধেক সম্পন্ন করল।"

এ ভাবে তিনি বিবাহের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন ।

বহু শতাব্দী যাবত পাশ্চাত্য জগতের নিকট ইসলামকে বিকৃতরূপে উপস্থাপনের সুপরিকল্পিত প্রবল প্রচেষ্টা চলে আসতেছে। খ্রীস্টানদের প্রতি ইসলাম এক প্রচন্ড চ্যালেঞ্জ। এর বিরুদ্ধে তাদেরকে ভিত্তিহীন ও মনগড়া অভিযোগ উত্থাপনে প্ররোচিত করেছে। নাস্তিক ও জড়বাদী পাশ্চাত্য ইসলামের মর্মকথা উপলব্ধি করতে না পেরে এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ

---

[৫৯].আল কুরআন : সুরা আন নিসা: আয়াত ১

[৬০].নারী ও সমাজ: প্রাগুপ্ত পৃঃ২১

[৬১].প্রাগুপ্ত পৃঃ ২২

[৬২].আল -হাদীস

Dhaka University Institutional Repository

পেশ করবে এবং এর কদর্থ করবে, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় , পাশ্চাত্যঘেঁষা, পাশ্চাত্য শিক্ষায় গর্বিত বহু মুসলমানও পরিপূর্ণ জীবন বিধানরূপে ইসলামের পরম সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে একান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে তাদের সাথে তাল মিলাতে শুরু করেছে। [৬৩]

এখানে তিনটি বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

*সপ্তদশ শতকের শুরু থেকেই জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মুসলিম নারীদের মহান অবদানের ক্ষেত্রে গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে ।[৬৪]

*ইসলামী আইন অনুযায়ী নারীদের প্রতি অসদাচরণকে কারো পক্ষেই বৈধ প্রমাণ করা সম্ভব নয় বা ইসলামী আইন মুতাবিক প্রদত্ত সুস্পষ্ট অধিকারকে কারো পক্ষেই বাতিল করা, বিকৃত বা সংকুচিত করা সম্ভব নয়।

*সব যুগেই মুসলিম নারীর যশঃখ্যাতি, সতীত্ব এবং মাতৃত্বের কর্তব্য পালন সমাজের বিদগ্ধজনদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে।

নারী সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।সমাজের উন্নয়ন ,অগ্রগতির তাদের অবদান অপরীসিম । তাইতো বিখ্যাত কবি কাজী নজরুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছেঃ

'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

পৃথিবীতে কল্যাণের ক্ষেত্রে নারীদের অবদান কোন অংশেই কম নয়। কবির কণ্ঠে আরো ধ্বনিত হচ্ছেঃ

'কোনকালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে ,শক্তি দিয়েছে বিজয়া লক্ষ্মী নারী'

নারী এতকাল ছিল পুরুষের উপর নির্ভরশীল । নারীর কোন স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃতি ছিল না। নারীর পরিচয় ছিল কখনো কন্যারুপে, কখনো ভগিনীরূপে, কখনো পত্নীরুপে, কখনো মাতারূপে। সর্বত্রই ছিল তারা নিঃসহায়, গলগ্রহতার প্রকৃতে রূপ । সুখের বিষয়, নারী আজ আর সেই বিগত শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তঃপুরে মৌনম্লান মুখে বসে নেই।সে সেই আলোহীন, প্রাণহীন দুর্ভেদ্য অন্তরাল থেকে বের হয়ে আজ আলোকিত জগতের উদর প্রঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ আমরা বুঝতে পেরেছি ,নারী

---

[৬৩] নারী ও সমাজ: প্রাগুপ্ত পৃঃ২৭

[৬৪] উদাহরণস্বরূপ , নদভী এ সুলাইমান , হিরোইক ডিডস অব মুসলিম উম্যান, ইসলামিক পাবলিকেশন লিঃ লাহোর পাকিস্তান। সিদ্দিকী, উম্যান ইন ইসলাম, ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক কালচার, লাহোর , পাকিস্তান ১৯৫৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

ও পুরুষ সমাজ জীবনের দুটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । সমাজ ও জাতি গঠনে উভয়েরই সমান ভূমিকা রয়েছে ।[৬৪]

তাইতো ইসলাম নারীদেরকে অধিকার দিয়েছে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্তরে । যে সব ক্ষেত্রে নারীকে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলঃ

*জননী হিসেবে।*কন্যা হিসেবে *স্ত্রী হিসেবে যা দরকার তা প্রদান করা হয়েছে।

দেয়া হয়েছেঃ

*মানবিক মর্যাদা * ব্যক্তিগত স্বাধীনতা *মৌলিক অধিকার *রাজনৈতিক অধিকার *জীবনের নিরাপত্তার *নিশ্চয়তা শিক্ষার অধিকার *জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকার চর্চায় উৎসাহ

*সামগ্রীক ক্ষেত্রে অধিকার প্রদান*অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার

* উত্তারাধিকার ক্ষেত্রে অধিকার *ভরণ-পোষণের অধিকার

*নিজস্ব সম্পদ অর্জনের অধিকার * স্বামী নির্বাচনের অধিকার

* তালাক গ্রহণের অধিকার *পূর্ণবিবাহের অধিকার

* মোহরানার অধিকার *সদাচারণ পাবার অধিকার

*ধর্মীয় মর্যাদা পাবার অধিকার

এর বিশদ আলোচনা উপরে করা হয়েছে।[৬৫]

এ সমস্ত অধিকার যদি সকল বর্ণ-গোত্র, জাতি, গোষ্ঠী, এর মধ্যে প্রদান করা হয় তাহলেই কাংক্ষিত সমাজ পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিবে। সমাজে শান্তির সুবাতাস বইবে। তবে নারী স্বাধীনতা মানে বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, অশ্লীলতা নয়। নারী স্বাধীনতা মানে বিধি বদ্ধ ভাবে জীবন যাপন। বেহায়াপনা, উলঙ্গপনার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। তাতে কখনো সমাজে শান্তি আসতে পারে না।

সাজ-সজ্জার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যুবতীদের মধ্য দুর্দমনীয় লালসার সঞ্চার করে।ফলে তারা বিপদগামী হয়। নারী প্রগতির বদৌলতে পাশ্চাত্য জগতে শান্তিপূর্ণ ও বিবাহিত জীবন একেবারে দুর্লভ হয়ে পড়েছে। জারজ সন্তানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফ্রান্সে প্রতি বছর সাতাত্তর হাজার জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে । ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে Diocesan Conference -উপাহাপিত রিপোর্টে ইংল্যান্ড সম্পর্কে বলা হয়ঃ

At least in every eight children from in England and Wales is conceived outside wedlock .One hundred thousand women in England and Wales are becoming pregnant outside of marriage every

---

[৬৪]উচ্চতর স্বনির্ভর বিতর্ক ভাষা- শিক্ষাঃ ড. হায়াৎ মামুদ : দি এ্যাটলাস পাবলিশিং হাউস , ৩৮/২ক,মল্লান মার্কেট (২য় তলা) বাংলাবাজার -ঢাকা । ষষ্ঠ সংস্করণ : জুন ২০০৪ পৃঃ ৩০৭

[৬৫]. নারীর অধিকার মর্যাদা দ্রষ্টব্যঃ

Dhaka University Institutional Repository

year. Of all the girls who marry under twenty years of age no less than 40 Percent are already pregnant on their wedding day.

"ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করে , বিবাহ বন্ধনের পূর্বে তাদের প্রতি আটজনের মধ্যে একজনের গর্ভাবাস হয়ে থাকে । ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে প্রতি বছর এক লক্ষ নারী বিবাহের পূর্বে গর্ভবর্তী হয় । বিশ বৎসরের কম বয়সে যে সকল বালিকার বিবাহ হয়, তার মধ্যে বিবাহ দিবসে যারা গর্ভবর্তী থাকে , তাদের সংখ্যা শতকরা চল্লিশের নিম্নে নয়।"[৬৭]

কিনসে (Kinsey) রিপোর্টে প্রকাশ, আমেরিকার পুরুষ অধিবাসীদের শতকরা পচানব্বই জন প্রচলিত নৈতিক মান অনুসারে নৈতিক দোষে দুষ্ট। চার-পাঁচ বৎসরের শিশুদিগকে ও যৌন অপরাধে লিপ্ত পাওয়া যায়। বিবাহের পূর্বে যৌন মিলন দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
ডাক্তার গণ বলেনঃ

Among the males going to collage about 67 Percent have such experience before marriage .Among those who go to a high school, about 84 percent have such intercourse's and among the boys who don't go beyond the grade school ,the accumulative evidence is 98 percent.[৬৮]

"কলেজগামী পুরুষদের শতকরা ৬৭ জন বিবাহের পূর্বে যৌন সম্ভোগ করে থাকে । হাইস্কুলগামীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৪ জন এ রূপ সম্ভোগ লাভ করে এবং যে সকল বালক গ্রেড স্কুল ছাড়ায়ে যায় না তাদের সংখ্যা শতকরা ৯৮ জন।"

বৈবাহিক জীবনের বিশ্বস্ততা ভঙ্গ করা আমেরিকাবাসীদের জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়েছে। শতকরা প্রায় ৫০ জন পুরুষ এ দোষে দুষ্ট। সমকাম দিন দিনই বেড়ে চলছে এবং তিনজন পুরুষের একজন এ অপরাধে অপরাধী। এমনকি পশুর সাথে যৌনকর্মে ও ব্যাপক হয়ে পড়েছে এবং প্রতি ১২ জন পুরুষের মধ্যে ১ জন এ নোংরা কাজে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। [৬৯]

---

৬৭. নারী ও সমাজ : আঃ খালেক পৃঃ ৯২
৬৮. Sexual Behaviour in Human Male.p.552.
৬৯. Ibid , P. 670

Dhaka University Institutional Repository

এখন সার্বজনীনতা প্রমানের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।তা হলঃ

*এ বিধানের কোন ক্ষতিকর প্রভাব আছে কি?
*এ আইন সকলের জন্য মঙ্গলজনক কি না ?
*এ বিধান প্রযোজ্য হলে কি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে?
*জাগতিক সমস্যার কোন সমাধান হবে কি?
*অন্যন্য ধর্মে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে কিনাঃ

নারীর মর্যাদা সম্পর্কে ইসলামের ভূমিকার দীর্ঘ আলোচনার পর সার্বজনীনতার যুক্তি তুলে ধরতে গিয়ে বলব যে, ইসলামের এ বিধানের কোন ক্ষতিকর প্রভাব নেই।কারণ সব ধর্মেই এখন নারীর মর্যাদার ব্যাপারে বেশ সচেতন। সকল ধর্মের জন্যই এটা মঙ্গলজনক এবং কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়ার কোন যুক্তি নেই।নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলে আর্থ-সামাজিক তথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে।অন্যান্য ধর্মে এর বিরূপ প্রভাব পরার কোন যৌক্তিকতা নেই।তাই বলব যে,ইসলামী আদর্শ হল সার্বজনীন।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে ও বেহায়াপণার দৃশ্য প্রবাহমান। অশ্লিলভঙ্গিমায় বিজ্ঞাপণ, অনেক প্রচার যন্ত্রেও তাদের অর্ধনগ্নতার দৃশ্য ঢালাওভাবে প্রচার করে।এতে বাস্তবিকপক্ষে তাদের মর্যাদারই হানি হচ্ছে।আর কিছু জ্ঞান পাপিরা ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি কলঙ্ক লেপন করতে উঠে পড়ে লেগে গেছে । তারা নারী স্বাধীনতার নামে যা ইচ্ছে তা করার অধিকার চাচ্ছে। ইসলামের নারীর অধিকারকে তারা তুচ্ছ , অবহেলা, বাঁকা দৃষ্টিতে দেখছে। অথচ ইসলামে নারীর মর্যাদাকে মহাসম্মানের আসনে আসীন করানো হয়েছে। তাইতো ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকারগুলো বাস্তবায়িত হলেই সমাজে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হবে।সকল জাতি ,গোষ্ঠী এর সুফল ভোগ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ প্রথা

বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন।সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী মূলতঃ একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। মানব বংশের স্থায়িত্ব ও সভ্যতা এর উপরই নির্ভরশীল। বিবাহ প্রথা চালু করে বলা হয়েছে , যৌন চাহিদা পূরণ কর; কিন্তু বিচ্ছিন্ন ও অনিয়মতান্ত্রিক সম্পর্কের দ্বারা নয়, প্রকাশ্য অশ্লীলতার পথেও নয়,বরং নিয়মতান্ত্রিক উপায় প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা।

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রন ও বিধি-নিষেধের দ্বারা যৌন উম্মাদনা ও উচ্ছৃংখলতার সকল পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যৌন চাহিদা চরিতার্থ করার জন্যে একটি পথ অবশ্যই খোলা রাখা আবশ্যক । এটাই ইসলামের বিবাহ প্রথা।[১]

সভ্যতার পরিপূর্ণতা বিকাশের পূর্বে কোন কোন অঞ্চলে বিবাহ বলতে কিছুই নেই মনে করা হত।এক নারী বহু পুরুষকে প্রেম নিবেদন করে। তারা একে অপরকে অর্থাৎ এক মহিলা অন্য মহিলাকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করত । এক নারী অন্য এক নারীকে তার মনের বাসনা ব্যক্ত করে বলে ঃ

A lover who comes to your bed of his own accord is more likely to sleep with his arms around you all night than a lover who has now here else to sleep. [২]

"যে প্রেমিক স্বেচ্ছায় তোমার বিছানায় আগমন করে সে যে তোমাকে বুকে লয়ে সারারাত যাপন করবে, এর সম্ভাবনাই সে প্রেমিক হতে অধিক যার রাত্রি যাপনের অন্য কোন স্থান নেই।"

বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র, বংশ, জাতি বিভিন্নভাবে বিবাহকে মূল্যায়ন করেছে।তবে সমাজ সভ্যতার পরিবর্তনে,সময়ের ঘূর্ণায়মান আবর্তে চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবুও এখনও অনেক দেশ এখন ও স্বাধীন যৌন কর্মে বিশ্বাসী।বিবাহের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। এ অধ্যায় বিভিন্ন ধর্মের, গোষ্ঠীর বিবাহ সম্পর্কিত মতামত, কার্যক্রম, দৃষ্টান্ত এবং সে সাথে বাংলাদেশে বর্তমান অবস্থা তুলে ধরব।পরিশেষে ইসলামী মূল্যোবোধ এবং বিবাহ সম্পর্কিত মতামতকে সার্বজনীনতার প্রমাণ সচেষ্ট হব।এ ক্ষেত্রে নিম্ন পর্যায়ক্রমিক ধারা অনুসরণ করব।

*১. বিভিন্ন ধর্ম, আইনে বিবাহ প্রথা ঃ

*২ . বাংলাদেশে বসবাসরত প্রধান প্রধান গোষ্ঠীর বা জাতির বিবাহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

*৩.সার্বজনীন আদর্শ ঃ

১.মুসলিম ,কিতাব আল-নিকাহ,১ম খন্ড,পৃ:৬২১

২.Germaine Greer ; The female Eunuch ,P:242 . MccRAW HILI.-1971

Dhaka University Institutional Repository

*১. বিভিন্ন ধর্ম, আইনে বিবাহ প্রথা ঃ

১.১ খৃষ্টান ধর্মে বিবাহঃ

বিশ্বের সবচেয়ে প্রগতির দাবিদার সম্প্রদায়ের ধর্ম হচ্ছে খৃষ্ট ধর্ম। অথচ এ ধর্মে বিবাহের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালার উল্লেখ নেই। এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন গ্রন্থে উল্লেখ আছে : "বাইবেলে নতুন নিয়মে বিবাহ সম্পর্কে কোন বিবরণ উল্লেখ নেই।" প্রকৃতপক্ষে বাইবেলে (সামাজিক জীবনের মূল ভিত্তি পরিবার তথা বিবাহ) বিবাহ সম্পর্কে কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ নেই। উক্ত নিবন্ধে আরো উল্লেখ আছে : খৃষ্ট ধর্মে বিবাহ নীতি সম্পর্কে এমন কোন সন্ধান পাওয়া যায় না যা প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না।[৩]

উপরের তথ্যের আলোকে বুঝা যায় যে,খৃষ্টান ধর্মে বিবাহের কোন সুস্পষ্ট নিয়মনীতি ছিল না। নারীর মর্যাদা ও অধিকার যৌন উপভোগ ও তৃপ্তি তথা যৌন সম্ভোগের ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা ও শালীনতার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করা হত না।প্রসিদ্ধ পন্ডিত হার্বার্ট স্পেনসার তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন:

"একাদশ ওপঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)এর আবির্ভাবের আট নয়শত বছর পরেও ইংল্যান্ডে নারী জাতি বাজারের পন্য দ্রব্যের মতোই বেচা কেনা হত। একাদশ শতাব্দীর ত্রয়োদশে ইংল্যান্ডের আদালতে এ আইন পাশ করা হয় যে,স্বামী তার স্ত্রীকে ইচ্ছামত অপরকে কর্জ বা ধার দিতে পারবে।"[৪]

এর চেয়ে আরও লজ্জাকর ও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যে, সাধারণ কৃষক-শ্রমিকের নব বিবাহিতা দুলাহানী পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামীর বাসর শয্যায় গমনের পূর্বে চব্বিশ ঘন্টার জন্যে ধর্মযাজক তথা পাদ্রীর অঙ্গশায়িনী হওয়ার প্রথা ও অধিকতর প্রচলিত ছিল।[৫]

১৮০৫খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে এ আইন জারি করা হয় যে, কোন স্বামী তার স্ত্রীকে যে কোন সময় বিক্রি করতে পারবে ।এ ক্ষেত্রে আইনে বিক্রয় মূল্য ও নির্ধারিত ছিল এবং তা ছিল একান্ত নগন্য ও অনুল্লেখযোগ্য। যা লিখতে ও লজ্জাবোধ হয়।একজন নারীর বিক্রয় মূল্য ছিল ৬ পেন্স বা অর্ধশিলি অর্থাৎ ৫০ পয়সা।[৬]

৩.Encyclopedia of Religion and Ethics :৮ম খন্ড: পৃষ্ঠা 433-436

৪. পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম, মাওঃ মুহাম্মাদ বুরহান উদ্দীন সাম্ভলী পৃষ্ঠা ৭৭

৫. المرأة بين العصة والقانون পৃঃ ২৪১

৬. পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম, প্রাগুক্ত :পৃষ্ঠা ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্টান ধর্মে বিবাহ ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী পবিত্র বন্ধন। যা আমৃত্যু বলবৎ থাকবে।[৭]

কিন্তু খ্রিস্টান জগতের শ্রেষ্ঠ অবতার ও খ্রিস্টধর্মের রচয়িতা সেন্ট পাল বিবাহকে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র ধর্ম বলে স্বীকার করেন না। আর এটাকে তিনি স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনের সম্মান জনক ও আনন্দদায়ক কিছু বলে বিশ্বাস করেন না।[৮]

বরং তিনি Necessary evil (জরুরী পাপ) হিসাবেই বিবাহের অনুমতি প্রদান করিয়েছেন।তিনি বলেন ঃ

> It is well for a man not touch a woman. It is well for a person to remain as he is, do not seek marriage .But if you marry, you do not sin and if a girl marries she does not sin yet those who marry will have worldly troubles. I want you to be free from anxieties. The unmarried man is anxious about the affairs of the Lord how to please the Lord; but the married man is anxious about worldly affairs, how to please his wife.[৯]

কোন নারীকে স্পর্শ না করাই পুরুষের জন্য ভাল।সে যেমন আছে, তদ্রুপ থাকাই তার জন্য উত্তম। বিবাহ করতে চেয়ো না। কিন্তু তুমি বিবাহ করলে তোমার পাপ হয় না এবং কোন বালিকা বিবাহ করলে সে ওপাপ করে না। তবে যারা বিবাহ করে, তারা পার্থিব দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়। সাংসারিক উদ্বেগ হতে মুক্ত থাকে। এটা আমি কামনা করি। অবিবাহিত পুরুষ ঈশ্বরের কাজে উদ্বিগ্ন, কিরূপে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যাবে। কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ে উদ্বিগ্ন, কিরূপে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে। আমি তোমার নিজ কল্যাণের জন্যই এ উপদেশ দিতেছি, তোমার উপর কোন বাঁধা আরোপের জন্য নয়, বরং শৃঙ্খলা স্থাপন এবং প্রভুর প্রতি তোমার অবিভক্ত অনুরক্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আমি এটা বলতেছি।

> He that gives her not in marriage does better.[১০]
> যে ব্যক্তি তার কন্যাকে বিবাহ দেয় না, সেই উত্তম কাজ করে।

১.২হিন্দু ধর্মে বিবাহ

প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন মতাবলম্বীর সংমিশ্রনে হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি। কালের ঐতিহ্যের কারণে একে সনাতন ধর্ম বলা হয়। এ ধর্মে বিবাহের কিছু রীতি-নীতির কথা বলা হয়েছে। বিবাহ সম্পর্কে কিছু ঐতিহ্য ও রীতি-নীতির

---

[৭] Pospishil , victor : Divorce and Marriage ,London p.৪৯

[৮] Klansner. Joseph : From Jesus to Paul ,London 1964, p.571-572

[৯] Bible -1, Corinthians .7: 1,26,28,29,32

[১০] Bible -1, Corinthians .V11 .7 P. 38

Dhaka University Institutional Repository

প্রথা চালু আছে। তবে বিবাহিত ছাড়া অন্য মহিলার সাথে যৌন সম্ভোগের ব্যাপারে ধর্মে খুব কড়া বিধি-নিষেধের অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না।এ ধর্মে কোন তালাকের বিধান নেই।একবার বিবাহ হওয়ার পর দাম্পত্য জীবন যতই কলহের অথবা অশান্তির সৃষ্টি হোক ; বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত অথবা বিচ্ছিন্ন হবার কোন প্রথা এ ধর্মে নেই।

শংকর জাতি হবার কারণে এদের বিবাহ প্রথার এত বৈচিত্রময় নিয়মনীতি প্রচলিত রয়েছে যার ফলে কোনটি বৈধ আর কোনটি অবৈধ - যৌন সম্ভোগের প্রতারণামূলক ব্যবস্থার কারণে তা নির্ণয় করা কঠিন। বিবাহের পর তাদের অবস্থা স্বামীর হাতে বন্দীদশা। বিবাহিত রমণীর সকল প্রকার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়।

তবে আধুনিক হিন্দু সমাজের ধর্মের অনেক সংস্কার হয়েছে। বিবাহ সর্ম্পকে তাদের দৃষ্টি ভঙ্গির অনেক পরিবর্তন হয়েছে । হিন্দু বিবাহ মুসলিম বিবাহের ন্যায় একটি চুক্তি নয়-বরং এটা একটি ধর্মীয় সংস্কার মাত্র । আইনসঙ্গতভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ধর্মীয় জীবন যাপন করা একটি পবিত্র ও করণীয় কর্তব্য । হিন্দু আইনে বিবাহকে একটি অবিচ্ছেদ্য বন্ধন হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।স্বামী-স্ত্রী রূপে পবিত্র জীবন-যাপন ও পুত্রলাভ করাই এটার উদ্দেশ্য । বিবাহ বন্ধনের ফলে দুইটি আত্মার একত্রে মিলন ঘটে। তাই প্রখ্যাত হিন্দু আইনবিদ Gour তার "The Hindu Code " - এ বলেন যে,

"A marriage is an alliance of between a man and woman recognized by law."[১১]

ইনসাইক্লোপিডিয়ায় হিন্দু ধর্মের প্রথা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। মনুস্মৃতিতে আট ধরণের বিবাহ পদ্ধতির অনুমোদন করা হয়েছে।
এর মধ্যে ৪টি অনুমোদিত এবং ৪টি বর্তমানে অনুমোদিত না।

অননুমোদিত(Unapproved)বিবাহের প্রকারভেদঃ

১)গান্ধর্ব বিবাহ ঃ বর কনের মনের মিলনের ফলে অনুষ্ঠিত বিবাহকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে। এ রূপ বিবাহে যুবক ও যুবতী নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী একে অপরকে স্বামী-স্ত্রীরূপে গ্রহণ করত। আধুনিক যুগের এ "love Marriage" বিবাহের অনুরূপ।

২)আসুর বিবাহ(Asura) ঃ এ রূপ বিবাহে পিতা কন্যার পণ বা মূল্য দাবী করত এবং উক্ত মূল্য দিতে সম্মত হলে বিবাহ কার্য অনুষ্ঠিত হত । এটাই হল আসুর বিবাহ।এ পদ্ধতি সাধারণত হিংস্র নিম্ন বর্ণের লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।এ পদ্ধতিতে নারীকে চিরদিনের জন্যে খরিদ করে নেয়া হতো।

---

[১১].হিন্দু আইন :মোঃ আলতাফ হোসেন পৃ:১২১

Dhaka University Institutional Repository

৩) রাক্ষস বিবাহ (Raksas) ঃ এ পদ্ধতিতে জোর পূর্বক পিত্রালয় হতে তরুণীকে ছিনতাই করে নেয়া হতো। সামরিক ক্ষত্রিয়রা সাধারণত এরূপ বিবাহ করত।

৪)পৈশাচ বিবাহঃ বলৎকার করে বা ঘুমন্ত অবস্থায় সতীত্ব হরণ করে বা মাদক দ্রব্য সেবনে চৈতন্য লুপ্ত করে বা অজ্ঞান অবস্থায় যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হত , তাকে পৈশাচ বিবাহ বলে।[১২]

১.৩ বৌদ্ধ ধর্মে বিবাহঃ

বৌদ্ধ ধর্মে বিবাহের কোন গুরুত্ব ছিল না। Encyclopedia of Religion and Ethics গ্রন্থে আছে ; বৌদ্ধ ধর্মে বিবাহ শুধু একটি সামাজিক বন্ধন মাত্র।এ থেকে বুঝা যায় যে, বিবাহের ধর্মীয় বা মনস্তাত্ত্বিক দিকের কোন গুরুত্ব বুদ্ধের ধর্মে স্বীকৃত ছিল না। ধর্মীয় দৃষ্টি কোন থেকে বিবাহের গুরুত্বহীনতার আরেক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই যে, বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ আছে যে, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ধর্ম প্রচারক চিরকুমার ব্রত পালন করবেন।জীবনে কস্মিন কালেও পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হবেন না।[১৩] ইয়াহুদী সমাজে বিবাহ ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার । সুতরাং এ জন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতি প্রয়োজন ছিল না।বাস্তবে এটা ছিল এক প্রকার ব্যবসা এবং যৌতুকের গুরুত্ব এতে খুব বেশী ছিল না।[১৪]

সন্তান উৎপাদনই ছিল বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য কাজেই সন্তান জন্মদান ব্যতীত দাম্পত্য জীবনের দশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেলেও স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত বা সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারত।[১৫]

১.৪ রোমক আইনে বিবাহ

প্রাচীন গ্রীসে একটি অদ্ভুত ও অভিন্ন আশ্চার্যজনক হিংস্র পাশবিক প্রথা প্রচলিত ছিল যে, পরিবারের সর্বময় কর্তৃত্ব যে পুরুষের হাতে ন্যাস্ত থাকতো সে শুধু স্বীয় স্ত্রীর উপরই জীবজন্তুর মতো আচরণে সীমাবদ্ধ থাকতো না বরং স্বীয় পুত্রবধু , কন্যা, পৌত্র-পৌত্রীদের উপর অমানুষিক পাশবিক আচরণের অধিকারী ছিল। পশুর মতো তাদের বিক্রি করা ও দেশান্তর করণের ইখতিয়ার তার হাতে ন্যাস্ত ছিল। রোমক আইনেও বিবাহের তেমন গুরুত্ব ছিল না।বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চলত

১২.মনুস্মৃতি,৮ম খন্ড,পৃষ্ঠা৪৫১

১৩.Encyclopedia of Religion and Ethics: ৮ম খন্ড পৃষ্ঠা৪৫১-৪৫২

১৪.Report of the Commission , Marriage .Divorce and the Church, London 1971,P. 9-80

১৫.নারী ও সমাজ : আঃ খালেক: পৃঃ ১০

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ ইসলাম ধর্মে বিবাহের গুরুত্ব ঃ

ইসলাম ধর্মে পরিবার গঠনের অন্যতম স্তরই হচ্ছে বিবাহ। নারী-পুরুষের সঙ্গে বৈধ সম্পর্কের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে বিবাহ। বিবাহের মাধ্যমেই একজন পুরুষ ও একজন নারীর উপর অধিকার বর্তায়। স্বামী স্ত্রী যখন বৈধভাবে যৌন সম্ভোগ উপভোগ করে তখনই পারিবারিক ভিত্তি স্থাপিত হয়।

বিয়ে এবং স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থাকে নবী ও রাসুলগনের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার এক বিশেষ দান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً

হে নবী !তোমার পূর্বেও আমি অনেক নবী ও রাসুল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্য স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।[১৬]

সূরা আন-নূরে বয়স্ক ছেলে মেয়ে ও দাস-দাসীদের বিয়ের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم

এবং বিয়ে দাও তোমাদের এমন সব ছেলে-মেয়েদের যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই,বিয়ে দাও তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিয়ের যোগ্য হয়েছে।[১৭]

নবী করীম (সঃ)এরশাদ করেন:

اربع من سنن المرسلين التعطر والنكاح والسواك والختان

চারটি কাজ নবীগনের সুন্নতের মধ্যে গণ্য; তা হচ্ছে: সুগন্ধি ব্যবহার করা, বিয়ে করা, মিসওয়াক করা এবং খাতনা করানো।[১৮]

একবার কিছু সংখ্যক সাহাবী সারা রাত ধরে ইবাদত করার,সারা রাত জেগে থেকে নামাজ পড়ার, সারা বছর ধরে রোযা রাখার এবং বিয়ে না করার সংকল্প গ্রহণ করেন। নবী করীম (সঃ)এ সব কথা শুনতে পেয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং রাগত স্বরে বলেন:

انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله انى لاخشاكم لله واتقاكم له

لكنى اصوم وافطر واصلى وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى

فليس منى (بخارى ومسلم)

১৬ .সূরা আর-রায়াদ: আয়াত নং ৩৮

১৭ .আল কুরআন: সূরা আন-নুর :আয়াত নং ৩২

১৮ .আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা : আল জামে আত তিরমিজি : মাকতাবা রশীদিয়া দিল্লী পৃঃ ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

তোমরাই কি এ ধরণের কথাবার্তা বলনি? আল্লাহর শপথ একি সত্যি নয় যে, আমিই তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি,আমিই তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেচেঁ থাকি?.....কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি রোযা রাখি,রোযা ভঙ্গ ও করি, নামাজ পড়ি,শুয়ে নিদ্রাও যাই এবং রমণীদের পাণি ও গ্রহণ করি। এ হচ্ছে আমার নীতি;আদর্শ; অতএব যে লোক আমার এ নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুতি হবে,সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।[১৯]

হযরত আনাস (রাঃ)হতে বর্ণিত আছে,তিনি বলেন:

.... كان النبى ﷺ يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا

(مسند احمد)

নবী করীম (সঃ) আমাদেরকে বিয়ে করতে আদেশ করতেন,আর অবিবাহিত নিসঙ্গ জীবন যাপন করা থেকে খুব কঠোর ভাষায় নিষেধ করতেন।[২০]

ইবনে মাজাহ কিতাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

قال رسول الله ﷺ النكاح من سنتى فمن لم يعمل بسنتى فليس منى

ابن ماجه ابواب النكاح

রাসুলে কারীম (সঃ)বলেছেন,বিয়ে করা আমার আদর্শ ও স্থায়ী নীতি, যে লোক আমার এ সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবে না,সে আমার দলভুক্ত নয়।[২১]

বিবাহ মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।ব্যষ্টি ও সমষ্টির উপর তা বর্জনের কুফল অতীব মারাত্মক। সর্বোপরি মানবগোষ্ঠীর সংরক্ষণ ও সভ্যতা এর উপরই নির্ভর করে।

তাইতো ইসলামে বিবাহের প্রতি এত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসুল করীম (সঃ)সমাজের যুবক-যুবতীদের সম্বোধন করে বলেছেন:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض

للبصر واحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

"হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিয়ে করা কর্তব্য। কেননা বিয়ে দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী, যৌন অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষাকারী। আর যার সামর্থ্য নেই সে যেন রোযা রাখে। যেহেতু রোযা হবে তার ঢাল স্বরূপ।"[২২]

---

[১৯] সহীহ মুসলিম , ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : মাকতাবা রশিদীয়া দিল্লী : খৃঃ ১৯৩৮ :কিতাবুন নিকাহ : হাদীস নং ৩২৬৯

[২০] .মুসনাদে আহমাদ

[২১] .সুনানে ইবনে মাজাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ ; আবওয়াবুন নিকাহ ; বাবু মা জাআ ফি ফদলুন নিকাহ ; কুতুবখানা রশিদিয়া দেওবন্দ ; তা বি : পৃঃ ১৩৪

[২২] .সহীহ মুসলিম;প্রাগুক্ত ;হাদীস নং ৩২৬৪ : উৎস ঃ পরিবার ও পারিবারিক জীবন ।মাওলানা মুহম্মদ আবদুর রহীম : পৃঃ ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ আল্লামা নাফীসী বলেছেন ঃ

وقد يستحيل المنى المنى الى طبعية سمية ويرسل الى القلب
والاماغ بخارا رديا سميا يوجب الغشى والصرع ونحوبما

"শুক্র প্রবল হয়ে পড়লে অনেক সময় তা অত্যন্ত বিষাক্ত প্রকৃতি ধারণ করে বসে। দিল ও মগজের দিকে তা এক প্রকার অত্যন্ত খারাপ বিষাক্ত বাষ্প উত্থিত করে দেয়। যার ফলে বেহুশ হয়ে পড়া বা মৃগী রোগ প্রভৃতি ধরণের ব্যাধির সৃষ্টি হয়।"[২৩]

*২. বাংলাদেশে বসবাসরত প্রধান প্রধান গোষ্ঠীর বা জাতির বিবাহের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিঃ

বাংলাদেশে মুসলমান, হিন্দু,বৌদ্ধ,খৃষ্টান সম্প্রদায় সহ আরো অনেক উপজাতি বসবাস করে। বিভিন্ন ধর্মে বিবাহকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তবে সমাজ সভ্যতার বিবর্তনে, আধুনিকতার পরশ স্পর্শে, গোড়ামী, কুসংস্কার আর ভ্রান্ত ধারণাকে নির্মূল করে, ধর্মীয় গোড়ামী আর নারীর প্রতি তাচ্ছিল্য মনোভাব পরিহার করে বিভিন্ন জাতি,গোষ্ঠী নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শুরু করছে। বর্তমান সভ্য সমাজ বিবাহের গুরুত্বকে উপলব্ধি করেছে। হিন্দু,বৌদ্ধ,খৃষ্টান সম্প্রদায় সহ আরো অনেক উপজাতি বিবাহকে অনেকটা গুরত্বের সাথে বিবেচনা করছে।

হিন্দু আইনে বিবাহকে একটি বা Sacrament ধর্মীয় সংস্কার হিসবে অভিহিত করা হইয়েছে। হিন্দু আইনে যে কয়টি পবিত্র করণীয় ধর্মীয় সংস্কার রয়েছে রিবাহ এটার মধ্যে একটি। শাস্ত্র হতে, "It is more a religious than a secular institution."

তাই, মুসলিম আইনের মত একে দেওয়ানী চুক্তি না বলে Sacrament বা ধর্মীয় সংস্কার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হিন্দু আইনে সস্ত্রীকে সকল ধর্ম-কর্ম পালন করবার নির্দেশ আছে বলে স্ত্রীর অপর নাম সহধর্মিনী রাখা হয়েছে। একই ভাবে স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের পারস্পারিক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ বলে স্ত্রীর অপর নাম অর্ধাঙ্গী। এ রুপে বৈবাহিক সম্পর্কের দারুণ স্বামী ও স্ত্রীর মাংসের সাথে মাংসের এবং হাড়ের সাথে হাড়ের মিলন সংগঠিত হয়। ফলে হিন্দু বৈবাহিক মিলন অবিচ্ছেদ্য বলে গণ্য হয়। তাই চরিত্রের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যে গুণেই এটা (বিবাহ) সমাধিক পরিচিত।[২৪]

---

[২৩].নাফীসি ঃ পৃঃ ৪১৪

[২৪].হিন্দু আইন :মোঃ আলতাফ হোসেন পৃ:১২২

Dhaka University Institutional Repository

৩. সার্বজনীন আদর্শ ঃ

মানব বংশ বৃদ্ধির অন্যতম একমাত্র বৈধ পন্থা হল বিবাহ।বিবাহ ছাড়া অবৈধ পন্থায় যে সন্তান জন্ম হয় আমাদের পরিভাষায় তাকে জারজ সন্তান বলি;যে সাধারণত সমাজে নিগৃহীত এবং সমাজ জীবনে সকলে তাকে ঘৃণা চোখে দেখে।

নারী প্রগতির বদৌলতে পাশ্চাত্য জগতে শান্তিপূর্ণ ও বিবাহিত জীবন একেবারে দূর্লভ হয়ে পড়েছে। জারজ সন্তানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।ফ্রান্সে প্রতি বছর সাতাত্তর হাজার জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে । ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে Diocesan Conference -উপাস্থাপিত রিপোর্টে ইংল্যান্ড সম্পর্কে বলা হয়ঃ

At least in every eight children from in England and Wales is conceived outside wedlock .One hundred thousand women in England and Wales are becoming pregnant outside of marriage every year. Of all the girls who marry under twenty years of age no less than 40 Percent are already pregnant on their wedding day.

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করে , বিবাহ বন্ধনের পুর্বে তাদের প্রতি আটজনের মধ্যে একজনের গর্ভাবাস হয়ে থাকে । ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে প্রতি বছর এক লক্ষ নারী বিবাহের পুর্বে গর্ভবর্তী হয় । বিশ বৎসরের কম বয়সে যে সকল বালিকার বিবাহ হয় , তার মধ্যে বিবাহ দিবসে যারা গর্ভবর্তী থাকে , তাদের সংখ্যা শতকরা চল্লিশের নিম্নে নয়।[২৫]

বৈধ পন্থায় জন্মগ্রহণকারী শিশু সমাজের চোখে অনেক মূল্যবান । এর অন্যতম মাধ্যম হল বিবাহ। তাইতো ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য অত্যন্ত জোরালো ভাবে বিধৃত হয়েছে। ইসলামে বৈরাগ্য প্রথাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

ভ্যান্স প্যাকার্ড বিবাহের কুফল সম্পর্কে বলেনঃ[২৬]

১) বিবাহ বন্ধনের বাইরে অবৈধ যৌন কর্মের বৃদ্ধি;

২) পরিবার সংরক্ষণের দায়িত্ব পুলিশ ও সামরিক সংস্থার উপর সমর্পন;

---

[২৫] .নারী ও সমাজ : আঃ খালেক পৃঃ ৯২

[২৬].Vance Packard: The Sexual wilderness. Page-288

Dhaka University Institutional Repository

৩) পারিবারিক জীবন ধবংস হওয়ার ফলে চলচিত্র,টেলিভিশন, খেলাধুলা, প্রদর্শনী প্রভৃতিতে পারিবারিক জীবনের শান্তি অন্বেষা এবং

৪) বৃদ্ধ মাতাপিতার নিরাপদ আশ্রয় রুপে পরিবার বিলুপ্তি।

তাইতো স্বাদহীন ও নিরুৎসাহিত জীবন-যাপন প্রণালী ইসলাম প্রদান করেনা। অন্যধর্মে জীবনের সকল আনন্দ উপভোগের বর্জনই পূন্যলাভের উপায়। এমন জীবন ইসলামের কাম্য নয়।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিবাহের যে উদ্দেশ্য ও উপকারিতা বুঝা যায় তা প্রধানত এই;

১)নারী-পুরুষের জন্মগত যৌন বাসনা পূরণের পন্থাকে বিধিবদ্ধ করা এবং যৌন উচ্ছৃংখলা হতে তাদেরকে নিস্কলুষ রাখা।

২)নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজিত স্বাভাবিক আরর্ষণ প্রেম-প্রীতি,মমতা-ভালবাসা ও হৃদ্যতার চাহিদা বিশুদ্ধ পন্থায় পরিপূর্ণ করা

৩)মানব বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার ।

৪)পরিবার গঠন তথা মানব সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করা ।[২৭]

ডঃ ওয়েষ্টার মর্ক বলেন;

There are three essential elements in every normal marriage the gratification of the sexual impulse the relation between husband and wife a part from it and procreation of children. [২৮]

প্রতিটি নিয়মিত বিবাহে তিনটি অত্যাবশ্যক মূল বস্তু নিহিত রয়েছে।যৌন বাসনার নিবৃত্তি, তদুপরি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক এবং সন্তান উৎপাদন।

তাই বিবাহ একটি আবশ্যক বিধান।আল কুরআন ও হাদীসে এর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।উপরে[২৯] এ ব্যপারে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

---

[২৭].নারী :আব্দুল খালেক :পৃঃ ১৭৯

[২৮].Dr. Wester Mark: The future of marriage in western civilization.

[২৯]. ইসলাম ধর্মে বিবাহে গুরুত্ব দ্রঃ

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের এ বিবাহের গুরুত্ব প্রদানের নীতি তথা প্রয়োজনীয়তা সর্বজাতির জন্যে তা প্রযোজ্য কিনা এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়টির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধন করব।

*এ বিধানের কোন ক্ষতিকর প্রভাব আছে কি?
*এ আইন সকলের জন্য মঙ্গলজনক কিনা ?
*এ বিধান প্রযোজ্য হলে কি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে?
*জাগতিক সমস্যার কোন সমাধান হবে কিনা।
*অন্যান্য ধর্মে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে কিনাঃ

বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার প্রেক্ষাপটে বিবাহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। ক্ষতি বা অমঙ্গলের কোন প্রশ্নই আসে না। বরং বিবাহ হলে সমাজের মধ্যে একটি স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আসে। নারী-পুরুষের মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়ে।পারিবারিক ধারা বজায় থাকবে ।বৈধ সহায় বংশের ধারা বজায় থাকবে। তাই জাগতিক কোন সমস্যার কোন লক্ষণ নেই ।

অন্য ধর্মেও বর্তমানে বিবাহকে বেশ গুরুত্বের সাথে প্রধান্য দিচ্ছে।পুরাতন ধ্যান ধারণা অনেক পরিবর্তন হয়েছে।সভ্য সমাজে বসবাস করে সকল গোষ্ঠীর মধ্যে আধুনিকতার রূপ গ্রহণ করেছে। যারা বিবাহের ঘোর বিরোধীতা করেছে তারাও আজ এ বিবাহের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। তাদের নেতিবাচক ধারণা পরিবর্তন করেছে।তাইতো বলব, সার্বজনীন ইসলামের বিবাহ সম্পর্কিত গুরুত্বের নির্দেশ সকলের জন্যই মঙ্গলজনক।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ
বহু বিবাহ

পারিবারিক শান্তি আনায়নে ইসলাম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। শান্তির অন্বেষায় বিভিন্ন নীতি, আইন-কানুন প্রয়োগ করেছে।ইসলামে বিবাহের প্রতি যেমন গুরুত্বারোপ করেছে তেমনি শান্তি আনায়নে, অশান্তি বিশৃংখলা দূরীকরণে বহু বিবাহের অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য কোন কোন গোষ্ঠী, বস্তুবাদীরা ইসলামের এহেন বিধানকে ধিক্কার দিয়েছে। চশমা পরিহিত জ্ঞান পাপিরা আবার একে সভ্যতা বিবর্জিত বলেও আখ্যা দিয়েছেন। অত্র আলোচনায় মুখোশধারী প্রগতিবাদীদের মুখোশ উন্মেচিত হবে। ভ্রান্ত ধারণার অবসান হবে বলে আমার বিশ্বাস। বহু বিবাহ প্রথা বিভিন্ন ধর্মে , বিভিন্ন জাতীতে ছিল । কোন কোন ধর্মে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। আবার কোন কোন ধর্মে একজন নারী একাধিক স্বামী ও একত্রে গ্রহণ করতে পারত। তবে ইসলাম প্রদত্ত বহুবিবাহের নীতিমালা যে সর্বগ্রাহ্য তা তুলে ধরার জন্য নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রমিক ধারা অনুসরণ করব।

*১. বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে বহু বিবাহ
*২. বাংলাদেশে বহু বিবাহের পদ্ধতি
*৩. সার্বজনীন আদর্শ।

*১. বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে বহু বিবাহ

প্রাচীন কালে বিভিন্ন রকমের বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল । একজন স্বামী যেমন একাধিক নারী বিবাহ করতে পারত তেমনি একজন নারীও একাধিক স্বামী বিবাহ করতে পারত।বহু স্বামী গ্রহণের প্রচলিত নিয়ম এই ;

বড় ভাই এক নারীকে বিবাহ করলে সে গোটা পরিবার তার স্ত্রী হয়ে পড়ে। স্বামীর অন্যান্য ভাই ও অতি নিকট আত্মীয়-স্বজন তার উপর স্ত্রীত্বের অধিকার লাভ করে। স্ত্রীর সঙ্গলাভের অগ্র-পশ্চাৎ প্রশ্নে তাদের মধ্যে কখনো ও কোনোরূপ মতানৈক্য, হিংসা-বিদ্বেষ ও মন কষাকষির উদ্রেক হলে সকলের মঙ্গল কামনা তারা বিসর্জন দিয়ে থাকে।[১]

তবে এ স্ত্রী সন্তান প্রসব করলে কখনো বিবাদ বাঁধে। এ সিদ্ধান্তের ভার কোন কোন সময় স্ত্রীর উপর অর্পন করা হয়ে থাকে ।

বহু বিবাহের অপর প্রথা হল; একজন পুরুষ যখন কোন পরিবারের বড় বোনকে বিবাহ করবে তখন সে অন্য ছোট বোনদের উপর কতৃর্ত্ব পাবে।

---

[১].নারী; আব্দুল খালেক পৃষ্ঠা নং ৩০০

Dhaka University Institutional Repository

আবার যখন সে ছোট বোনকে বিবাহ করবে তখন সে তার ছোট বোনদের উপর স্ত্রীর কর্তৃত্ব পাবে। বড় বোনদের উপর নয়।

১.১ ইহুদি ধর্মে ঃ

ইহুদি ধর্মে একই সময় কতজন স্ত্রী রাখতে পারবে এধরণের কোন সুনির্দিষ্ট বিধান ছিল না। তবে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রীতিই সাধারণত প্রচলিত ছিল।[২]

ইহুদীরা যাদেরকে নবী হিসাবে মেনে থাকে তাঁদের অধিকাংশই একাধিক বিয়ে করেছেন। তাদের ধর্মশাস্ত্র তালমুদ বলে,

ডেভিড এর একশত স্ত্রী ছিল, আর সলেমান এর ছিল কয়েকশ স্ত্রী। নবীদের যাঁরা নিষ্ঠাবান অনুসারী ছিলেন, তাঁদের ও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের কথা জানা যায়। ওল্ড টেস্টামেন্টের ভাষ্যমতে যে গিডিয়ানের উপর খোদার জ্যোতি পড়ত, তাঁর অসংখ্য স্ত্রী ছিল। সমাজবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড ওয়েষ্ট তাঁর History of Marriage গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে বলেন, "ইহুদী বিবাহ আইনে বহু বিবাহের স্বীকৃতি আছে।"[৩]

জে হেস্টিংস সম্পাদিত The Dictionary of Bible গ্রন্থে বলা হয়েছে, "বহু বিবাহ একটি বাস্তবতা কারণ আব্রাহাম,দাউদ,জেকব, সলোমন এর চর্চা করেছেন।"[৪]

১.২ খ্রীষ্টান ধর্মেঃ

খ্রীষ্টানদের মধ্যে এক স্ত্রী গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল। তবে লুথারের যুগে চার্চ ও দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলহেম একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে নুরেণবার্গ কনফারেন্সে যুদ্ধের কারণে পুরুষের সংখ্যা হ্রাস জনিত সমস্যা সমাধান কল্পে জনগণকে একধিক স্ত্রী গ্রহনের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড জনগণকে একাধিক বিবাহের অনুমতি প্রদান করে আইন প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাদ্রীদের বিরোধীতার জন্যে তা সম্ভব হয়নি।[৫]

উল্লেখ্য যে, হিটলার একাধিক বিবাহের অনুমতি প্রদান করে আইন করতে চেয়েছিলেন।কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে তিনি তা করতে

২.Said Abdullah Zeif Hatimy:Ibid, Page ৬১

৩.ডঃ জামাল বাদাবী: ইসলামের সামাজিক বিধান,১১৭

৪.ডঃ জামাল বাদাবী: প্রাগুপ্ত:১১৯

৫.নারী: আব্দুল খালেক : পৃষ্ঠা নং ৩০২

Dhaka University Institutional Repository

পারেননি।দেশের অবিবাহিত নারীর সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে জার্মানীর বনের লোকেরা ১৯৪৯খৃষ্টাব্দে আবেদন জানায়।[৬]

এক ইংরেজ মহিলার প্রতিবেদনঃ

১৯০১ খৃস্টাব্দের ২০ এপ্রিলের Lagos Weekly Record এ লন্ডনে ট্রথে প্রকাশিত জনৈকা ইংরেজ মহিলার একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এর সার সংক্ষেপ এইঃ

> ভবঘুরে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমাদের সমাজে এটা উৎপাতের সৃষ্টি করেছে। আমি স্বয়ং স্ত্রী লোক বলে এ হতভাগিনী মেয়েদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে অবলোকন করে থাকি। কিন্তু আমার এ করুণা ও সহানুভূতি কি অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করতে পারবে অথবা এ রোগ উপশমে কোন সাহায্য করবে? টমাস উত্তম কথাই বলেছেন। তিনি রোগ নির্ণয় করেছিলেন এবং রোগের উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্রও দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি প্রদানই এ সমস্যার একমাত্র সমাধান। এর মাধ্যমেই এ দুর্বিপাক দূরীভূত হতে পারে। কারণ তখন হতভাগিনী মেয়েরা গৃহবধুতে পরিণত হবে। কিন্তু ইউরোপের দুর্দশা হল একজন পুরুষ মাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ করে এর সাথে থাকবে বহু অবৈধ সন্তান -যারা সমাজের কলঙ্ক ও বোঝা স্বরূপ। বহুবিবাহের অনুমতি থাকলে এ রূপ দুঃখজনক ঘটনা ঘটত না।[৭]

খ্রীষ্টান ধর্মে নয়, বরং খ্রীষ্টান সমাজে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।বিধি নিষেধ আরোপ প্রত্যাহারের যাজকদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব ছিল। তাই দেখা যায় বৃটেনের রাজা দ্বিতীয় উইলিয়াম এবং হেসে ফিলিপ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে মার্টিন লুথারের অনুমতি লাভ করেছিলেন।লুথার বলেন যে, খোদা এটা নিষেধ করেন নি।[৮]

মার্কিন কংগ্রেস আইন করে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করে ১৮৬২ সালে। খৃষ্টধর্ম প্রবর্তনের প্রায় পৌনে দুই হাজার বছর পর। যুক্তরাষ্ট্রের নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান সম্প্রদায় মর্মনরা ১৮৯০ সাল পর্যন্ত এর অনুশীলন করে। এ সালে এসে তাদের গীর্যা একাধিক বিয়ে অবৈধ ঘোষণা করে। এখনো যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে বহু-বিবাহ চালু আছে।[৯]

---

[৬] Every man's Encyclopedia, Vol- 16; Said Abdullah self Al-Hatimy Woman in Islam. P. 65

[৭].Dr. Mustafa as-Sibaajy: Al-Manna Bina al-Fiqh wal Qaanun.

[৮].ডঃ জামাল বাদাবী: ইসলামের সামাজিক বিধান,১১৮

[৯].The world Book Encyclopedia, Polygamy

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ হিন্দু ধর্ম/ভারতে বিবাহঃ

বৈদিক যুগ এবং এর পরবর্তীকালে ও ভারতে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন পুরুষ একই সময়ে যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত।[১০]

হিন্দুদের মধ্যে একজন নারী একাধিক স্বামীও গ্রহণ করতে পারত। পান্ডবদের পাচঁ ভাই এর একই স্ত্রী ছিল। মনুর যুগেও বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। একজন ব্রাহ্মণ চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত। একজন ব্রাহ্মণ গোত্রের এবং অপর তিনজন বাকী তিন গোত্রের।

হিন্দু ধর্মে বহু বিবাহের কোন বাঁধা নেই।বর্তমানে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের প্রবণতা মুসলিমদের চেয়ে হিন্দুদের মধ্যে বেশী। ইসলামে নারী অধিকার বিষয়ক কমিটি ১৯৭৫ সালে একটি রির্পোট প্রকাশ করে।এতে দেখা যায় ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সলের মধ্যে যত বহু বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তার ৫.০৬% হিন্দুদের মধ্যে এবং মাত্র ৪.৩১% মুসলিমদের মধ্যে। ভারতের শুধু মুসলিমদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আইনগত বৈধতা আছে। হিন্দুসহ সব অমুসলিমের জন্য এটা অবৈধ। তথাপি হিন্দুদের মধ্যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের হার মুসলিমদের চেয়ে বেশি।[১১]

হিন্দুরা যাদের অবতার জ্ঞান করে তাদের অনেকে এবং যাদের পরম পূঁজনীয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মনে করা হয় ,তারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরুপ, রামের পিতা রাজা দশরথের একাধিক স্ত্রী ছিল। শ্রীকৃষ্ণের কয়েকজন স্ত্রী ছিল। একটি বিশ্বকোষে এ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ-
"The Hindu religion sets no limit on the number of women who may be married to one man" অর্থাৎ কতজন নারী একজন পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে , সে ব্যাপারে হিন্দু ধর্মে কোন সীমা নির্দেশ করেনি।[১২]

১.৪ রোম ও ফ্রান্সে বিবাহঃ

খ্রীষ্টান ধর্মের অধীন আসার পুর্ব পর্যন্ত রোম ও ফ্রান্সে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। তৎপর রোমান আইন প্রণেতা জাষ্টিনিয়ান এক স্ত্রী গ্রহণের আইন প্রণয়ন করেন।

---

১০. India status of women in Ancient India, Page ৬৬
১১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ৪৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা পৃঃ ২১৩
১২. The world Book Encyclopedia, Polygamy

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ জোরোয়াস্ট্রিয়ান ধর্মে

জোরোয়াস্ট্রিয়ান ধর্মে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারবে ,এটার কোন সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না। তদ্রুপ খ্রীস্টান ও বৈদিক হিন্দুধর্মেও সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না ।

১.৬ জার্মানীতে

ষোড়শ শতাব্দীতে একজন পুরুষের জন্য জার্মানীতে বহু স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ছিল এবং এই অনুমতি ছিল একেবারে লাগামহীণ। কারণ যে যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত ;এটার কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না। রাজা কন্সটেন্টাইন ও তার উত্তরাধিকারীদের বহু স্ত্রী ছিল ।[১৩]

১.৭ ইসলামে বহু বিবাহঃ

ইসলাম একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। তবে একে উৎসাহিত করা হয়নি বরং নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ইসলাম পূর্ব যুগে অসংখ্য বিবাহ অর্থাৎ ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বা তদূর্ধে করার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু ইসলাম একে সীমিত গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে দিয়েছে। অর্থাৎ একত্রে চারজন স্ত্রী অধিকারে রাখার কথা বলা হয়েছে। আল-কুরআনে ঘোষনা করা হয়েছে ঃ-

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের পছন্দ মত দুই,তিন ,চার, পর্যন্ত বিয়ে করতে পার।[১৪]

অত্র আয়াতে একাধারে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখতে পারবে।এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে । তবে সকলের সথে ন্যায় সঙ্গত আচারন করতে না পরলে একের অধিক বিবাহ না করার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে ।এ সর্ম্পকে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ-

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

শুধু একজনকে বিবাহ কর যদি তোমার আশংকা হয় যে, তাদের (স্ত্রীদের) প্রতি সমব্যবহার করতে পারবে না।[১৫]

একাধিক বিবাহকে এমন শর্তের অধীন করে দেয়া হয়েছে যা অসম্ভব না হলেও সুকঠিন। এ শর্ত লংঘন করে শুধু ইন্দ্রিয়পরায়নতার বশবর্তী হয়ে একাধিক বিবাহ করলে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। মহানবী (সঃ) এরশাদ করেনঃ

---

১৩. নারী ও সমাজ; আ: খালেক .পৃঃ ৩০৫

১৪. আল কুরআন:সুরা নিসা :আয়াত নং ৩

১৫. আল কুরআন: সুরা আন নিসা :আয়াত নং ৩

Dhaka University Institutional Repository

যে ব্যক্তি দুই স্ত্রীর একজনের পক্ষপাতিত্ব করল শেষ বিচারের দিন তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় হাজির করা হবে।[১৬]

উইলিয়াম রাইট যথার্থই বলেছেন;

In fact most mohammadans in all ages have had only one wife. অর্থাৎ সর্বযুগে অধিকাংশ মুসলিম শুধু একটি বিবাহ করে এসেছে।[১৭]

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় যেমন আইন করে একাধিক বিবাহ বন্ধ করতে পারলেও ব্যভিচারের সয়লাব সমাজকে নীতিহীন যৌনতার জোয়ারে ভেসে চলেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০% বিবাহিত পুরুষ পর নারীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে।[১৮]

এ্যানি বেসান্ত লন্ডনে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন:

Monogamy with a blended mass of prostitution was hypocrisy and more degrading than a limited polygamy.

অর্থাৎ ঃ ব্যাপক বেশ্যা বৃত্তির সাথে সংমিশ্রিত এক বিবাহ হল ভন্ডামি এবং সীমিত বহু বিবাহের চেয়ে অবমাননাকর।[১৯]

উপরের আল কুরআনের আয়াতাবালী থেকে আমাদের কাছে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে একাধিক বিবাহ জায়েজ। তবে জায়েজ হলেও ইসলাম একাধিক বিবাহ করাকে উৎসাহিত করেনি। বরং তা নিরুৎসাহিত করেছে। তবে যদি কেহ একাধিক বিয়া করে তা হলে তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচারণ, সকলের প্রতি সমান আচারণের নির্দেশ দিয়েছেন। কারো প্রতি অন্যায়মূলক আচারণ না করা হয় এ ব্যাপারে হুশিয়ার করে দিয়েছে।

*২. বাংলাদেশে বহু বিবাহের পদ্ধতিঃ

কালের আবর্তে মানুষের ধ্যান-ধারণার ও আবর্তন ঘটে। পরিবর্তন ঘটে। পূর্ববর্তী সময়ে নারীকে বিবাহ তথা বহুবিবাহ ইত্যাদির প্রতি নানা দৃষ্টি ভঙ্গি থাকলেও বর্তমানে এর অনেকটা সংস্কার হয়েছে। আমাদের দেশ বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকই মুসলমান। ধর্ম হল ইসলাম। ইসলামে একত্রে সর্বাধিক চারটি বিবাহের অনুমতি রয়েছে। এ সুবাধে অনেকেই একাধিক বিবাহ করে থাকে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, একাধিক বিবাহ করলেও তারা সবসময়

---

[১৬]. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ; আল জামে আত-তিরমিজি ; (মোকতাবা রশীদিয়া দিল্লী) আবওয়াবুন নিকাহ : বাবু মাজাআ ফি তাসবিয়াতি বাইনা দরায়িরি: পৃঃ ২১৭।

[১৭]. William Kelly Wright: Philosophy of Religion. Page ৫০৮

[১৮]. James C.Coleman: Abnormal Psychology and modern life 5th edition page৫৮৫.

[১৯]. Annie Besant: The life and teaching of Muhammad quoted in Islam .the first and final religion. page ৯

Dhaka University Institutional Repository

সকল স্ত্রীর সাথে সমান আচারণ করে না। অথচ ইসলামের শিক্ষা সবার সাথে সদাচারণ করার তাগীদ দিয়েছে। তবে কিছু পরিবার সদাচারণ করে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও বর্তমানে অনেকে একাধিক বিবাহ করে। খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এর পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

***মুসলিম পারিবারিক আইন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটঃ**

ইসলাম অনুমোদিত একাধিক বিবাহ নীতির অপব্যবহার , অপব্যাখ্যা এবং এরই ফলে হয় নারী নির্যাতন । তাদের সাথে প্রতারণামুল আচারণ রোধের জন্য ১৯৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশটি জারি করেন। যা আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে এখনও বলবৎ আছে। বিবাহ , তালাক ইত্যাদির সবটাই এখন ও একই অধ্যাদেশের আওতায় চলছে। সমাজের উচ্ছৃংখল পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে হয়ত এ অধ্যাদেশটির প্রয়োজন হত না। কিন্তু অধ্যাদেশের মধ্যে ছয়টি ধারায় এমন কিছু বিষয় উল্লেখিত যা ইসলামী বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। অধ্যাদেশটি জারী করার সময় সাবেক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দেশ বরেণ্য ওলামাগণ সাংঘার্ষিক বিষয়গুলো তুলে নেয়ার জন্য দাবী জানান ও আন্দোলন করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তৎকালীন রাষ্ট্র প্রধান সমস্ত দাবী দাওয়া এড়িয়ে আইনটি সবার উপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হন। মূল ছয়টি বিষয়ে পর্যালোচনা ও ইসলামী আইন বিধানের আলোকে এর সংশোধন জরুরী।

বহু বিবাহ সংক্রান্ত মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ - এর ১ নং ধারায় উল্লেখিত আছে যে, সালিশি পরিষদের লিখিত পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির একটি বিবাহ বলবৎ থাকলে আরেকটি বিবাহ করতে পারবে না এবং পূর্ব অনুমতি গ্রহণ না করে এ জাতীয় কোন বিবাহ হলে তা মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪ অনুসারে রেজিস্ট্রি হবে না ।

আইনের উল্লেখিত ধারায় সালিশী পরিষদের কাছ থেকে অনুমোদনের বিষয়টি ইসলামের বিধান বহির্ভূত । কারণ দ্বিতীয় বিবাহ করা বা না করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার স্বামীর । অন্য কোন ব্যক্তির এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। তবে সিদ্ধান্তের কার্যকারিতার ব্যাপারে আদালত অথবা সালিশী পরিষদের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সমাজের মধ্যে দ্বিতীয় বা একাধিক বিয়ের সুযোগে প্রচলিত কুসংস্কার তথা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য সেই সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সুখের করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিবাহের সময় প্রথম স্ত্রীর অনাপত্তি গ্রহণের ব্যবস্থা রাখার চিন্তা করা যায়। তাহলে আর কোন ভুল বুঝাবুঝি থাকবে না।অতএব প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে অনাপত্তি গ্রহণের ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

রাসুল (সঃ) বলেন, মুসলমানগণ যে কোন ব্যাপারে শর্ত দিয়ে কাজ করতে পারে , তবে হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল করার মত শর্ত দেয়ার অধিকার রাখে না।

তবে এখানে দ্বিতীয় বিবাহ কার জন্য সাব্যাস্ত ও কার জন্য সাব্যাস্ত না সেটা চিহ্নিত করার জন্য দেশের আদালত অথবা সরকারের কোন দফতরকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে ।

দ্বিতীয় বিবাহের কারণে প্রথম স্ত্রীর অধিকারে কোন ক্ষতি হবার আশংকা থাকছে কি না সেটাও উপরোক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবে। সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোনটা ও লাভজনক কোনটা সরকারের উচিত তার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা। দ্বিতীয় বা একাধিক বিবাহ মোবাহ (ঐচ্ছিক) ব্যাপার । এটাকে ঢালাওভাবে অবৈধ সাব্যস্ত করা যাবে না। এ মোবাহকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সাধারণত দুটি শর্ত জড়িত

ক) প্রয়োগের বিশেষ কারণ থাকা এবং সেটা শরীয়ত সম্মত কিনা সেটা লক্ষ্য করা ।

খ) উক্ত প্রয়োগ যেন জুলুম বা বৈষম্যে পরিণত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা । সরকার বা সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কুরআনের এ দুটো শর্ত পালন করা হচ্ছে কিনা সেটার প্রতি সদা দৃষ্টি রাখবে।

শর্ত পালনের অঙ্গীকারের পরও যদি কোন স্বামী সেটা লংঘন করে বা নারীর ক্ষতিসাধন করে , অথবা নারীর উপর দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর দন্ড কার্যকর করা উচিত যেমনটা আইনের পাঁচ নম্বর উপধারায় উল্লেখিত আছে।[২০]

সুতরাং আমরা বলব যে, বহু বিবাহ বৈধ। তবে তাদের (স্ত্রীদের) সকলের সাথে সাম্য বজায় রাখতে হবে। তাদের সকলকে একই অধিকার দিতে হবে।এক চোখা নীতি পরিহার করতে হবে।

*৩. সার্বজনীন আদর্শ।

বহু বিবাহ প্রথা বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে একটা গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক বিষয়। ইসলামী আদর্শ হল সার্বজনীন। বহু ববাহের প্রথা ইসলাম অনুমোদন দিয়েছে বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন প্রয়োজনে। ইসলাম যদি বহু বিবাহের অনুমতি না দিত তাহলে নারী জাতি বিভিন্ন সমস্যার আবর্তে পড়ে যেত। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে নিপতিত হত। ইসলাম বহু বিবাহের অনুমতি দিলেও একত্রে সর্বাধিক ৪ জন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে বলে নির্দেশ দিয়েছে। প্রথমে আমরা দেখব ইসলাম কেন বহু বিবাহের অনুমতি দিল।

---

২০. ড.হাসান মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন : প্রধান,দাওয়াহ ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ ; দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ,ঢাকা;প্রকাশিত পত্রিকা ;সৈনিক ইনকিলাব।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে একাধিক বিবাহের অনুমতির পিছনে অনেক যৌক্তিক কারণ রয়েছে। যে সমস্ত কারণ বিবেচনায় এনে একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে তা হল :

৩.১ নারীর সংখ্যাধিক্য

একাধিক বিবাহের অনুমতির কারণ নারীর সংখ্যাধিক্যতা। স্বাভাবিক অবস্থায় একটি দেশের জনসংখ্যা পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশী থাকে। জন্মের সময় অনেক ছেলে শিশু মারা যায়। একটি সদ্যোজাত ছেলে শিশু তার প্রথম জন্ম দিন আসার আগেই মারা যাবার সম্ভাবনা তার জমজ বোনের তুলনায় ২৫%বেশী।[২১]

শিশু মৃত্যু সিনড্রোমে একটি ছেলে শিশু মারা যাবার সম্ভাবনা মেয়ে শিশুর তুলনায় ৫০%বেশী।[২২]

নানা রকম দুর্ঘটনা এবং রোগ ব্যধিতে নারীর তুলনায় পুরুষ মারা যায় বেশী।

প্রত্যেক পুরুষের জন্যে একজন করে নারী নির্ধারিত করে দিলে ইংল্যান্ডের ৪০ লক্ষ এবং যুক্তরাষ্টের ৭০ লক্ষ ৮০ হাজার, জার্মানীর ৫০লক্ষ, রাশিয়ায় ৯০ লক্ষ নারীর কোন স্বামী জুটবে না।

এখানেই শেষ নয়, এসব দেশে বিপুল সংখ্যক সমকামী রয়েছে। ফলে স্বামী না পাওয়া নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে কয়েকগুন।

উদাহরণ স্বরুপ যুক্তরাষ্ট্রের নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে ৭০লক্ষ ৮০ হাজার বেশী। সমকামী পুরুষের সংখ্যা ২ কোটি ৫০লক্ষ। এর অর্থ হল; এটি আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ সমাজে তুলনামুলকভাবে বেশী। কারণ অল্প বয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের মৃত্যুর হার অতি উর্ধ্বে।[২৩]

কোন নারী যখন কোন পুরুষকে বিয়ে করতে অসমর্থ হয় তখন তার সামনে দুটি পথ থাকে ;

*সে এমন কোন পুরুষকে বিয়ে করবে যার আগে থেকেই স্ত্রী আছে।

*অথবা সে স্বেচ্ছায় পতিতা হবে।

এ সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকফারলেন বলেন;

The suggestion offers a practical remedy for the problem of the destitute and unwanted female; the alternative is continual and increased prostitution, concubine and distressing spinsterhood.

---

২১. ডঃ জামাল বাদাবী: ইসলামের সামাজিক বিধান, ১১৮

২২. Larry laudan : Danger Ahead .page 137

২৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা : ৪৪বর্ষ ; ৩য় সংখ্যা : পৃঃ ২১৬

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ পরামর্শটি (একাধিক বিবাহের পরামর্শ লেখক) দুস্থ ও অনাকাংখিত নারীর সমস্যার সমাধান বাতলে দেয়।এর বিকল্প হল অব্যাহত এবং ক্রমবর্ধমান পতিতাবৃত্তি,রক্ষিতাবৃত্তি ও দুর্দশাপূর্ণ কুমারিত্ব।[২৪]
তাই নারীর সংখ্যাবৃদ্ধি জনিত কারণেই ইসলাম বহু বিবাহের অনুমতি প্রদান করেছে।

৩.২ রোগ ব্যাধিঃ

অনেক সময় কিছু কিছু স্ত্রী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। এমন ও হয় যে তার আর ভাল হবার সম্ভাবনা নেই । তখন স্বামীর বিকল্প চিন্তা অর্থাৎ অন্য একটি বিবাহ করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। কেননা প্রত্যেক স্বামীই যৌন চাহিদা এবং সন্তানাদি লাভের আশায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়। যদি সে স্ত্রী তাতে অক্ষম হয় তাহলে স্বামীর বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এমতাবস্থায় যদি ব্যাধিগ্রস্থ স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে সে একেবারে নিরুপায় ও নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে। সুতরাং এটা কি উত্তম ব্যবস্থা নয় যে, স্বামী নিসঙ্কোচে অপর স্ত্রী গ্রহণ করবেন এবং তার পূর্ব স্ত্রী ও স্ত্রী রুপেই তার আশ্রয়ে সসম্মানে বসবাস করতে থাকবেন। তাইতো ইসলাম বহু বিবাহের পক্ষে অনুমোদন দিয়েছে।

৩.৪ যুদ্ধ ও পুরুষের সংখ্যা হ্রাসঃ

সুরা আন-নিসার সর্বাধিক চারজন স্ত্রী গ্রহন সংক্রান্ত আয়াতটি অবতীর্ন হয় ওহুদ যুদ্ধের পর। এ যুদ্ধে অনেক মুসলমান শাহাদাত বরণ করেণ । ফলে অনেক স্ত্রী বিধবা হয় । অনেক শিশু ইয়াতীম ও অসহায় হয়ে পড়ে ।এ সমস্যা উত্তরণের জন্যে অত্র বিধান সম্বলিত আয়াতটি নাযিল হয়।

স্বাভাবিক ভাবেই যুদ্ধ বিগ্রহে অনেক পুরুষ লোক মারা যায়। ফলশ্রুতিতে অনেক স্ত্রী লোক বিধবা হয়ে পড়ে।একাধিক বিবাহের প্রথা চালু না থাকলে তারা বিপথগামী হয়ে যেতে পারে । একাধিক বিবাহ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হলে যুদ্ধোত্তর জরুরী পরিস্থিতি মুকাবিলার আর কোন সদুপায় থাকে না। বিশ্বকোষে এ সম্পর্কে এভাবে বলা হয়েছে;

Polygamy is more likely to occur in societies in which women outnumber men, perhaps because many men are killed in war or other hazardous occupations. [২৫]

অর্থাৎ বহু বিবাহ যে সব সমাজে ঘটার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশী যেখানে নারী সংখ্যা পুরুষকে ছাড়িয়ে যায়,সম্ভবত একারণে অনেক পুরুষ যুদ্ধে কিম্বা ঝুকিপূর্ণ পেশায় প্রাণ হারায়।

---

[২৪].J.E. Clare Me Faarlane: Te case for polygamy. p 30 Quoted in Islam; The First and final Religion.

[২৫].Larry laudan Danger Ahend. page ৬২

Dhaka University Institutional Repository

কখনো যে একাধিক বিবাহ অনিবার্য হয়ে পড়ে এটা ইংরেজী দার্শনিক ও নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক জর্জ বার্ণাডশ যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেন;

If in consequence of a great war three quarters of the men in this country were killed it would be absolutely necessary to adopt the Mohammedan allowance of four wives to each man in order to recruit the population

অর্থাৎ যদি কোন বড় যুদ্ধের ফলে এ দেশের তিন-চতুর্থাংশ লোক নিহত হয় তবে জনসংখ্যার ভার সাম্য রক্ষার জন্য মুসলিমদের বিধান চার বিবাহের অনুমোদন অনিবার্য হয়ে পড়বে।[২৬]

৩.৫ কামভাবের আধিক্য ঃ

স্বামীর কামভাব নিত্য, অবিরতভাবেই থাকে । কিন্তু স্ত্রীর রয়েছে প্রতিমাসে ৩ হতে ১০ দিনের ঋতু স্রাব এবং সন্তান প্রসবের পর অনধিক ৪০ দিনের নেফাস। এ সময় স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ । নেফাসের পর ও স্বামীর সাথে সহবাস করতে আর ও কিছুদিন সময় লাগে । আবার গর্ভকালে বিশেষত পরিণত অবস্থায় সহবাসে গর্ভধারিণী ও গর্ভের সন্তানের অনিষ্ট হয় বলে অনেকে মনে করেন। এ দীর্ঘকাল সময় অনেক স্বামী ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারেন না বলে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
উইল ডুরান্ট বলেন:[২৭]

The man is by nature polygamous and that only the strongest moral sanctions; a helpful degree of poverty and hard work and unimterrupted wifely supervision can induce him to monogamy.

পুরুষ প্রকৃতি গত ভাবেই বহু বিবাহ কামনা করে । এর মত ধর্মীয় নীতি পালনের দৃঢ়তম আনুপ্রেরণা বহু বিবহের বাসনা দমন করে রাখার মত দরিদ্রতা, কঠোর সাধনা এবং স্ত্রীর অবিরাম তত্ত্বাবধানই তাকে এক স্ত্রী লয়ে সন্তুষ্ট থাকতে প্রবৃত্ত করতে পারে ।
এ সমস্ত সমস্যা উত্তরণের জন্যে বহু বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলাম শৈথল্য প্রদর্শন করেছেন।

৩.৬ গর্ভধারণ

নারী বৎসরে মাত্র একবার গর্ভধারণ করতে পারে । অপরদিকে পুরুষ সবসময়ই বীজ বপনের কার্য সম্পাদনে সক্ষম। আবার নারীর কামভাব মাত্র

---

২৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ৪৪বর্ষ ৩য় সংখ্যা পৃঃ২১৫
২৭. Will Laurent ; The story of civilization, Voll .v p. ৫৭৫

Dhaka University Institutional Repository

৪০/৫০ বৎসর বয়সে স্ত্রী যখন অক্ষম হয়ে পড়েন, তৎপর ২০/৩০ বৎসরের দীর্ঘকাল স্বামী কি রূপে অতিবাহিত হবে?[২৮]

তাই ইসলামে বহু বিবাহ স্বীকৃত।

৩.৭ তালাক সম্পর্কিত কারণঃ

অধিকাংশ লোকই বিধবা তালাক প্রাপ্তা এমনকি দরিদ্র কুমারীকে ও বিবাহ করতে চায়না বরং উচ্চবংশীয়া কুমারীকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করে। এমতাবস্থায় সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাদের পূর্ব স্ত্রী রেখে এ সকল বিধবা তালাক প্রাপ্তা ও দরিদ্র নারীদিগকে বিবাহ করতে রাযী হলে তাদের ও একটি সামাজিক ভাবে জীবন যাপন করার পথ হয়ে যায় এবং নানাবিধ সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয় না।

সমগ্র পৃথিবী আজ ইসলামের বহু বিবাহ প্রথার উপকারিতা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। এমনকি এর চরম বিরোধী চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ষ্টাডিজের প্রফেসর মিস নাবিয়া এবট (Miss Nabia abbot) ও বলতে বাধ্য হয়েছে :

Monogamous society at its worst is not free from prostitutes or the kept mistress or the proverbial, cat and dog, family life[২৯]

এক বিবাহ প্রথা প্রচলিত সমাজের নিকৃষ্টতম দিক এটা পতিতাবৃত্তি; রক্ষিতা প্রণয়নী অথবা প্রবাদের কুকুর বিড়াল এর পারিবারিক জীবন হতে মুক্ত নয়।

পশ্চিমা বিশ্ব আইন করে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করলেও কালে কালে এ ব্যবস্থার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছে। ১৬৫০ সালে যখন ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটে, তখন নুরেমবার্গ আইন পাশ হয় যে, প্রত্যেক পুরুষ দুজন করে নারী বিয়ে করতে পারবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বিপুল পরিমানে হ্রাস পেলে উদ্ভত সমস্যার সমাধান কল্পে ১৯৪৮ সালে মিউনিখে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে একাধিক বিবাহে ইসলামী পন্থাকে সম্মেলনের প্রস্তাব হিসেবে গ্রহণ করা হয়।[৩০]

ড. এ্যানি বেসান্ত (Annie Besant)বলেন:

There is pretended monogamy in the West, but in reality polygamy without responsibility. The mistress is cast off when the man is weary of her and she sinks gradually to be the woman of the

---

২৮. নারী; আব্দুল খালেক : পৃষ্ঠা নং ৩২৩

২৯. Fida Hussain Malik : Wives of the Prophet. Page 75

৩০. ডঃ জামাল বাদাবী: ইসলামের সামাজিক বিধান, ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

street, for the lover has no responsibility for her in future and she is a hundred times worse off than a sheltered wife and mother in the polygamous home .When we see thousands of miserable women who crowd the streets of the western towns at night, we can realise the hollowness of the western reproach against the polygamy of Islam. It is better for a woman, happier for a woman. More respectable for a woman, to be consorted to by one man only with a legitimate child in her arms and surrounded with respect, than to be cast out in the streets perhaps with an illegitimate child, outside the pale of law, unsheltered after night , rendered incapable of motherhood, despised by all.[৩১]

পাশ্চাত্যে এক বিবাহের প্রহসন আছে। কিন্তু বাস্তবে তথায় বিবাহ-বন্ধনের দায়িত্ব ব্যতিরেকে বহু নারী সম্ভোগ অবাধে চালিয়েছে। নারী পুরুষের নিকট ক্লান্তি ও বিরক্তিকর হয়ে উঠলে সে তখন তাকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং নারী তখন নিরুপায় হয়ে পথে দাঁড়ায় । কারণ, তার প্রেমিক তার ভবিষ্যতের জন্য কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে নি;কেবল সাময়িক সম্ভোগই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। বহুবিবাহ প্রচলিত আছে এমন গৃহে সসম্মানে সংরক্ষিত একজন গৃহবধু ও মাতা অপেক্ষা এ ধরনের নারী শতগুণে নিকৃষ্ট। রাত্রিকালে পাশ্চাত্যের শহরগুলির রাস্তায় রাস্তায় যখন ঘৃণ্য ও দুঃস্থ হাজার হাজার নারীর ভিড় দেখতে পাই, তখন আমরা ইসলামের বহুবিবাহের প্রথার প্রতি পাশ্চাত্যের নিন্দার অসারতা উপলব্ধি করতে পারি। একমাত্র একজন পুরুষের স্ত্রীরূপে বৈধ সন্তান কোলে লয়ে সসম্মনে গৃহে অবস্থানকারী একজন মহিলা সে রমণী হতে অনেক উৎকৃষ্ট, অনেক সুখী ও অনেক সম্মানর্হ-যাকে অবৈধ সন্তানসহ, আইনের সীমার বহির্ভূত, রজনী অবসানে আশ্রয়হীনা, মাতৃত্বের যোগ্যতাশূন্য ও সকলের ঘৃণ্য অবস্থায় রাস্তায় বাহির করে দেয়া হয়।

ক্লেয়ার ম্যাক-ফারলেন বলেনঃ

Whether the question is considered socially, ethically or religiously, it can be demonstrated that polygamy is not contrary to the highest standard of civilization. The suggestion offers a practical remedy for the western problems of the destitute and unwanted female. The alternative is contemned and increased prostitution concubine and distressing spinsterhood.[৩২]

৩১.From Fida Hussain Malik: Wives of the Prophet.P. 741-75

৩২. Fida Hussain Malik: Wives of the Prophet.P. 75

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ, নৈতিকতা বা যে কোন দৃষ্টিকোণ হতেই বিবেচনা করা হোক না কেন, তা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যেতে পারে যে, বহুবিবাহ সভ্যতার উন্নততম মানের পরিপন্থি নয়। অসহায় ও পরিত্যক্ত পাশ্চাত্য নারীদের সমস্যা সমাধানের এটাই একমাত্র উপায়। বহুবিবাহ-প্রথা গ্রহণ না করলে পতিতাবৃত্তি অবিরতভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং অবৈধ প্রণয়নী ও অবিবাহিতা নারীর সংখ্যা মর্মান্তিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

উচ্ছৃঙ্খল যৌন জীবন হতে বিবাহিত জীবনই যে নারীদের জন্য উত্তম এ প্রসঙ্গে এনথনি এম, লুডুভিসি (Anthony M.Ludovici) বলেনঃ

It seems eminently desirable to emphasize more than we have emphasized in the past the ideal of matrimony for every woman up to a certain age, and bring home to parents that marriage is what they must train them for anything else that she may do must always be second best to this, and those who, by misrepresentation and appeals to vanity persuade her while she is quite young that there are calling better than, or at least as good as, motherhood for her.

নির্ধারিত বয়স পর্যন্ত প্রতিটি নারীর জন্যই বিবাহের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে আমরা অতীতে যতটুকু জোরের সাথে বলে এসেছি, তদপেক্ষা অধিক জোরের সাথে এ প্রকাশ করার আবশ্যকতা আমরা অনুভব করতেছি এবং মাতাপিতাকেও তদ্রুপ অবহিত করা প্রয়োজন মনে করি যে, বিবাহ এমন এক বস্তু যার প্রতি কন্যাদিগকে উদ্বুদ্ধ করা তাদের একান্ত কর্তব্য। অন্য যা কিছুই কন্যা করুক না-কেন, তন্মধ্যে এটাই তার জন্য সর্বোত্তম মর্যাদার অপর সকলই এর পরবর্তী স্তরের আর তার যৌবনকালে ভুলতত্ত্ব পরিবেশন এবং আত্মমর্যাদার প্রতি আবেদন জানায়ে প্রেমিকদের আহবানে সাড়া দেয়া মাতৃত্বের বরণ অপেক্ষা তার জন্য উৎকৃষ্ট বা এর সমকক্ষ বলে যারা তাকে প্ররোচিত করেছিল, তারা কেবল নারীদেরই শত্রু নয় বরং সমগ্র মানব জাতির শত্রু। [৩৩]

Dr.Norman Haire বলেনঃ

> Dr.Norman Haire, who maintains that legalised polygamy would offer many advantages to the majority of people, argues that if the children are supported by the state, there need be no tirmil to the number of legal mates.[৩৪]

*ড, নরম্যান হেয়ার অভিমত পোষণ করেনঃ

আইনসিদ্ধ বহুবিবাহ অধিকাংশ লোকের প্রভূত মঙ্গল সাধন করবে। তিনি বলেন, সরকার যদি সন্তান -সন্ততির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ

৩৩.নারী ও সমাজ: আঃখালেক :পৃঃ ৩১৭

৩৪.প্রাগুপ্ত:পৃঃ৩১৮

Dhaka University Institutional Repository

করে, তবে আইনানুগ স্ত্রী গ্রহণের কোন সংখ্যা নির্ধারণের আবশ্যকতা নেই।

এভাবে বহু মণীষি এখন বহু বিবাহের পক্ষে মতামত প্রকাশ করছেন। তারা দেখেছেন বাস্তবতা কি। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা জোরালো যুক্তি তুলে ধরেছেন বহু বিবাহের পক্ষে।বর্তমান বিশ্বে অনেক দেশেই চলছে যুদ্ধ-বিগ্রহ,হিংসা হানাহানি। পরাশক্তিরা আক্রমন চালিয়ে হত্যা করছে যুবকদের।শতশত লোকের জীবন বিপন্ন হচ্ছে।

ফিলিস্তিন, কাশ্মির,ইরাক,আফগানিস্তান, রুয়ান্ডা, বুজুমবুরি, সুদান যেখানে প্রতিনিয়তই মারা যাচ্ছে পুরুষ। ইরাক যুদ্ধে হাজার হাজার পুরুষ নিহত হয়েছে।বিধবা হচ্ছে অগণিত মহিলা । ফিলিস্তিনে যুবকদেরকে টার্গেট করে হত্যা করছে ইসরাইলরা । পুরুষের সংখ্যা দিন দিন সেখানে হ্রাস পাচ্ছে। নিম্নে হত্যাকান্ডের কয়েকটি পরিসংখ্যান দেয়া হলঃ

১৯৭২-৭৩ সালে ব্যর্থ হুত বিদ্রোহে ১০০০০ তুতসি ও ১,৫০,০০০ হুত সম্প্রদায় নিহত হয়

১৯১৬ (১ম বিশ্বযুদ্ধে) একদিনেই ইংল্যান্ডের প্রায় ৬০,০০০সৈন্য নিহত হয় ।

১ম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তির প্রায় ৫০লাখ সৈন্য নিহত হয় এবং ১ কোটি ১০ লাখ সৈন্য আহত হয়। ৪ বছরে নিহতের সংখ্যা প্রায় ৮০ লাখ।

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসন ও হত্যাকান্ডঃ

১৬০৭-১৮৯০ সালের মধ্যে আমেরিকা ও আফ্রিকার ৯ কোটি আদিবাসী মানুষ আমেরিকার গণ হত্যার শিকার হন।

১৮৯৯-১৯০২ সালে ফিলিপাইনে মার্কিন অভিযানে নিহত হয় ২ লাখ মানুষ।

১৯৪৫ -১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ায় অভিযান চালিয়ে ১০ লাখ জীবনকে হত্যা করে।

১৯৪৫-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ভিয়েতনামে মার্কিন হামলায় নিহত হয় ৩৫ লাখ মানুষ। মার্কিন সৈন্য নিহত হয় ৫৮ হাজার।

১৯৫৭-১৯৭৩ সালে লাওসে মার্কিন গণহত্যায় নিহত হয় ৫ লাখ মানুষ।

১৯৮১-১৯৯০ সালে নিকারাগুয়ায় মার্কিন সন্ত্রাসে নিহত হয় ১০ হাজারের ও বেশি মানুষ। ইরাক ,আফগানিস্তানে হত্যা করা হয়েছে হাজার হাজার মানুষকে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরে উল্লেখিত যুদ্ধে নিহতদের অধিকাংশই পুরুষ। তবে সামান্য কিছু মহিলা থাকতে পারে। যদি বহু বিবাহের অনুমতি না থাকত তাহলে মহিলারা সামাজিক, মানসিক, অর্থনৈতিকভাবে নানা সমস্যার মুখামুখি হতে হত।

অধিক বিবাহের কারণ সমূহের সার কথা হল ঃ-

* তাকওয়া
*শক্তি সামর্থ্যের হেফাজত
* স্ত্রী মোয়াফেক না হওয়া আবার তালাক প্রদানের সুযোগ ও না থাকা
*বন্ধাহওয়া
*রাজনৈতিক কারণ ও প্রয়োজন
* কোন কোন শহর এবং কোন কোন বংশে কন্যা অধিক জন্ম নেয়া।[৩৫]

এ সমস্যা শুধু মুসলমানদের জন্যই নয় বরং সকল জাতি, গোষ্ঠীর জন্যে। বহুবিবাহের অনুমতি না দিলে সমাজে নানা অশান্তি দেখা দিত। তাইতো আধুনিক যুগের অধিকাংশ মনীষীরা ও বহুবিবাহের পক্ষে।

অতএব সমাজের শান্তি শৃংখলার জন্যে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, পতিতাবৃত্তি রোধের জন্য, সামাজিক হেয় প্রতিপন্ন থেকে নারীকে মুক্তির জন্য নারীর মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বহুবিবাহ প্রথা সকল বর্ণগোত্রের জন্য গ্রহণীয় নীতি হওয়া উচিত। বহুবিবাহ প্রথা সকল জাতির জন্যই মঙ্গলজনক। তবে বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে যারা কেবল স্বচ্ছল তারাই একাধিক বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে ।

তবে একাধিক বিবাহের সিদ্ধান্ত হতে হবে একেবারে শেষ পর্যায়। কেননা একাধিক বিবাহ করলে অবশ্যই সকল স্ত্রীর সাথে সমান ব্যবহার করতে হবে। সাম্য বজায় রাখতে হবে। নতুবা বিচার দিবসে এ অপরাধের মুখামুখী হতে হবে।শাস্তি পেতে হবে। পরিশেষে বলব যে, এ আদর্শ অবশ্যই সার্বজনীন। তা গ্রহণ করতে হবে সমাজ উন্নয়নের জন্যে, নারীদের অসহায়ত্ব দূর করার জন্যে, তাদের মানসিক যন্ত্রণা লাঘবের জন্যে, নারীকে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্যে।

সুতরাং একাধিক বিবাহের ইসলামী আইন সার্বজনীন। সকল ধর্ম, গোত্রের ক্ষেত্রে এটা মঙ্গল জনক ।

৩৫.যুক্তির আলোকে শরয়ী আহকাম : মাঃ আশরাফ আলী থানভী (রহঃ):পৃঃ ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ
নারী নির্যাতন

নারী নির্যাতন বর্তমানে আমাদের দেশে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়। পত্রিকার পাতা খুললেই প্রায়শই দেখা যায় নারী নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র। যেখানে ইসলাম নারীদের মহাসম্মানের আসনে আসীন করায়েছে সেখানে নারীরা আজ নির্যাতিত হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে, নানা আঙ্গিকে। সংবিধানের ৮ম সংশোধনী দ্বারা ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম করা হয়। রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী মূলনীতি সঠিক ভাবে প্রয়োগ না হওয়ায় নানা সমস্যার আবর্তে পরিগণিত হয়েছে এ বাংলাদেশ । নৈতিক মূল্যোবোধের অভাবে বিপথগামী হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন উপায়। হত্যা, ধর্ষণ, যৌতুক বিষয়ক নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ, বিদেশ পাচার সহ বিচিত্র পন্থায় নির্যাতিত হচ্ছে এদেশের নারী সমাজ। সাত বছরের শিশু সহ পৌঢ়রাও রেহাই পাচ্ছেনা নির্যাতনকারীদের হাত থেকে ।

নারী নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে যৌন হয়রাণি, ধর্ষণ, লিঙ্গীয় অঙ্গহানি, কন্যা শিশু হত্যা, মেয়ে শিশুর ভ্রূণ হত্যা, নারী হত্যা,যৌতুকের কারণে নির্যাতন, বিবাহের মাধ্যমে নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার সময় গণধর্ষণ, পাচার , পতিতাবৃত্তিতে নিয়ে ইত্যাদি।

স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত মাত্র সতের বছরে নারী নির্যাতনের মতো দুর্ঘটনা ঘটেছে প্রায় এক লাখ দশ হাজারের মতো। এ সংখ্যা পত্র -পত্রিকায় প্রকাশিত। এ ছাড়া এমন অনেক নির্যাতন বা হত্যার ঘটনা রয়েছে, যা পত্র -পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। [১]

ইসলাম এসব কিছুর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইসলামের সুমহান আদর্শকে তুলে ধরার জন্য এবং সর্বগ্রহণীয় আদর্শ হিসেবে উপাস্থাপনের জন্য নিম্ন পর্যায়ক্রমিক ধারায় আলোচনার প্রয়াস পাব।

১.নারী নির্যাতন কি?
২.অন্যান্য ধর্ম,মতবাদে নারীর অবস্থান ;
৩.বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের সচিত্র প্রতিবেদন ;
৪.নারী নির্যাতন রোধে বাংলাদেশের আইন ;
৫.ইসলামে নারী নির্যাতন রোধে কঠোর আইন;
৬.সার্বজনীন আদর্শ।

---

[১].আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ : ডঃ মোহাম্মদ জাকির হুসাইন; পৃঃ ৫৩০

Dhaka University Institutional Repository

১.নারী নির্যাতন কি

নারী নির্যাতন শব্দের প্রতিশব্দ হল ঃ Women's Oppression নির্যাতন হল কেউ কারো বিরুদ্ধে কোন কিছু অন্যায়ভাবে, বলপ্রয়োগ করে, জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা। নারী নির্যাতন হল নারীকে অন্যায় ভাবে তার বিরুদ্ধে কিছু করা, ধর্ষণ করা, হত্যা করা, যৌতুকের বলী হওয়া প্রভৃতি।দৈহিক নির্যাতনে মৃত্যুবরণ এবং মানসিক নির্যাতনে আত্মহত্যা হলো নারী নির্যাতনের শেষ পরিণতি।

১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন নিবর্তক আইনে নারী নির্যাতনের একটি কার্যকরী সংজ্ঞা (Operation definition) দেয়া হয়েছে । উক্ত আইনে নারী নির্যাতন বলতে যৌতুক প্রথা, যৌতুকের জন্য দৈহিক ও মানসিকভাবে চাপ প্রয়োগে অপহরণ, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, ধর্ষণ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে, এসিড নিক্ষেপ, বাল্যবিবাহ , বহুবিবাহ, বিদেশে পাচার, তালাক, ধর্ষণ করতে গিয়ে মৃত্যু ঘটানো বা জখম করা ইত্যাদি অপরাধকে বুঝানো হয়েছে।[২]

১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও নির্যাতনের (Gender violence) সংজ্ঞায় বলা হয়েছেঃ

> "Gender violence is a violence against women that results in physical, mental, sexual coercion or arbitrary deprivation and a violation of human rights."[৩]

এ সংজ্ঞানুযায়ী শারীরিক, মানসিক, লিঙ্গীয় নির্যাতন যেমন যৌতুক অনাদায়ে নির্যাতন, ধর্ষণ, নারী পাচার, লিঙ্গীয় শোষণ, যৌন হয়রানি, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ প্রভৃতি সব ধরনের নির্যাতনই নারী নির্যাতনের পরিধিভুক্ত।

২.অন্যান্য ধর্ম,মতবাদে নারীর অবস্থানঃ

২.১ গ্রীক সভ্যতায় ঃ

গ্রীক সভ্যতায় নারীরা ছিল অবহেলিত। তাদের কোন তেমন মর্যাদা ছিল না।বিশিষ্ট দার্শনিক সক্রেটিস বলেনঃ

Women is the greatest source of cause and disruption in the World. She is like the Dafali Tree which out warily looks very

---

[২].আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ: প্রাগুক্ত: পৃঃ ৫২৪

[৩].মো আতিকুর রহমান, সামাজিক সমস্যা ও উন্নয়নঃ নীতি -পরিকল্পনা ও কর্মসূচী (ঢাকাঃ কোরআন মহল ও অনার্স পাবলিকেশন্স, ২০০০ইং) পৃঃ ৩১৬

Dhaka University Institutional Repository

Beautiful, but if sparrows eat it they die without fail.[৪]

নারীর জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায় , যা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুই পাখি তা ভক্ষণ করলে এদের মৃত্যু অনিবার্য।

গ্রীক সভ্যতায় লোকেরা বলত ; নারী জাত সকল অকল্যাণের মূল।[৫]

সেন্ট টমাস ঘোষনা করেছেন ঃ নারী একজন অশুদ্ধ পুরুষ, ঘটনাক্রমে সৃষ্টি একটি জুরি। এটা জেনেসিসে প্রতীকী হয়েছে, সেখানে হাওয়াকে আদমের একটি হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৬]

গ্রীক সভ্যতায় নারী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে এন্ডার সকি বলেনঃ অগ্নিতে দগ্ধ রোগী ও সর্পদংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব। কিন্তু নারীর জাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।[৭]

গ্রীক পুরাণে নারী পান্ডোরে কে মানব সমাজের দুঃখ-দুর্দশার কারণ রুপে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে গ্রীক সমাজে নারীর সতীত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এক ধরণের নারী পূঁজার ধুম পড়ে যায়।[৮]

২.২ বৌদ্ধ ধর্মেঃ

বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা হল নারীর সহচর্যে নির্বাণ লাভ করা চলে না। নারী হল সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। ঐতিহাসিক ওয়েস্টার মার্ক (Wostermark) বলেনঃ

Women are of all the snares which the tempter has spread for men, the most dangerous; in women are embodied all the powers of infatuation which blind the mind of the world.

মানুষের জন্যে প্রলোভন যতগুলো ফাঁদ বিস্তার করে রাখিয়েছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপদজনক । নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে বা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।[৯]

বেটনী (Betony)তার World's Religions গ্রন্থে বিখ্যাত এক বৌদ্ধ পন্ডিতের ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেনঃ

---

৪. নারী ও সমাজ আঃ খালেক পৃঃ ২

৫. আসমা জাহান হেমা : ইসলামের ছায়াতলে নারী, (আল এছহাক প্রকাশনী, ২/৩,প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার , ঢাকা ১০০০,অক্টোবর ২০০২) পৃঃ ৩০

৬. সাইমন ডি বিভোর :দ্য সেকেন্ড সেক্স ,(এশিয়াটিক পাবলিকেশনস ঢাকা খ্রিঃ ২০০১) পৃঃ ১৫

৭. Nazhat Afza and khurshyid Ahmad: The position of woman in Islam. P ৯-১০ Islamic Book publishers, Kuwait ১৯৮২

৮. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ : নারী নির্যাতনের রকমেরফের পৃঃ ১৩

৯. Nazhat Afza and khurshyid Ahmad: The position of woman in Islam.

Dhaka University Institutional Repository

Unfathomably deep like a fish' course in the water is the character of women robed with to whom a lie is like the truth and the truth is like a lie.

পানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা যেমন নির্নয় করা সম্ভব নয়, নারীর চরিত্র তেমনি নিবিড় যা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত ।তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর । তার নিকট মিথ্যা সত্য সদৃশ এবং সত্য মিথ্যা সম।[১০]

১.৩ হিন্দু ধর্মেঃ

ভারতে হিন্দু ধর্মে নারীদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত করুণ। অধ্যাপক ইন্দ্রের ভাষায় ; নারীর ন্যায় এত পাপ পংকিলতাময় প্রাণী আর নেই । নারী প্রজ্জলিত অগ্নিস্বরুপ । ক্ষুরের ধারালো দিক, এ সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট।

কোন কোন হিন্দু গ্রন্থে বলা হয়েছে ; বিষ , সাপ, আগুন, মৃত্যু নরক ঝড়, বন্যা এসব কোন কিছুই নারীর চেয়ে খারাপ নয়।[১১]

হিন্দু শাস্ত্রকার মনুর মতে, নারীর অন্তর নির্মল হতে পারে না। কারণ মন্ত্র দ্বারা তার সংস্কার সাধন সম্ভব নয় এবং বেদ শাস্ত্রে তার কোন অধিকার নেই।[১২]

মনুর মতে, নারীকে দিবা রাত্র অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক । কারন নারী জন্মগত ভাবেই দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। অতএব তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথগামী হবে।

১.৪ খ্রীস্টান ধর্মেঃ

খ্রীস্টান ধর্মযাজকরা নারীকে 'নরকের দ্বার' ও 'মানবের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার হেতু' বলে গণ্য করত। এ জন্যে তাদের ভাষায় নারীকে Woman [woe -to-man] মানুষের দুঃখের কারণ বলে নাম রাখা হয়েছে।নারী আদতেই "মানুষ কিনা এবং তার আত্মা আছে কিনা " এ নিয়ে তারা ছিল সন্দিহান । এক পাদ্রী বলেছে : নারী সব অন্যায়ের মুল, তার থেকে দূরে থাকাই বাঞ্চনীয়।নারী হচ্ছে পুরুষের মনে লালসা উদ্রেককারী । ঘরে ও সমাজে যত অশান্তির সৃষ্টি হয় তা সব তারই কারণ। যাজকরা নারীর শিক্ষা অধিকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। [১৩]

---

[১০].Encyclopedia Britannica .Voll. p.৭৩২

[১১].ডঃ মুস্তফা আস-সায়াফী : ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা :১৯৮১পৃঃ১৪

[১২]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ : নারী নির্যাতনের রকমেরফের । প্রাগুপ্ত পৃঃ ৪৩

[১৩]. ডঃ মুস্তফা আস-সায়াফী :প্রাগুপ্ত : পৃঃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository

বাইবেলে পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত আছে : 'নারীর পাপের দরুণই পুরুষকে তার উপর কর্তৃত্ব করবার অধিকার প্রদত্ত হয়েছে'।[১৪] খ্রীস্টানের চোখে নারীর শরীর প্রলোভনের সোনার কলস। তার দেহ শয়তানের। নারীই পাপের পথে নিয়ে গেছে আদমকে; তাই খ্রীস্টান সাহিত্য নারী ঘৃণায় ও তিরস্কারে মুখর।

ইহুদি ও খ্রীস্টান ধর্মমতে নারীই গোটা মানবতার দুর্দশার কারণ। অতীতের বহু বিখ্যাত পাদ্রী প্রকাশ্যে নারী জাতির উপর দোষারুপ করেছেন এবং নারীকে দরকারী আপদ বলে অভিহিত করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেন্ট বলেন: নারী বলেই তার লজ্জায় আবিভূত হয়ে থাকা উচিত।[১৫]

*ড.এসপ্রিঙ্গ তার গ্রন্থে মধ্যযুগে নারী জাতির উপর জঘন্য নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা প্রদান করেছেন।তিনি বলেনঃ

১৫০০খৃস্টাব্দে ইংল্যান্ডে নারী জাতির বিচারের জন্য একটি পরিষদ গঠিত হয়। তা নারীদের উপর নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন চালাবার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করে। এ আইনের বলে খ্রীষ্টানগণ নব্বই লক্ষ জীবন্ত নারীকে অগ্নিতে দগ্ধ করে হত্যা করে। খ্রীস্টান সাম্রাজ্যে নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার বর্ণনাতীত।[১৬]

৩.বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের সচিত্র প্রতিবেদন ঃ

বাংলাদেশের নারী নির্যাতন ধর্মীয় অনুশাসন নয় ; ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতিকে অনুসরণ অন্যতম কারণ। সমগ্র বিশ্বে আজ নারীত্বের অবমাননা, নারী নির্যাতন, অপহরণ, ধর্ষণ, নারী পাচার, অবৈধ যৌনাচার, অশ্লীলতা,বেহায়াপনায় নারীদের নগ্ননৃত্য যখন স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, তখন বাংলাদেশ এর কুপ্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশে ও ক্রমান্বয়ে নারী নির্যাতনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের সমাজে আজ চারদিকে নারী নির্যাতন , কিশোরী ধর্ষণ, ছাত্রী অপহরণ, নারী পাচার, এসিড, যৌতুক সমস্যা প্রভৃতি বিবেকবান মানুষকে আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলেছে।[১৭]

---

১৪. Bible : Genesis ৩: ১৬ New York ১৯৭৩

১৫. নারী ও সমাজ: আঃ খালেক পৃঃ ১০

১৬. নারী ও সমাজ : আঃ খালেক ;পৃঃ ১০

১৭. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ : নারী নির্যাতনের রকমফের : পৃঃ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে কি হারে নির্যাতন বাড়ছে তার সংক্ষিপ্ত তথ্য নিচে দেয়া হল।

১৯৮৭ সালঃ ঝিনাইদহ জেলায় আত্মহত্যার সংখ্যা: ৩৫২২ যার মধ্যে ৯০% মহিলা।
১৯৮৮ সালঃ অপহরণ ৭২০ ধর্ষণ: ৩৮৪
১৯৮৯ সাল ঃ গৃহবধু হত্যা ৫২৫ জন।
যৌতুক প্রদানে ব্যর্থতার কারনে আত্মহত্যা ২৭৫ জন।[১৮]

১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা নারী নির্যাতন সংক্রান্ত ১৪শত মামলা গ্রহন করেন। এর মধ্যে ৫০০টি যৌতুক , দৈহিক নির্যাতন ও খোরপোষ সংক্রান্ত ।
১৯৮৯সালে নারী সংক্রান্ত মামলা হয়েছে ২৫০০টি ।[১৯]
১৯৯৪ থেকে১৯৯৭ সাল পর্যন্ত নারী ধর্ষণ : ২৩৬০
অন্যান্য নারী নির্যাতন : ৫৮৪৩
১৯৯৪ সালে নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৪৯৯, ১৯৯৭ সালে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১৩৩৬টি।

১৯৯৪ সালে বিভিন্ন নারী নির্যাতনের ঘটনা ছিল ১২০৬টি।
১৯৯৮সালে তা হয় ৪৫০৭ টি।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে নারী ও কিশোরী পাচারের হার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে সারাদেশে মোট ৫৪৩৪ টি বিভিন্ন নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা রুজু হয়েছে । এর মধ্যে এসিড নিক্ষেপের ১১৭ টি কেস, ধর্ষণ ২২২৪টি, শারীরিক নির্যাতন সংক্রান্ত ২০২৯ টি, নারী ও শিশু পাচার ২৪৫টি, যৌতুক সংক্রান্ত ৭৪৭টি । ১৯৯৮ সালের জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে মোট ৬২১০টি বিভিন্ন নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা রুজু হয়েছে।এর মধ্যে এসিড নিক্ষেপ ১২৮টি কেস, ধর্ষণ ৩২৫২টি, শারীরিক নির্যাতন সংক্রান্ত ১৫৩৭টি, অপহরণ ৭২ টি, নারী ও শিশু পাচার ১৮৯টি,অবৈধ নারী ব্যবসা ১২৯ টি এবং যৌতুক সংক্রান্ত ৯০৩ টি কেস ।

১৯৯৯ সালের জানুয়ারী হতে মে পর্যন্ত সারাদেশে মোট ২৫৮৩ টি বিভিন্ন নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা রুজু হয়েছে। এর মধ্যে এসিড নিক্ষেপের ৫০টি কেস, ধর্ষণ ১৩২১টি, শারীরিক নির্যাতন সংক্রান্ত ৬৯৪টি,

---

১৮.সাপ্তাহিক রোববার , (ঢাকা ঃ২০মে, ১৯৯০ ইং)
১৯.আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদানঃপ্রাগুপ্ত পৃঃ৫৩১

Dhaka University Institutional Repository

পণবন্দী-অপহরণ ৩৬টি, নারী ও শিশু পাচার ৪২টি অবৈধ নারী ব্যাবসা ৪২ টি এবং যৌতুক সংক্রান্ত ৩৯৮টি কেস।[২০]

১৯৯৫সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পূর্ববর্তী ১০ বছরের মধ্যে প্রায় দু'লাখ নারী বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে পাচার হয়েছে। প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী পাচারকৃত নারীর সংখ্যা প্রতি মাসে দশ থেকে চারশ জন ছিল।[২১]

ইউনিসেফ এবং সার্কের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ হতে প্রতি বছর প্রায় সাড়ে চার হাজার নারী ও শিশু পাচার হয়।[২২]

১৯৯৭-২০০১সাল পর্যন্ত নারী শিশু নির্যাতনের চিত্রঃ[২৩]

সময়	ধর্ষণ	এসিড নিক্ষেপ	গুরুতর আহত	অন্যান্য	মোট	শিশু নির্যাতন
১৯৯৭	১৩৩৬	১১৭	২০৬	৪১৮৪	৫৮৪৩	৪৫৩
১৯৯৮	২৯৫৯	১৩০	২০০	৪০৯৮	৭৩৮৭	৬৭৬
১৯৯৯	৩৫০৪	১২২	২৩৯	৪৮৪৫	৮৭১০	৫৫৯
২০০০	৩১৪০	১২৭	২৯৭	৬৯৭১	১০৫৩৫	৪৪৯
২০০১	৩১৮৯	১৫৩	৩৫১	৯২৬৫	১২৯৫৮	৩৮১
মোট	১৪১২৮	৬৪৯	১২৯৩	২৯৩৬৩	৪৫৪৩৩	২৫১৫

১৯৯৭-২০০১সাল পর্যন্ত নারী শিশু নির্যাতনের চিত্র স্তম্ভ

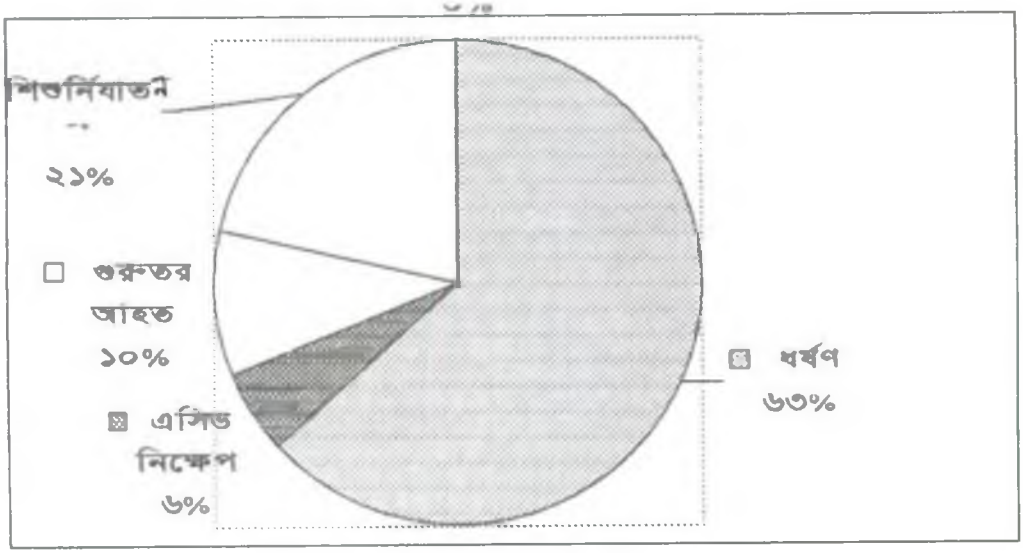

[২০]. দৈনিক সংবাদ, ঢাকা ঃ১৪ জুলাই,১৯৯৯ ইং
[২১]. বাংলাদেশ নারী নির্যাতনঃ কিছু পরিসংখ্যান ঃ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস
[২২]. দৈনিক ইত্তেফাক , ঢাকাঃ ২৬ নভেম্বর , ১৯৯৯।
[২৩]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ : নারী নির্যাতনের রকমফের : পৃঃ ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

১লা জানুয়ারী ২০০১থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০২ পর্যন্তঃ

এসিড নিক্ষেপের শিকার	২৯৭ জন
যৌতুকের কারনে নির্যাতিত	৪৩ জন
যৌতুকের কারনে নিহত	১৩৯জন
যৌতুকের শিকার হয়ে আত্মহত্যা	৬ জন
ধর্ষণের শিকার	৭২০ জন
ধর্ষিত শিশুর সংখ্যা	১৫০জন।[২৪]

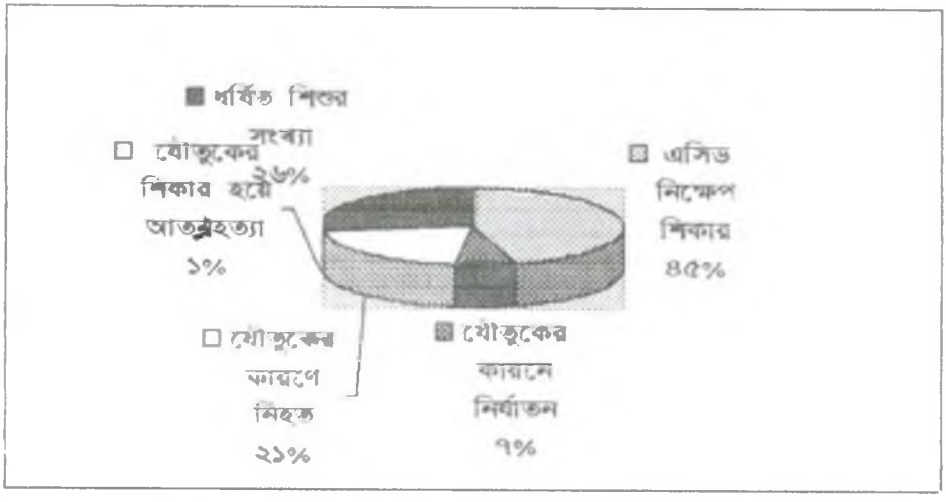

এদেশের যৌতুকের কারণে নারী নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলছে। অনেক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আবার অনেক সংবাদ অপ্রকাশিত থাকে। নীচে এর একটি চিত্র দেখানো হলঃ

সাল	মোট নারী নির্যাতনের ঘটনা	যৌতুক সংক্রান্ত নারী নির্যাতন	যৌতুকের জন্য নারীর মৃত্যু
১৯৯৯	২১২০	২২৭	২০৩
২০০০	২০০০এর উপর	২৬৪	১২৫
২০০১	২৭৮৩	১৬৯	১১৮
২০০২		২০টি (ফেব্রুঃপর্যন্ত	

[২৪] .সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ : নারী নির্যাতনের রকম ফের :পৃঃ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ঃ

২০০০ সালের জুন মাসে প্রকাশিত ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের যে কৌশলটি ব্যাপক রূপ নিয়েছে তা হলো এসিড নিক্ষেপ এবং তা আশংকাজনক হারে বেড়েছে। ইউনিসেফের হিসাব অনুযায়ী দেশে ১৯৯৬ সালে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ৮০ টি ১৯৯৭ সালে ১১৭ টি , ১৯৯৮ সালে ১৩০ টি, ১৯৯৯ সালে ১৬৮ টি।[২৫]

মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার 'এর এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ২০০০ সালে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ১৮৬ টি, ২০০১ সালে ২৫২ টি ২০০২ সালে ৪০০টি এবং ক্রমান্বয়ে এ সংখ্যা বেড়েই চলছে।[২৬]

এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন (এএসএফ) গত ২৮এপ্রিল, ২০০৫ ইং জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে এসিড দগ্ধদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করে। তাদের সমীক্ষায় ১৯৯৯ সালের মে মাস হতে ২০০৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ১ হাজার ৫শত ৫৩ টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় মোট ১ হাজার ৯শত ২৫জন এসিড আক্রান্ত হয়েছেন। কোন কোন ঘটনায় একের অধিক ব্যক্তি এসিডদগ্ধ হয়েছেন। আক্রান্তদের অধিকাংশ নারী ও শিশু।তাদের সংখ্যা ১ হাজার ২শত ৩৫ জন। যা মোট সংখ্যার ৭০ ভাগের ও বেশী। তাদের মধ্যে আবার নারীর সংখ্যা ১হাজার ৮জন।সমীক্ষায় বলা হয়, এ পর্যন্ত ৪২ জনের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ, ১শত ৩৯ জনের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ১ শত ৭৯টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনার জন্য মোট ২ শত ৯৪ জনকে শাস্তি দেয়া হয়েছে।[২৭]

২০০৩ ইং সালের নারী নির্যাতনের চিত্রঃ

নারীর প্রতি সহিংসতার একটি বড় হাতিয়ার হলো ধর্ষণ। সম্মতি ব্যতিরেকে যে কোন উপায় যৌন সম্পর্কে বাধ্য করাই ধর্ষণ। ২০০৩ সালে বাংলাদেশে অসংখ্য ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ২০০৩ সালে লোম হর্ষক ঘটনা ঘটেছে মার্চ মাসে বাঘেরহাটে। একই পরিবারের মা-মেয়েসহ ৩ জন ধর্ষণ এর শিকার হন এবং একজনের স্বামীকে সন্ত্রাসীরা নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে ।নিম্নে ধর্ষণের একটি সামগ্রীক চিত্র দেয়া হল:

---

২৫ .ইউনিসেফ প্রতিবেদন ২০০০ইং

২৬ . মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'

২৭ .দৈনিক ইত্তেফাক ৯/৫/২০০৫ইং

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ষণ ঃ সামগ্রিক চিত্র

মাস	ঘটনা	শিকার	নারী	শিশু	মামলা	গ্রেফতার
জানুয়ারী	২২	২২	১৩	৯	৭	৫
ফেব্রুয়ারী	৩৭	৩৭	৩১	৬	১২	২০
মার্চ	৮১	৮১	৬২	১৯	৩২	৩৭
এপ্রিল	১০০	১০০	৭৪	২৬	৩৬	৩২
মে	১৪৪	১৫৫	১২৮	২৭	৩৬	৩৪
জুন	১০১	১০১	৭২	২৯	২৭	১৯
জুলাই	১২০	১২০	১০০	২০	৩৯	২২
আগস্ট	৮৬	৮৬	৭১	১৫	৩৯	২৫
সেপ্টেম্বর	১০৩	১২০	৯৯	২১	৩৮	২৩
অক্টোবর	৭৯	৭৯	৫০	২৯	৩১	১৭
নভেম্বর	৫৩	৫৩	৩৩	২০	৩২	১৫
ডিসেম্বর	৫৬	৫৬	৩২	২৪	২৫	২৭
সর্বমোট	৯৮২	১০১০	৭৬৫	২৪৫	৩৫৪	২৭৬

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ২০০৩ সালে ৯৮২টি ধর্ষণের ঘটনায় শিকার হন ১০১০জন নারী ও শিশু; এর মধ্যে নারী ৭৬৫ জন এবং শিশু ২৪৫ জন । ধর্ষণ ঘটনায় এ সময় মামলা করা হয় ৩৫৪ টি এবং গ্রেফতার করাহয় ২৭৬ জন ঘাতককে।[২৮]

এক নজরে সারাদেশে ধর্ষণের চিত্র ঃ ২০০৩

ধর্ষণ চিত্র ২০০৩

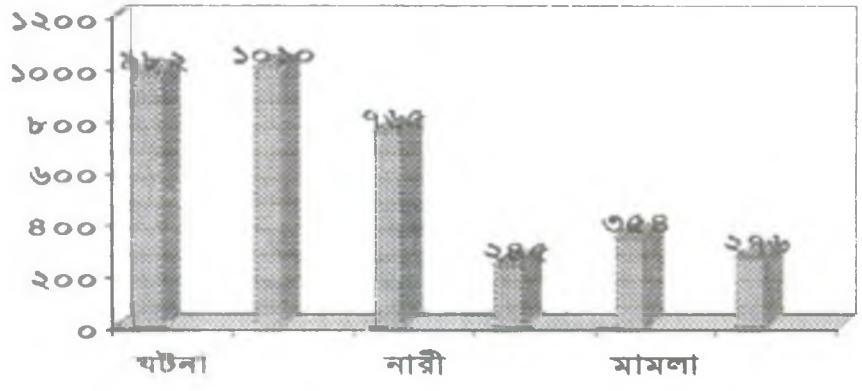

২৮ .সংবাদপত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চালচিত্র ২০০৩:ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার । পৃঃ৫০

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ষণ জনিত হত্যা: সামগ্রিক চিত্র ২০০৩([২৯])

মাস	ঘটনা	শিকার	নারী	শিশু	মামলা	গ্রেফতার
জানুয়ারি	১০	১০	৯	১	৫	৪
ফেব্রুয়ারি	৮	৮	৮	০	১	২
মার্চ	১৪	১৪	১৪	০	৫	
এপ্রিল	১৭	১৭	১৬	১	৯	
মে	১৩	১৪	১৩	১	২	
জুন	২১	২১	২১	০	৮	৫
জুলাই	১২	১২	১০	২	৩	১
অগাস্ট	১৩	১৩	১২	১	৫	১
সেপ্টেম্বর	১৩	১৩	৮	৫	৭	১
অক্টোবর	৪	৪	৪		২	২
নভেম্বর	৬	৬	৪	২	২	২
ডিসেম্বর	৫	৫	৫		২	১২
সর্বমোট	১৩৬	১৩৭	১২৪	১৩	৫১	৩০

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় , ২০০৩ সালে মোট ১৩৬ টি ধর্ষণ জনিত হত্যার ঘটনায় শিকার হয়ে প্রাণ হারাণ ১৩৭ জন নারী ও শিশু; এর মধ্য নারী ১২৪ জনও শিশু ১৩ জন ঐ সকল ঘটনায় এ সময় মামলা করা হয় ৫১ টি এবং গ্রেফতার করা হয় ৩০ জন অভিযুক্তকে।

ধর্ষণ জনিত হত্যা: সামগ্রিক চিত্র ২০০৩

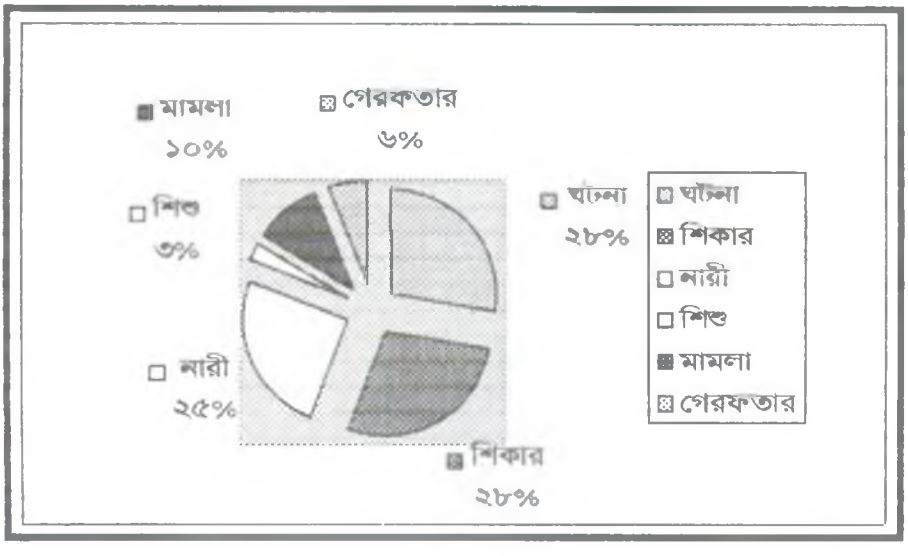

[২৯] ,সংবাদপত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চালচিত্র ২০০৩:প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও শিশু পাচার -২০০৩

বর্তমানে আমাদের দেশে পত্র-পত্রিকা খুললেই আমরা দেখতে পাই যে, অসংখ্য নারী-শিশু বিদেশে পাচার হচ্ছে। নিম্নে ২০০৩ সালে নারী ও শিশু পাচারের একটি পরিসংখ্যান দেয়া হল।

নারী ও শিশু পাচার : সামগ্রিক চিত্র

মাস	ঘটনা	শিকার	নারী	পুরুষ	শিশু	উদ্ধার	মামলা	গ্রেফতার
জানুয়ারী	২	২০	২০		০	১৯	১	১
ফেব্রুয়ারী	৭	১১	৭	১	৩	৬	১	৮
মার্চ	৭	৪৩	১৯	৪	২০	৪৩	১	১৫
এপ্রিল	৬	২৩	১৩	০	১০	২৩	১	৭
মে	১৮	৩৩	৩৩	০	০	২৭	৪	১৫
জুন	১৩	৭৮	৩৯	০	৩৯	৪৪	২	১৩
জুলাই	১১	২৪	৬	০	১৮	১৬	০	১১
আগস্ট	১১	২৫	১১	১	১৩	১৪	২	১২
সেপ্টেম্বর	১৮	৫১	২৫	১৬	১০	৩৫	২	৮
অক্টোবর	৩	৩	০	০	৩	৭	১	২
নভেম্বর	৩	৭	২	০	৫	৭	১	১
ডিসেম্বর	৪	৫	১	২	২	২৫	২	৩
মোট	১০৩	৩২৩	১৭৬	২৪	১২৩	২৬৬	১৮	৯৬

উপরের সারণী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে,নারী ও শিশু পাচারের মোট ঘটনা ১০৩ টি এর মধ্যে

নারী:১৭৬ ,শিশু : ১২৩ ,পুরুষ :২৪ জন, উদ্ধার : ২৬৬ জন।

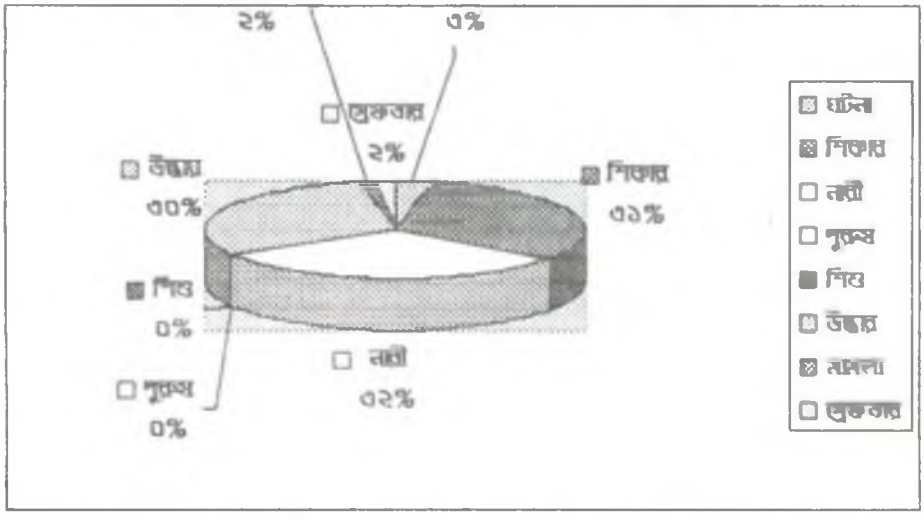

নারী ও শিশু পাচার -২০০৩ এর চিত্র উপরে দেখানো হল।

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতনের শিকার নারীদের কিছু চিত্র:

Dhaka University Institutional Repository

২০০৫ সালের মে মাসে নারী নির্যাতনের চিত্রঃ

২০০৫ সালের মে মাসে মোট নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে ৬৫৮টি।

এসিড নিক্ষেপের শিকার	১৫ জন
যৌতুকের কারনে নির্যাতিত	২৭ জন
এসিড দগ্ধের শিকার	১৫জন
অপহরণের ঘটনা ঘটেছে মোট	৩১ টি
ধর্ষণের শিকার	৯০টি
গণ ধর্ষণের শিকার	২৯টি
ধর্ষণের পর হত্যা	১৬টি
শ্লীলতাহানির শিকার	৯ জন।
নারী পাচার	৩৯জন
পতিতালয়ে বিক্রি হয়েছে	৩জন।
ফতোয়ার ঘটনা ঘটেছে	৩টি।
বিভিন্ন কারণে নারী ও শিশুকে হত্যা	৮০টি
শারীরিক নির্যাতন	১৪৩জন
পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে	১৪জন। [৩০]

৪.নারী নির্যাতন রোধে বাংলাদেশের আইন ঃ

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে প্রথম আইন প্রণয়ন করা হয় ১৯৩৮সালে একটি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে। পরবর্তীতে নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে কঠোর পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ বাতিল করে ১৯৯৫ সালে নারী শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু দেশে ক্রমবর্ধমান নারী ও শিশু নির্যতন ঘটনা বৃদ্ধি, অপরাধের ধরণ পরিবর্তন ও দুর্বলতা ,অষ্টপষ্টতা, ত্রুটি বিচ্যুতি অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণভাবে রোধ করে বর্তমান সমাজের চাহিদা উপযোগী নারী ও শিশু নির্যতন দমন আইন ২০০০ প্রণীত হয়। পরবর্তীতে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৮নং ধারা সংশোধন করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩ প্রণয়ন কর হয়।

নারীঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ২(ছ) ধারায় নারী বলতে যে কোনো বয়সের নারীকে বুঝানো হয়েছে।তবে ধর্ষণ এবং

---

[৩০]. সূত্র ঃ দৈনিক ইত্তেফাক ; ৩/৬/২০০৫ মহিলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

অপহরণের ক্ষেত্রে উক্ত আইনে নারীর নির্দিষ্ট বয়স সীমা উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্ষণ এবং অপহরণের ক্ষেত্রে নারীর বয়স ষোল বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।

নবজাতক শিশুঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ আইন অনুযায়ী নবজাতক শিশু বলতে যে শিশু সদ্য জন্ম লাভ করেছে এবং যার বয়স ৪০দিন পূর্ণ হয়নি এমন শিশুকে বোঝায়।

শিশুঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন)আইন ২০০০অনুযায়ী শিশু বলতে অনধিক ১৬ বছর বয়সের যে কোনো ব্যক্তিকে বোঝাবে।

আটক করে মুক্তিপণ আদায়ের শাস্তি ঃ

যদি কোনো ব্যক্তি মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্য কোনো নারী বা শিশুকে আটক করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড দন্ডিত হবে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং এর অধিক অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে

নারী পাচারঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী নারী পাচার বলতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গণিতাবৃত্তি বা নীতি গর্হিত কোনো কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করা বা ভাড়ায় অন্য কোনো ভাবে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে নারীকে দখলে রাখাকে বুঝায়।

নারী পাচারের শাস্তিঃ

উক্ত আইনের ৫ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি কোনো নারীকে পাচার করলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড দন্ডিত হবে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে বা অনাধিক বিশ বছর ও অন্যূন দশ বছর সশ্রম কারাদন্ড দন্ডিত হবে এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

শিশু পাচারঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী শিশু পাচার বলতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো শিশুকে (অনাধিক ১৬ বছর বয়স) বিদেশে থেকে আনয়ন কর বা প্রেরণ করা বা ক্রয় বিক্রয় করা বা এরূপ কোনো উদ্দেশ্যে নিজ দখলে ,জিম্মায় বা হেফাজতে রাখাকে বুঝায়।

নবজাত শিশু পাচারঃ

উক্ত আইন অনুযায়ী নবজাতক শিশু পাচার বলতে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নবজাতক শিশুকে হাসপাতাল শিশু বা মাতৃসদন নার্সিং হোম ক্লিনিক ইত্যাদি বা সংশ্লিষ্ট শিশুর অভিভাবকের হেফাজত থেকে চুরি করাকে বুঝায়।

শিশু ও নবজাত শিশু পাচারের শাস্তিঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ৬ ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি কোনো শিশুকে পাচার করলে , উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত

Dhaka University Institutional Repository

হবে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে বা এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

***ধর্ষণঃ**

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এ সংক্রান্ত বিধিমালয় ধর্ষণের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত আইনের ৯ ধারায় বিধান সাপেক্ষে Penal code ,1860(Act XLV of 1860)- এর Section 375 সংজ্ঞায়িত 'Rape' বঝাবে।

Penal code ,1860 Section 375 সংজ্ঞানুযায়ী যদি কোনো পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত ষোল বছরের অধিক বয়সের কোনো নারীর সাথে তার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তার সম্মতি আদায় করে অথবা ষোল বছরের কম বয়সের কোনো নারীর সাথে তার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম বা ধর্ষণ বলে গণ্য হবে।

***ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু:**

উক্ত আইনানুযায়ী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণ বা উক্ত ধর্ষণ পরবর্তী অন্যবিধ কার্যকলাপের ফলে ধর্ষিতা নারী বা শিশুর মৃত্যু হলে সেটি ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু বলে বিবেচিত হবে।

***ধর্ষণের শাস্তিঃ**

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ৯(১) উপধারা অনুযায়ী যদি কোনো পুরুষ কোনো নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করে তাহলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে।

***ধর্ষণের ফলে নারী বা শিশুর মৃত্যু হলে তার শাস্তিঃ**

উক্ত আইনের ৯(২) উপধারা অনুযায়ী ধর্ষণজনিত কারণে কোনো নারী বা শিশুর মৃত্যু হলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হবে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

***দলবদ্ধ ভাবে ধর্ষণ বা দলবদ্ধভাবে ধর্ষণজনিত মৃত্যুর কারণে শাস্তি ঃ**

অত্র আইনের ৯(৩) উপধারা অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে যদি কোনো নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণের ফলে যদি উক্ত নারী বা শিশু মারা যায় বা আহত হয় তাহলে। ঐ দলের প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হবে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং এর অতিরিক্ত অন্যূন ১ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

***পুলিশি হেফাজতে ধর্ষণের শাস্তি ঃ**

পুলিশি হেফাজতে কোনো নারী বা শিশু ধর্ষিত হলে হেফাজতকারী সরাসরি দায়ী হবে এবং হেফাজত ব্যর্থতার জন্য অনধিক দশ বছর কিন্তু অন্যূন ৫ সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং এর অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

***ধর্ষণ চেষ্টা করার শাস্তি ঃ**

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে তবে উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বছর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

***ধর্ষণ করে আহত বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করার শাস্তি ঃ**

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নারী বা শিশু ধর্ষণ করে আহত বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন তবে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারদন্ডে দন্ডিত হবে এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

৫.ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে শিশুর অঙ্গহানিঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ১২ ধারা অনুযায়ী যতি কোনো ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রির উদ্দেশ্যে কোনো শিশুর হাত, চক্ষু বা অন্য কোনো অঙ্গ বিনষ্ট করে বা অন্য কোনোভাবে বিকলাঙ্গ বা বিকৃত করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

৬.যৌন পীড়ণ ঃ

কোনো পুরুষ অবৈধভাবে তার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তার শরীরের যে কোনো অঙ্গ বা কোনো বস্তু দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করেন তাহলে তার এ কাজ যৌন পীড়ণ বলে গণ্য হবে।

***যৌন পীড়ণের শাস্তিঃ**

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নারীকে যৌন পীড়ণ করে তবে উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বছর অন্যূন তিন বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডে ও দন্ডিত হবে।

৫.ইসলামে নারী নির্যাতন রোধে কঠোর আইনঃ

নারী নির্যাতন সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতির অন্যতম প্রতিবন্ধক। নারীদেরকে ইসলাম মর্যাদা দিয়ে নির্যাতন আর বঞ্চনা থেকে মুক্ত করেছে।নির্যাতনের বিরুদ্ধে সকল ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছে। উপরে নারী নির্যাতনের প্রকৃতি, চিত্র এবং বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইসলামী ব্যবস্থার স্বরুপ তুলে ধরা হলঃ

৫.১ নারী ধর্ষণঃ

ইসলাম নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী আরোপ করেছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة فى دين

الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما من المؤمنين .

Dhaka University Institutional Repository

"ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষের প্রত্যেককে এক শত করে বেত্রাঘাত কর এবং আল্লাহর আইনের ব্যাপারে তাদের প্রতি কখনও অনুকম্পাশীল হওয়া চলবে না, যদি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস থাকে এবং যখন তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে, তখন মুসলমানদের একটি দল তাদের শাস্তি দেখবার জন্য যেন উপস্থিত থাকে।"[৩১]

আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, অনেকে শত্রুতাবশতঃ কারো প্রতি মিথ্যা অভিযোগ করে অথচ সে নিষ্কলুষ . সে অপরাধের সাথে জড়িত নয়। এরূপ মিথ্যাবাদীদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেনঃ

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا

تقبلوا لهم شهادة ابدا اولئك هم الفسقون

"যারা পুণ্যপূত মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করবে ,অতপর তারা স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে না তাদেরকে আশি বেত্রাঘাত কর এবং ভবিষ্যতে কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণকর না। এ ধরনের লোক নিজেরাই দুষ্কর্মকারী।"[৩২]

৫.২ পোশাক ও সতরের আদেশঃ

ধর্ষণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হল পোশাক ও সতরের শালীনতা। কারন শালীন পোশাক না পড়লে যুবকরা তাদের দেহ তথা শরীর দেখে ধর্ষণের প্রতি আসক্ত হয়। ধর্ষণের মনোবাসনা জাগে। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

يبني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا

"হে মানব সন্তান আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শরীর আবৃত করিবার জন্য পোশাক অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং এটা তোমাদের শোভাবর্ধক ।"[৩৩]

ملعون من نظر الى سواة اخيه

"যে আপন ভাইয়ের সতরে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে অভিশাপ্ত।"[৩৪]
মুসলিম শরীফে আছেঃ

لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المراة الى عورة المراة -

"কোন পুরুষ কোন পুরুষকে এবং কোন নারী কোন নারীকে যেন উলংগ অবস্থায় না দেখে।"[৩৫]

---

[৩১].আল কুরআন :সুরা আন নুর: আয়াত নং ২
[৩২].আল কুরআন :সুরা আন নুর: আয়াত নং ৪
[৩৩].আল কুরআন: সুরা আরাফঃ আয়াত নং ২৬
[৩৪].জাসসাস : আহকামুল কুরআন
[৩৫]মিশকাতুল মাছাবীহ : শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ : কিতাবুন নিকাহ :বাবুন নযরি ইলাল মাখতুবাত :পৃঃ ২৬৮ ; মাকতাবা মাআরেফুল কুরআন : তা বি ; চকবাজার , ঢাকা- ১২১১

Dhaka University Institutional Repository

لان اخر من السماء فانقطع نصفين احب الى من انظر الى عورة احد او ينظر الى عورتى.

"আল্লাহর কসম ,আমার আকাশ হতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার এবং দ্বিখন্ডিত হয়ে যাওয়া অধিকতর শ্রেয় এমন অবস্থা হতে যে আমি কারো গুপ্তাংগ দেখি এবং সে আমার গুপ্তাঙ্গ দেখে।" (- মাবসূত)

اياكم والتعرى فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغئظ وحين يفضى الرجل الى اهله.

"সাবধান !কখনও উলংগ হবে না। কারণ তোমাদের সংগ ত্যাগ করে না , মলত্যাগ ও সহবাসের সময় ব্যতীত ।"-তিরমিযী

اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا ياجرد العيرين

"যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীর নিকটে গমন করে তখনও সে যেন তাহার সতর আবৃত রাখে এবং একেবারে গর্দভের ন্যায় উলংগ হয়ে না পড়ে।"

৫.৩ পর্দার আদেশঃ

নারী নির্যাতন রোধের জন্য পর্দা অত্যন্ত প্রয়োজন।কারণ পর্দা ছাড়া অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় চলা ফেরা করলে পুরুষরা তাতে আকৃষ্ট হয় । পরিনামে তাদের মনবাসনা পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন অপকর্মের আশ্রয় নিতে হয় ।ফলে তারা শিকার হয় এসিড নিক্ষেপের, ধর্ষণের ।মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذالك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون .وقل للمؤمنت يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمر هن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا ليعولتهن او اباء هن او اباء بعولتهتن او ابناء هن اوابناء بعولتهن ...

।হে নবী! মু'মিন পুরুষগণকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে । এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা । নিশ্চই তারা যা কিছুই করে , আল্লাহ তা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং মু'মিন নারীগণকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনামিত রাখে এবং নিজেদের যৌন রক্ষা করিয়া চলে এবং স্বতই প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং যেন তারা স্বীয় বক্ষের উপরে উড়বার চাদর টেনে দেয় এবং সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে ।অন্য কারো নিকটে ।[৩৫]

---

[৩৫] .আল কুরআন :সূরা আন নুর: আয়াত নং ঃ ৩০-৩১

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেনঃ

ينساء النبى لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا .وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرجالجاهلية الاولى.

হে নবীর বিবিগণ! তোমরা তো সাধারণ নারীদের মত নও । যদি পরহেযগারী অবলম্বন করার ইচ্ছা থাকে ,তা হলে বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বল না। কারণ এটার ফলে যাদের অন্তরে খারাপ বাসনা আছে , তারা তোমাদের উপরে এক ধরনের আশা পোষণ করে বসবে। সহজ-সরলভাবে কথা বল।আপন ঘরে থেকেও এবং অতীত জাহেলিয়াতের ন্যায় রূপ-যৌবনের প্রদর্শনী করে বেড়িও না ।[৩৬]

يايها النبى قل لازواجك وبنتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن .ذالك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين.

হে নবী ! আপন বিবি কন্যা ও মু'মিন মহিলাদের বলে দিন তারা যেন তাদের শরীর ও মুখমন্ডল চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে ।[৩৭]

৫.৪ যৌতুক নয় স্ত্রীকে মোহরানা প্রদানের নির্দেশ দানঃ

সাম্প্রতিককালে নারী নির্যাতন অন্যতম কারণ হিসাবে যৌতুক প্রথাকে চিহ্নিত করা যায় । যৌতুকের দাবীকে কেন্দ্র করে মানসিক এবং দৈহিকভাবে নির্যাতন চালনোর ফলে মহিলাদের আত্মহত্যা এবং হত্যার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে । ইসলাম এই যৌতুক প্রথাকে হারাম ঘোষণা করে বিবাহ করার সময় স্ত্রীকে মোহারানা প্রদান করা ফরয করেছে ।

আল-কুরআন এর ভাষায় ঃ

واتو النساء صدقاتهم نحلة

"তোমাদের স্ত্রীদের কে সন্তুষ্ট চিত্তে মোহরানা দিয়ে দাও।"[৩৮]

আরো বলা হয়েছে

واتوهن اجورهن بالمعروف

"ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে মোহরানা দিয়ে দাও ।" [৩৯]

এভাবে যৌতুক নয় ; বরং স্ত্রীকে মোহারানা প্রদান নির্দেষ দিয়ে নারী নির্যাতন রোধ করেছে ।

---

[৩৬] .আল কুরআন :সুরা আহযাব : আয়াত নং ৪৩২-৩৩

[৩৭] .আল কুরআন :সুরা আহযাব : আয়াত নং ৪৫৯

[৩৮] .আল কুরআন :সুরা আন নিসা : আয়াত নং ৪ ৪

[৩৯] . আল কুরআন :সুরা আন নিসা : আয়াত নং ৪১০

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ স্বামীকে ভরণ-পোষণ প্রদানের নির্দেশ দানঃ

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নির্যাতনের অন্য একটি রূপ হলো স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ না দেওয়া। অনেক সময় স্বামী তার স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ প্রদান করে না। ফলে স্ত্রীকে বহু কষ্ট করে জীবন নির্বাহ করতে হয়। কিন্তু ইসলাম এই নির্যাতনের অবসান ঘটিয়েছে । মহানবী (সাঃ) বিদায় হজ্জে ভাষণে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষাণা করেছেন ,

" যথাযথভাবে তাদের (স্ত্রীদের) পানাহার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা তোমাদের উপর অপরিহার্য "[৪০]

৫.৬ জীবন-সঙ্গী বাছাইয়ের অধিকার প্রদানঃ

একজন মেয়ের উপর সবচেয়ে বড় নির্যাতন হলো তার অপছন্দনীয় কোন পুরুষকে স্বামী হিসেবে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া । আমাদের সমাজে পুরুষেরা কাংক্ষিতমানের স্ত্রী লাভের জন্য হাজারো কনে দেখতে পারেন , কিন্তু নারীর অধিকারই আসে না, বরং এ সমাজে এ দায়িত্ব নিছক অভিভাবকরাই আনজাম দিয়ে থাকেন । এ জাতীয় একপেশে ও অধিকার হরণকারী নীতির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই । ইসলামের স্পষ্ট বক্তব্য হলো -নারীর বিয়ের ব্যাপারে অবশ্যই তার অনুমতি নিতে হবে এবং জীবন-সঙ্গী বাছাইয়ের ব্যাপারে তার পূর্ণ অধিকায় রয়েছে । নবী করীম (সাঃ)বলেন

لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستأذن

"বিধবা নারীর নির্দেশ ও কুমারী অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে দেওয়া যাবে না।"[৪১]

৫.৭ নিভৃতে সাক্ষাত ও শরীর স্পর্শঃ

নারী নির্যাতনের আর একটি কারণ হল গোপনে সাক্ষাত এবং শরীর স্পর্শ।কারন কোন পুরুষ লোক যদি কোন মহিলার সাথে গোপনে একত্রে বসে তাহলে তার মধ্যে নানা জল্পনা কল্পনার উদ্রেক হয় । পরিশেষে স্বীয় প্রবৃত্তি মেটানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।তাই ইসলাম এ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

হাদীস শরীফে এসেছে ঃ

عن عقبة ابن عامر ان رسول الله صلعم قال اياكم و الدخول على النساء فقال

رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحمو قال الحمو الموت

উকবা বিন- আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, 'সাবধান !নিভৃতে নারীদের নিকটে যেও না ।' জনৈক আনসার বললেন,

---

৪০.সহীহ লি মুসলিম , কিতাবুল হাজ্জ, হাদীস নং- ২১৩৭

৪১.সহীহুল বুখারী কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ৪৭৪১

Dhaka University Institutional Repository

'হে আল্লাহর রাসুল! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? ' নবী (সঃ) বললেন, 'সে তো মৃত্যুর ন্যায়।' [৪৩]

তিরমিযী শরীফে আছে ;

لا تلجوا على المغيبات فان الشيطان يجرى من احدكم مجرى الدم

রাসুল (সঃ) বলেন, 'স্বামীর অনুপস্থিতে কোন নারীর নিকটে যেয়ো না। কারণ শয়তান তোমাদের যে কোন একজনের মধ্যে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হবে।'

স্পর্শ করার বিরুদ্ধে এ রূপ নির্দেশ আছে:

قال النبى صلعم من كف امراة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيمة

নবী (সঃ) বলেন, 'যদি কেহ এমন কোন নারীর হস্ত স্পর্শ করে , যার সাথে তার কোন বৈধ সম্পর্ক নেই , তা হলে পরকালে তার হাতের উপরে জ্বলন্ত অগ্নি রাখা হবে।' [৪৪]

৫.৮ সদাচারণের নির্দেশঃ

দাম্পত্য জীবন সুখের হতে হলে দরকার পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, সহানুভূতি এবং বিশেষ করে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সদাচারণ। ইসলাম তাদের প্রতি সদাচারণের নির্দেশ প্রদান করেছেন।কারণ স্বামী যদি তাদের (স্ত্রীর) সাথে সদাচারণ না করে তাহলে নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। সদাচরণ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে । এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) স্বামীদের নসীহত করে বলেন ,

استوصوا بالنساء خيرا فان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شىء فى الضلع

اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে সব সময় কল্যাণময় ব্যবহার করার জন্য আমার নসীহত কবুল কর ।কেননা নারীরা জন্মগতভাবেই বাঁকা স্বভাবের হয়ে থাকে। তুমি যদি জোরপুর্বক তাকে সোজা করতে যাও, তবে তুমি তাকে চূর্ণ করে দিবে । আর যদি তাকে এমনি ছেড়ে দাও তবে সে সব সময় বাঁকা থেকে যাবে । অতএব বুঝে-শুনে তাদের সাথে ব্যবহার করার জন্য আমার এ উপদেশ গ্রহণ করবে ।" [৪৫]

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

---

৪৩. সহীহুল বুখারী,প্রাগুক্ত : কিতাবুন নিকাহ ; হাদীস নং ৪৮৫২; ৮ম খন্ড : ইফাবা সম্পাদনা কর্তৃক অনুবাদ : প্রকাশকাল : ২য় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর : ২০০০ ইং

৪৪. বুখারী শরীফ:

৪৫. সহীহুল বুখারী, কিতাবু আহাদিছিল আম্বিয়া , হাদীস নং ৩০৮৪

Dhaka University Institutional Repository

وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে খুব ভালভাবে ব্যবহার ও বসবাস করো। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ করো তাহলে এ হতে পারে যে, তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করছো অথচ আল্লাহ তার মধ্যে বিপুল কল্যাণ নিহিত রেখে দিবেন।"[৪৫]

মহানবী(সঃ) বলেন ঃ

خياركم خياركم لنسائكم

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম , যে তার স্ত্রীদের সাথে উত্তম ।[৪৬]

সুতরাং নারী নির্যাতন রোধের জন্য স্ত্রীর সাথে সদাচারণ করা উচিত।

৫.৯ ইসলামে এসিড নিক্ষেপের শাস্তিঃ

এসিড দগ্ধ ব্যক্তি মারা গেলে ইসলামের বিধান অনুযায়ী এসিড নিক্ষেপকারী সন্ত্রাসীর শাস্তি মৃত্যু দন্ড।[৪৭]

আর মারা না গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামী আইনে এর শাস্তি অর্থদন্ড।এসিড দগ্ধ ব্যক্তির চিকিৎসা প্রয়োজনে প্লাষ্টিক সার্জারির সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করতে হবে । তবে এসিড দগ্ধ ব্যক্তির চোখ নষ্ট হলে,দৃষ্টি শক্তি লোপ পেলে সে ক্ষেত্রে জ্বলন্ত কিছু দ্বারা এসিড নিক্ষেপকারী সন্ত্রাসীর চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয়ার বিধান ও রয়েছে।[৪৮]

এ ছাড়াও ইসলাম নারীদেরকে যে সমস্ত অধিকার প্রদান করেছেন সে অধিকার ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মুলক ব্যবস্থা । সে অধিকার গুলো হলঃ

নারী অধিকার /মর্যাদা ঃ

***কন্যারূপে নারী:**

আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হত । তাদের জন্মকে অপমানজনক মনে করা হত।

নবজাত কন্যা-সন্তান হত্যার রীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল । তাদের জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করা হত। পণ্য দ্রব্যের মত তাদেরকে বিক্রয় করা হত। পশুর বদলে তাদেরকে বিনিময় করা হত নবজাত কন্যা-সন্তানকে বিভিন্ন প্রকারে হত্যা করা হত। কেউ কেউ গর্ত

৪৫.আল কুরআন: সুরা নিসা; আয়াত নং ১৯

৪৬.মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৯৭২৫

৪৭.ফতোয়ায় আলমগীরি ,৬ষ্ঠ খন্ড,পৃ.৯ শামী ১০ম খন্ড,পৃঃ ১৫৬,হিদায়া ৪র্থ খন্ড,পৃঃ৪৩

৪৮. ফতোয়ায় আলমগীরি ,৬ষ্ঠ খন্ড,পৃ.৯

Dhaka University Institutional Repository

খনন করে তাতে পুঁতে তাদেরকে হত্যা করত । কেউ কেউ খুব উচু স্থান হতে তাদেরকে নীচে নিক্ষেপ করত । আবার কেউ কেউ পানিতে ডুবায়ে মারত বা কেটে ফেলত ।এমন নৃশংস ও বর্বর ব্যবহারে নারীদের অধিকার অপহরণ করা হত যেন তারা কসাইখানায় বলী হওয়ার উপযোগী নির্বাক পশু ছিল।[৪৯]

তদানীন্তন সমাজ থেকে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার ও নির্দয়ভাবে কেড়ে নেয়া হয়েছিল।আলকুরআনে বর্ণিত আছেঃ

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? [৫০]

অথচ মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ - او
يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা করে দেন বন্ধ্যা । তিনি সর্বজ্ঞ ,সর্বশক্তিমান ।[৫১]

নবী করীম (সঃ) বলেছেন,"যে ব্যক্তির একটি কন্যা সন্তান বা বোন রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত কবর দেয়নি , অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্লের ভাব দেখায়নি এবং পুত্র সন্তানকে তার কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য দেয়নি , সে ব্যক্তি জান্নাতী "। [৫২]

নবী (সাঃ) ফাতিমা (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন; "ফাতিমা আমার (দেহেরই) একটি টুকরা। যে ব্যক্তি তাকে ক্ষুব্ধ করে সে প্রকারন্তরে আমাকে ক্ষুব্ধ করলো"।[৫৩]

তিনি আরো বলেছেন , কন্যাদেরকে ঘৃণা করোনা , কেননা আমি স্বয়ং কন্যাদের পিতা। [৫৪]

৪৯.নারী ও সমাজ : আব্দুল খালেক : পৃঃ ১৬

৫০. আলকুরআন,সুরা তাকভীর: আয়াত নং ৮-৯

৫১. আলকুরআন,সুরা শুরা : আয়াত নং ৪৯-৫০

৫২.সুনানে আবু দাউদ ঃ আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস আস-সিজিস্তানী (মাকতাবা রশীদিয়া ,দিল্লী,তা,বি,)আবওয়াবুন নাওম , বাব-ফী ফাযলি মান আলা ইয়াতামা।

৫৩. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আলি-বুখারী: জামে আস-সহীহ (মাকতাবা রশীদিয়া ,দিল্লী,তা,বি,)কিতাবুল মানাকিব ,বাব-মানাকিব ফাতিমা।

৫৪. মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার , আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী (আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা, জুলাই , ২০০৩) পৃঃ ১

Dhaka University Institutional Repository

*মহানবী (সঃ)এর বাণীঃ

من كانت له انثى فلم يادها ولم يهنها ولم يؤثر ولده

عليها يعنى الذكور ادخله الله الجنة.

"যার কন্যা সন্তান হয়েছে অথচ তাকে জীবন্ত কবর দেয়নি বা তাকে লাঞ্ছিত ও করেনি কিংবা কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তানকে বেশী আদর যত্ন করেনি, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"

*স্ত্রীরূপে নারী :

আরব সমাজে নারীদের সাথে দাসী-বাঁদীর ন্যায় ব্যবহার করা হতো। তাদের কোন প্রকার মর্যাদা অধিকার স্বীকার করা হতোনা । হযরত উমর (রাঃ) এর উক্তি থেকে তার প্রমান মিলে । তিনি বলেন, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, জাহিলিয়া যুগে আমরা নারীদের কোনই গুরুত্ব দিতাম না, পরে যখন আল্লাহ তাদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে অকাট্য বিধান নাযিল করলেন এবং মীরাসের অংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন তখন আমাদের আচারণ ও মনোভাবের আমূল পরিবর্তন সাধিত হলো ।[৫৫]

স্ত্রীলোকদের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ,

وعاشروهن بالمعروف

" তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে "। [৫৬]

নবী (সঃ) বলেছেন ," তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম" ।[৫৭]

নবী(সঃ)আরো বলেন ," সমগ্র পৃথিবীই সম্পদ , আর নারী হচ্ছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ।" [৫৮]

নবী (সাঃ) বলেন , "পূর্ণ মু'মিন সেই ব্যক্তি যে উত্তম ব্যবহারকারী এবং আপন পরিবারের প্রতি কোমল প্রাণ।"[৫৯]

আল্লাহর বাণীঃ

هن لباس لكم وانتم لباس لهن.

'তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ ।'

---

৫৫. সহীহ মুসলিম , ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : (মাকতাবা রশীদিয়া দিল্লী) খ্রীঃ ১৯৩৮ :কিতাবুল তালাক ,বাব-বায়ানু আনিতাশাইউরাহু ইমরা আতাহু লা-ইয়াকুনা তালাকান ইল্লা বিনিয়াহ।

৫৬. সুরা নিসা: আল কুরআন :আয়াত ১৯

৫৭.সুনানে ইবনে মাজাহ :আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ আল-কাযবীনি :কাযবীনি (মাকতাবা রশীদিয়া ,দিল্লী,তা.বি.)আবওয়াবুন নিকাহ , বাব-হুসনু মুআশারা তিন নিসা

৫৮.সহীহ মুসলিম , ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ: (প্রাগুক্ত) কিতাবুল রিদা,বাব-আল-ওয়াসিয়াতু বিনিসাই।

৫৯.আল-জামে আতরিমিযী :আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী,তা.বি.)কিতাবুর রিদা,বাব-মা-জাআ ফী হাকিকল মারআতি আলা যাওজিহা।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ বলেনঃ

فاتقوا الله في النساء

'তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে ।'

لزوجك عليك حق

'তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে ।

خياركم خياركم لنسائكم

'স্ত্রীদের কাছে যারা উত্তম ,তারাই তোমাদের মধ্য উত্তম'

***মাতা রূপে নারীঃ**

ইসলামে মা হিসেবে নারীকে যে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম ও সমাজের সাথে এ বিষয়ে তুলনাই করা চলে না।

আল কুরআনে এরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا
وَّضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَ فِصٰلُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا

"আমি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে , তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও প্রসব ছাড়াতে সময় লাগে ত্রিশ মাস।"[৬০]

নবী (সঃ) বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের সাথে অবাধ্যাচরণ করা হারাম করে দিয়েছেন।"[৬১]

নবী (সাঃ) বলেছেন .

الجنة تحت اقدام امهاتكم

"মায়েদের পদতলে সন্তানের জান্নাত।"[৬২]

অপর এক হাদীসে আছে, মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমা বলেন, আমার পিতা নবী (সঃ) এর কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল ! জিহাদে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে আমি আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন , তোমার মা জীবিত আছে কি? তিনি বলেন : হ্যা, জীবিত আছেন । তিনি বললেন , মায়ের খিদমতকে অপরিহার্য করে নাও। কেননা জান্নাত তার পায়ের কাছে।"[৬৩]

৬০.সুরা আহকাফ : আলকুরআন: আয়াত ং ১৫

৬১.আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আলি-বুখারী : জামে আস-সহীহ (প্রাগুপ্ত) কিতাবুল ইসতিকরাদ, বাব-মা ইয়ানহা আন ইদাআতিল মাল।

৬২.মাযমাউয যাওয়ায়েদ ও মামবাউল ফাওয়ায়েদ: হাফিজ নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবি বাকর আল-হায়সামী:(দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন, ১৪০৮/১৯৮৮)কতাবুর বিয়র ওয়াসিলাহ বাব- মা জাআ ফিল বিয়রি ওয়া হাকিকিল ওয়ালিদাউন, ৮ম খন্ড।

৬৩.মাযমাউয যাওয়ায়েদ ও মামবাউরল ফাওয়ায়েদ:(প্রাগুপ্ত)

Dhaka University Institutional Repository

৪.মানবিক মর্যাদাঃ

ইসলাম পুরুষের সঙ্গে নারীকে একই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাদের রক্ষাকবচ হিসেবে বহু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে।

📖আল্লাহর বাণীঃ

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

"হে মানব সম্প্রদায় , তোমাদের প্রভুকে তোমরা ভয় কর ,যিনি তোমাদের একটি মানুষ হতে সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় হতে বহু সংখ্যক স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি করেছেন"[৬৫]

ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষাঃ

ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা নারীকে সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে এবং স্ত্রী ,কন্যা, মাতা, আত্মীয় হিসাবে তার ব্যক্তিগত মর্যাদা,অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে

মৌলিক অধিকার সংরক্ষণঃ

ইসলাম পুরুষের মতো নারীরও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রে অন্ন-বাসস্থান ও মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে শুধু উপদেশের মাধ্যমেই নয় বরং পালনীয় আইন সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রাজনৈতিক মর্যাদা ঃ

পুরুষের মতো নারীদেরও রাজনৈতিক অধিকারগুলো ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত। যেমন তাদের অবাধে মত প্রকাশের , ভোট প্রদানের কিম্বা সমালোচনার অধিকার ইসলাম দিয়েছে।প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাই ইসলামী রাষ্ট্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তাঃ

ইসলাম একজন নারীকে জীবন, সম্পদ,মান-সম্ভ্রম ও সামাজিক মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করেছে।

শিক্ষার অধিকার ঃ

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, ইসলামী জ্ঞানার্জন অপরিহার্য হিসেবে ঘোষণা করেছে যা ধর্মীয় জীবনের পাশাপাশি বৈষয়িক ক্ষেত্রসমূহে ও প্রযোজ্য।

মহানবী (সঃ) বলেছেন طلب العلم فريضة على كل مسلم

"জ্ঞানান্বেষণ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপরই ফরজ।"[৬৬]

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ঃ

কোন মহিলা যদি সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষা শেষ করে উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী হয়, ইসলাম তাকে উৎসাহিত করে এবং এ ব্যাপারে কোন বৈষম্য রাখেনি।

[৬৫]. আল কুরআন : সূরা আন নিসা: আয়াত নং ১

[৬৬]. মিশকাতুল মাছাবীহ : শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ : প্রাগুক্ত : কিতাবুল ইলম : পৃঃ ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক ক্ষেত্রে অধিকার ঃ

ইসলাম সামরিক ক্ষেত্রেও জ্ঞানার্জন ও দক্ষতার্জনে নারীকে উৎসাহিত করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে যখন নিজ সম্ভ্রম ও শরীরের উপর আক্রমন আসে তখন নারী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে । এছাড়া ও ওহুদ যুদ্ধে হযরত আয়েশা ও উম্মে আওফা যোদ্ধাদের পানি পান করিয়েছিলেন যা নারীকে সহযোদ্ধা হিসেবে ইসলাম মর্যাদা দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেঃ

প্রাক-ইসলামী যুগের বঞ্চিত নারীকে ইসলামই প্রথম অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাদের এসব অর্থনৈতিক অধিকার নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিহত এবং হস্তক্ষেপের যোগ্য নয়।

উত্তারিধকার অর্জনেঃ

প্রাক-ইসলামে যুগে কিংবা (বর্তমানে) হিন্দু ধর্মে যে নারীরা সম্পত্তির অধিকারই পেত না, সে ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদেরকে পিতা, মাতা, নিকট আত্মীয় ও স্বামীর পক্ষ থেকে উত্তারাধিকার অর্জনের অধিকার দিয়েছে।

ভরণ-পোষণের অধিকারঃ

নারীরা বিয়ের পূর্বে অভিভাবক এবং বিয়ের পরে স্বামীর কাছ থেকে ভরণ-পোষণ লাভ করবে এ অধিকার ইসলাম নিশ্চিত করেছে।

নিজস্ব সম্পদ অর্জনঃ

ব্যক্তিগত ভাবে অর্জিত টাকা পয়সা দিয়ে নারী ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। এতে স্বামী কিংবা তার অভিভাবকরা কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না । তার সম্পদের একক মালিকানা তার নিজেরই।

স্বামী নির্বাচনের অধিকার ঃ

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় স্বামী নিজ পছন্দ মতো নির্বাহন করা স্ত্রীদের অধিকার। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়াকে মহানবী (সঃ) নিরুৎসাহিত করেছেন।

তালাক গ্রহণঃ

অযোগ্য ও অপদার্থ স্বামীর কাছ থেকে মুক্তি নিয়ে নারীর বিবাহ বিচ্ছেদকরণের অধিকার ইসলামে স্বীকৃত । কোন নারীকে ইসলাম নিগৃহীত হতে উৎসাহিত করেনি।

পূর্ণবিবাহের অধিকার ঃ

কোন নারীর স্বামী মারা গেলে কিংবা তালাক প্রাপ্তা হলে, তার দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইসলাম কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি। এটি ইসলামে স্বীকৃত ।

ধর্মীয় মর্যাদা ঃ

পরিশেষে ইসলামী জীবন ধারায় মৌলিক উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসুল (সঃ) নর কিংবা নারীর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি করেননি। নারী -পুরুষ প্রত্যেকেই আল্লাহর উপাসনার মাধ্যমে পৃথকভাবে

Dhaka University Institutional Repository

পারলৌকিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হতে পারেন। নিজ নিজ কৃতিত্বের জন্যে যেমনি ভাবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে , তেমনি অপকর্ম এবং অপারগতার জন্যে পৃথক জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর বাণীঃ

ومن يعمل من الصلحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك

يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا

"পুরুষ বা স্ত্রী যে লোকই নেক আমল করবে।ঈমানদার হয়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে , এ ব্যাপারে কারো প্রতি এক বিন্দু জুলুম ও করা হবে না।"[৬৫]

*অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও কর্ম সংস্থানের অধিকার ঃ

ইসলাম জাতি ,ধর্ম,নির্বিশেষে সকল মানুষ তথা প্রাণী কূলের খাদ্যের নিরাপত্তার অধিকার প্রদান করেছে।ইচ্ছা ও সামর্থ অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি যে কোন পেশা ও চাকরী গ্রহণ করতে পারে। দুঃস্থ , পঙ্গু, ইয়াতীম মিসকিন ও সকল শ্রেণীর মানুষের জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদান ইসলামী রাষ্ট্র, ব্যবস্থার অপরিহার্য কর্তব্য।

আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ "যাদের অভিভাবক নেই, তাদের অভিভাবক আমি"

এভাবে ইসলাম নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মর্যাদা দান করে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।পর্দার বিধান দিয়ে তাদের ইজ্জত-সম্মানকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে সুরক্ষিত করেছেন। শিক্ষা, অর্থনৈতিক অধিকার, সম্পদের উত্তারাধিকার, মৌলিক মানবাধিকার প্রভৃতি দান করে তাদেরকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

এ নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ
উপরে নারী নির্যাতনের বিভিন্ন চিত্র ও তথ্য আলোচিত হল । নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করতে হলে আমরা দুধরণের ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারি ।

* প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা*প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা

প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সমূহঃ

*অশ্লীলতা প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
* নারীকে নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে ।
*অবৈধ নারীবাদী সংগঠন সমূহকে নিষিদ্ধ করতে হবে ।
* নারী নির্যাতন তথা- ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, অঙ্গহানী, অপবাদ দান, কন্যা শিশুর ভ্রূণ হত্যা, পাচার, পতিতাবৃত্তিতে

৬৫.সুরা আন নিসা : আল কুরআন : আয়াত নং ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগ, শারীরিক নির্যাতন , সম্মানহানী ইত্যাদি অপরাধের জন্য ইসলামী শরীয়ত যে শাস্তির বিধান দিয়েছেন তা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

*পর্দার বিধান লঙ্ঘন কারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে।

*প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা

*যৌতুক প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবেখ।

*মোহরাণা প্রদান করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

*ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা দিয়েছে , পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে সে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

*ইসলামী শিক্ষার বিস্তার করতে হবে ।

*নারীকে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার সমূহ সম্পর্কে সচেতন করা ।

*নারীরক উপযুক্ত পরিবেশে অর্থোপার্জনের সুযোগ করে দেওয়া।

* শরীয়ত -সম্মত কারণে নারীকে তালাক প্রদান করা।

*সংসার জীবনে স্ত্রীর পরামর্শকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা।

*বিবাহ-পূর্ব প্রেম , পরকীয়া প্রেম, ক্লাবে আড্ডা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা।

*অশ্লীলতা বন্ধ করা ।

*ব্যক্তি , পরিবার ও সমাজ জীবনে ধর্মীয় বিধি বিধান পালন ও আল্লাহ ভীতির চর্চাকরণ। [৬৬]

৬.সার্বজনীন আদর্শ

নারী জাগরণ, নারী অধিকার বাস্তবায়ন, নারী প্রগতি শব্দ বা বাক্যগুলো আজ বেশ আলোচিত। নারী সংগঠকরা তাদের অধিকার আদায়ের নামে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সমাবেশ মিছিল করছে।তারা তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সারা বিশ্বে ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

১৯১০ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন -এ অনুষ্ঠিত নারী সম্মেলনে নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা দেন। ১৮৫৭ সালে ৮ মার্চ আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের একটি সূচ কারখানার নারীরা মানবেতর জীবন, অসম মজুরি দৈনিক ১২ ঘন্টা ইত্যাদি কাজ অসঙ্গতিকে সামনে রেখে যে আন্দোলন গড়ে তুলে এবং

---

৬৬. আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান ঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৩৩

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার লাভ করে সে ঘটনাকে সামনে রেখে ৮ মার্চকে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা দেন।[৬৭]

নারী উন্নয়নে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ সর্বপ্রথম নারী পুরুষের মধ্যে সমতার লক্ষ্যে তাদের সনদ গ্রহণ করে এবং ১৯৪৬ সালে নারীর রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত কমিশন গঠন করে। ১৯৫২ সালে জাতিসংঘ নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত সনদ অনুমোদন করে নেয়। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে আর্ন্তজাতিক নারী বর্ষ পালিত হয় এবং ঐ বছরই মেক্সিকোতে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথম বিশ্ব নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ করার জন্য UNGA ১৯৭৫৯ সালে CEDAW গ্রহণ করে। এভাবে একে একে সর্বশেষ জাতিসংঘ ১৯৮৪ সালে বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে ৮ মার্চকে ঘোষণা করে।

তবে এ নারী অধিকার নিয়ে অনেক নারী প্রগতিবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন।নারী অধিকার মানে এই নয় যে, যে যা খুশি তা করবে । নারী ও পুরুষের অবস্থান স্থল হল আলাদা । প্রত্যেকের স্ব স্ব অবস্থানে সেখানকার অধিকারই হল অধিকার । পুরুষ রিকসা চালায় তাই বলে নারীদের ও রিকসা চালাতে হবে ;আবার নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহস্থালী কাজ করে বলে পুরুষের ও তা করতে হবে এমনটা নয়।নারী অধিকারের নামে বেহায়াপনা , উলঙ্গপনা, শরীর প্রদর্শনী এটা নয়। বরং ইসলাম প্রবর্তিত অধিকারই সর্বজনীন। নারী অধিকার নিয়ে আজ যে বিশ্ব মাতামাতি করছে ইসলাম তা বহুপূর্বেই প্রদান করেছে ।

আজ মেয়েরা স্কুলে নিরাপদে যেতে পারছে না, কর্মজীবী মহিলারা অফিস থেকে নিরাপদে রাত্রে বাসায় ফিরতে পারছে না,একাকী পেয়ে ধর্ষকরা ইজ্জত লুটে নিচ্ছে। বিদেশে মহিলারা পাচার হচ্ছে।সেখানে গিয়ে তারা মানবতার জীবন যাপন করছে। কাকেও জোর পূর্বক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হচ্ছে। মহিলারা গণধর্ষণের শিকার হচ্ছে। ৫ বছরের শিশুরা পর্যন্ত নিরাপদ নয় । কেন? এ প্রশ্নের উত্তর একটাই ,আর তা হল ইসলাম প্রবর্তিত অনুশাসন পূর্ণাঙ্গভাবে না মানা ।

ইসলামে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ,প্রতিকার, সংযমের যে ব্যবস্থা প্রদান করেছে তা সর্বজাতির জন্যে তা প্রযোজ্য কিনা এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়টির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধন করব।

*এ বিধানের কোন ক্ষতিকর প্রভাব আছে কি?

---

৬৭. কারেন্ট ওয়ার্ল্ড : এপ্রিল সংখ্যা ২০০৫: পৃঃ ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

*এ আইন সকলের জন্য মঙ্গলজনক কিনা ?
*এ বিধান প্রযোজ্য হলে কি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে?
*জাগতিক সমস্যার কোন সমাধান হবে কিনা।
*অন্যন্য ধর্মে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে কিনাঃ

উপরে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইসলামের যাবতীয় নির্দেশমালা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ নীতি গুলো যদি সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরের লোক সমাজে পালন করে, মেনে চলে তাহলে পরিত্রাণ পেতে পারে একটি সমাজ, একটি রাষ্ট্র,একটি বিশ্ব। সকল জাতিই এর সুফল পেতে পারে।ইসলাম প্রদত্ত বিধান যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে কোন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই বরং সেখানে রয়েছে সার্বিক মঙ্গল। অন্যান্য জাতি,গোষ্ঠীর প্রতি কোন বিরূপ প্রভাব পড়ার কোন আশংকা নেই।

তাইতো বলব যে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইসলামের আইন সার্বজনীন, সর্বগ্রাহ্য। এ অনুশাসন মেনে চললেই আমরা নারী নির্যাতন মুক্ত একটি সুন্দর , প্রস্ফুটিত সমাজ দেখতে পারব।দেখতে পারব একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ, আমাদের বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম ও সমসাময়িক অর্থনীতি
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সুদ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ দারিদ্র্য বিমোচন।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

জীবন, জীবিকা,অর্থনীতি,পারস্পরিক সংমিশ্রণে গঠিত অর্থনৈতিক নির্দেশনা সমাজের গতিময়তা বৃদ্ধি করে। প্রাণ চাঞ্চল্যতা ফিরিয়ে আনে। তবে সে অর্থনীতি হতে হবে আদর্শিক,যুগোপযোগী, শঠতাহীণ,কল্যাণমুখী। সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী অর্থনীতি মানুষের মৌলিক,মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতার মুকুটই শিরে ধারণ করেছে।পরিবর্তে উপহার দিচ্ছে শোষণ আর সাম্যহীন পরিবেশ। শুধু পাশ্চাত্য জনগোষ্ঠীই নয় বরং গোটা দুনিয়া এ অভিশাপ থেকে মুক্তি চাচ্ছে। সুদের রাহুল গ্রাস থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী মুক্তির সন্ধান খুজছে। তারা ইসলামী ভাবধারায় গঠিত অর্থনীতিকে মুক্তির মন্ত্র, চাবি হিসেবে বিবেচনা করছে। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি সামগ্রিক ও চিরন্তন দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর সে দর্শনের নাম হচ্ছে ইসলাম।

বস্তুত ইসলাম একটি সার্বজনীন বিপ্লবের আহবায়ক। ইসলাম একটি ব্যাপক ও পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। ইসলাম বলছে, শুধু পার্থিব অগ্রগতি ও সফলতা অর্জনই মানবজাতির সর্বশেষ উদ্দেশ্য নয়। চিরন্তন সুখ ও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভই তার পরম ও চরম লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যে একটি কল্যাণকর সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করার আকাঙক্ষী। কল্যাণকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও মানব জীবনের সেসব শাখার অন্যতম।

402470

ইসলাম আমাদেরকে যে অর্থনৈতিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন তা অত্যন্ত যুগোপযুগী এবং সময়োচিত। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামী অর্থব্যবস্থা, যাকাত ব্যবস্থা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সুদ ঘুষের প্রতি নিষেধাজ্ঞা, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বীমা ব্যবস্থা এছাড়াও অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যবস্থা। সবগুলোই হল আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির দিশা। অত্র শিরোনামের অর্থাৎ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাওয়ার কারনে সবগুলোর বিষয়ের উপর আলোচনা করা যাবে না। তবে আমাদের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার প্রায়াস পাব। বিষয়গুলো হলঃ

১. ইসলাম ও সমসাময়িক অর্থনীতি
২.সুদ
৩.দারিদ্র্য বিমোচন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদ

ইসলাম ও সমসাময়িক অর্থনীতি

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বহু সিস্টেমের উত্থান পতন ঘটেছে। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কোনটির অসফলতা ও ঘটেছে। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত আর্থ সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে সমস্ত মতবাদ চালু ছিল তা হল : নৈরাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, প্রকৃতিবাদ, সমাজবাদ, কমিউনবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং ইসলামী অর্থনৈতিক সিস্টেম উল্লেখযোগ্য। সকল অর্থব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই হল অর্থনৈতিক মুক্তি। দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে জনজীবনকে মুক্তি দেয়া,জনকল্যাণ করা।

পুঁজিবাদী মালিকানায় পুঁজিপতি সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বন্টনের একচ্ছত্র মালিকানা পুঁজিপতির হাতে থাকে। সমাজবাদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন ও বন্টনের মালিকানা সমাজের হাতে ন্যস্ত থাকে। তবে সমাজের পক্ষে সরকার মালিকানা স্বত্বভোগ করে থাকে।

প্লোটো তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ রিপাবলিক - এ অর্থনৈতিক দিক থেকে মানুষকে স্বাধীন ও দাস-এ দু শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তিনি সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে মানুষকে মানুষের মনিব হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দুর্বলের উপর সবলের ঘৃণা-বিদ্বেষ চরিতার্থ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাতে করে তিনি শ্রেণী সম্পর্কে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে শুধু সামাজিক ব্যবস্থাকে বরবাদ করেননি, জীবনোপায়ের ক্ষেত্রেও সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীগত বৈষম্য অনেকটা টিকিয়ে রেখেছেন।[১]

তবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা ছাড়া মানব রচিত এ সকল কুফরী মতবাদের কোনটিই মানুষকে সুখী করতে পারেনি। বরং মানুষের অর্থনৈতিক ন্যায্য অধিকারকে মারাত্মক ভাবে খর্ব করা হয়েছে। ইসলাম পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কোনটিই সমর্থন করে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থা যে সর্বাধিক গ্রহণীয় এবং জনকল্যাণ, মুক্তির অন্যতম পদ্ধতি তা যুক্তিসংগত উপস্থাপনের জন্য নিম্নোক্তভাবে ধারাবাহিক উপস্থাপন করা হল।

১.অর্থনীতির সংজ্ঞা
২.ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
৩.প্রচলিত বিভিন্ন অর্থব্যবস্থা এবংতাদের বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
৪অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে অর্থনীতিঃ
৫.ইসলামী অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ
৬.বাংলাদেশের বর্তমান অর্থব্যবস্থাঃ

১.ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : মাওলানা হিফজুর রহমান ;পৃঃ ২
অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আউয়াল : ইকাবা প্রকাশনা : ৯৪৩/১ দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

৭.সার্বজনীন ইসলামী অর্থব্যবস্থাঃ

১.অর্থনীতির সংজ্ঞাঃ

অর্থনীতি কি? এর পরিপূর্ণ এবং সার্বজনীন সংজ্ঞা অর্থনীতিবিদরা এখনো দিতে সক্ষম হননি। অথচ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বর্ণনা, আলোচনা, বিশ্লেষণ এর ইতিহাস দীর্ঘ দু শতাব্দীর উপর। বিভিন্ন মণীষী অর্থনীতিবিদ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। যেমনঃ

* অর্থনীতির জনক এ্যাডাম স্মিথ তার ওয়েলথ অব নেশন্স নামক গ্রন্থে অর্থনীতিকে ধনবিজ্ঞান (সায়েন্স অব ওয়েলথ) বলেই উল্লেখ করেণ।[২]

*জে.এস. মিল্স এর মতে, উৎপাদন ও বিতরণই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।[৩]

* আলফ্রেড মার্শালের মতে, কল্যাণের জড় উপাদন আহরণ ও ব্যবহার বিশ্লেষণই অর্থনীতি ।[৪]

* লিওনেল রবিনস্ সীমাহীন প্রয়োজন মেটানোর জন্যে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারপযোগী সীমিত সম্পদ প্রয়োগে মানুষের কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন ।[৫]

*ডেভেনপোর্ট মূল্যের দৃষ্টিকোন থেকে ঘটনার বিশ্লেষণকেই অর্থনীতির বিষয়বস্তু মনে করেন ।[৬]

* টাইভার সিটোভস্কি সীমিত সম্পদের ব্যবস্থপনাকেই অর্থনীতি বলেছেন।[৭]

*ক্যানন বস্তুগত কল্যাণের উপরই বেশি জোর দিয়েছেন।[৮]

*এ্যাডাম স্মিথ প্রবর্তিত ধনবিজ্ঞানের ধারণাকে বিদায় তসলিম জানিয়ে এ.সি. পিন্ড কল্যাণ বিজ্ঞানকে (সায়েন্স অব ওয়েলফেয়ার) অর্থনীতির বিষয়বস্তু গণ্য করে তারই উপর আলোচনা কেন্দ্রীভূত করেছেন।[৯]

*Adam Smith:বলেনঃ

বৃটেনের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ Adam Smith সর্বপ্রথম ১৭৭৬ সালে একটি পৃথক বিষয় হিসেবে অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্ধারণে সচেষ্ট হন। তিনি বলেনঃ

---

২. Adm Smith: An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nations.

৩. J.S. Mill :principles of political Economics

৪. Alfred Marshall: Principles Of Economics

৫.Lionel Robbins: An Essay on the Nature and Significance of Economics of Enterprise. p 25

৬.Davenport : Economics of Enterprise P : 25

৭.Tabor Scitorsky: Wealth and Welfare.

৮.Cannon : Elementary Political Economy Ch.1

৯.A.C. Pigou : Economics Welfare

Dhaka University Institutional Repository

Economics is a science which inquires into the nature and causes of the wealth of the nations

"অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতিগুলোর সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করে"। তার মতে অর্থনীতি সম্পদের বিজ্ঞান। কিন্তু এ সংজ্ঞাটি সীমিত ও অসম্পূর্ন । এখানে সম্পদের প্রকৃত ব্যাখ্যা নেই। আর সম্পদই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় বরং এটি মানব কল্যাণের একটি উপায় মাত্র।[১০]

*Alfred Marshall :

অপর বৃটিশ অর্থনীতিবিদ Alfred Marshall এর মতে Economics is the study of mankind in the ordinary business of life.[১১]

"অর্থনীতি হচ্ছে মানব জীবনের সাধারণ বিষয়সমূহের পর্যালোচনা।" এ সংজ্ঞানুযায়ী, একদিকে সম্পদ, অন্য দিকে মানুষ ও তার মঙ্গল অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় । এ সংজ্ঞাটি অর্থনীতির বিষয় বস্তুকে অত্যন্ত বিস্তৃত ও অনির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

তাই বলা যায়, বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতা ও নির্দিষ্টতা মার্শালের সংজ্ঞা ও নেই ।

**Lionel Robbins অভিমতঃ

ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লিওনেল রবিনসের মতে, Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses.

"অর্থনীতি হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান, যা মানুষের অভাব এবং বিকল্প ব্যাবহার যোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলী আলোচনা করে।"[১২]

রবিনসের এ সংজ্ঞায় সম্পদ বা কল্যাণ কোনটির উল্লেখ নেই । উল্লেখ রয়েছে মানুষের প্রয়োজন মেটানোতে কল্যাণ রয়েছে কিনা সে প্রসঙ্গ টানা হয়নি ।এ ছাড়া মানুষ নানা ধরণের প্রয়োজনই অনুভব করতে পারে ।

**A.C. Pigou:এর সংজ্ঞাঃ

অধ্যাপক A.C. Pigou এর মতে , Economics is the study of that part of social welfare that can be brought directly or indirectly into relation with the measuring rod of money .

১০.মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং -এর রূপরেখা, এমদাদিয়া বুক হাউজ ,ঢাকা ৩য় সং ১৯৯৯ পৃঃ ১৮৫ ।

১১.মাওলানা মুহাম্মদ আ রহীম ;ইসলামের অর্থনীতি , খায়রুণ প্রকাশনী, ঢাকা, ৪র্থ সং ১৯৮৭ পৃঃ ৩

১২.মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, প্রাগুক্ত:পৃঃ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

"অর্থনীতি সমাজ কল্যাণের সেই অংশের পর্যালোচনা যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়"।[১৩]

*অধ্যাপক Cairncross এর সংজ্ঞা:

অধ্যাপক Cairncross বলেনঃ

Economics is a social science studying how people attempt to accommodate scarcity to their wants and these attempts interact through exchange . "অর্থনীতি হল একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা কিভাবে মানুষ অপ্রাচুর্যের সাথে তাদের অভাবের সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা কিভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা আলোচনা করে।" [১৪]

**অধ্যাপক J.S. Mill :

অধ্যাপক J.S Mill এর মতে অর্থনীতি হচ্ছে সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনের ব্যাবহারিক শাস্ত্র । [১৫]

***অধ্যাপক Edwin Cannan ঃ

অধ্যাপক Edwin Cannan বলেন ঃ অর্থনীতি হচ্ছে বৈষয়িক কল্যাণের উপায় সংক্রান্ত আলোচনা।[১৬]

* Bober এর অভিমত ঃ

পাশ্চাত্য জগতে বর্তমানে সবচেয়ে গ্রহণীয় সংজ্ঞাটি দিয়েছেন Bober. তিনি বলেনঃ Economics briefly defined as the study of the administration of scarce resources and of determinants of employment and income.

"স্বল্প উপকরণসমূহের বিতরণ,কর্মসংস্থান ও আয়ের নির্ধারকসমূহের আলোচনাই হচ্ছে সংক্ষেপে অর্থনীতি।" [১৭]

২. ইসলামী অর্থনীতি ঃ

উপরে অর্থনীতির সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদদের মতামত তুলে ধরা হল।এখন ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের অভিমত প্রদান করা হলঃ

মানুষের জীবনে অভাব অসীম । প্রয়োজন ও আবশ্যকতাকে কেন্দ্র করেই তার জীবনের দিন-রাত চক্রাকারে ঘুরছে। অভাব মেটানোর জন্য

---

[১৩].আধুনিক অর্থনীতি : মোহাম্মদ লুৎফর হক ও প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান : পৃঃ ৬

[১৪]মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং -এর রূপরেখা, প্রাগুক্ত: পৃঃ ১৮৫

[১৫].আধুনিক অর্থনীতি:মোহাম্মদ লুৎফর হক ও প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান : পৃঃ ৬

[১৬]. আধুনিক অর্থনীতি : পৃঃ ১৩

[১৭].আধুনিক অর্থনীতি: প্রাগুক্ত : পৃঃ ৬

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টাও শ্রমের ফলে উৎপাদন এবং এই উৎপাদনের আয় দ্বারা প্রয়োজন মেটানো এটিই অর্থনীতির মূল কথা । মানুষের জীবন যাত্রা প্রবাহের এ অপরিহার্য প্রয়োজন এবং তা মিটানোর জন্য ইসলাম সম্মত উপায় ,পন্থা ও পদ্ধতিই হলো ইসলামী অর্থনীতি ।

প্রথম দিকের ইসলামী অর্থনীতিবিদরা এর কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না দিলেও ইউরোপীয়দের প্রতি উত্তর স্বরূপ বর্তমানে অনেকেই ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমনঃ

*ডঃ এম এ মন্নানের মতে ঃ-

Islamic Economics is a social science which studies the economic problems of the people in the light of Islam ."ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে একটি সমাজ বিজ্ঞান, যা ইসলামের আলোকে অর্থনীতির সমস্যাবলী আলোচনা করে।"[১৮]

** প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ খুরশীদ আহমদ তাঁর Islamic Economics গ্রন্থে লিখেছেনঃ

The first premise which we want to establish is that economics in an Islamic frame -work ,operates with its feet firmly rooted in the value pattern embodied in the Quran and Sunnah .[১৯]

"যে কথা আমরা প্রথমেই বলতে চাই,তা হচ্ছে,ইসলামী কাঠামোতে অর্থনীতি কুরআন-সুন্নাহর অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের গভীরে দৃঢ়ভাবে পদচারণা করে কাজ করে ।"

**ডঃ এস এম .হাসান উজ্জামানের অভিমতঃ

ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ এস.এম. হাসানউজ্জামান বলেন ঃ

Islamic Economics is the knowledge and application of injunction and rules of the shariah that prevents injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and society.

"ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও তা ব্যয়ের প্রক্রিয়ায় অবিচার, জুলুম রোধে আরোপিত ইসলামী শরীয়তের বিধি-নিষেধ সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং বাস্তব ক্ষেত্রে সেটির প্রয়োগ, যাতে করে মানুষ আল্লাহর এবং তার সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করতে পারে।"

---

[১৮].ড.এম.এ.মন্নান, ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ, (অনুবাদ ঃ আলী আহমাদ রুশদী) ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা,১৯৮৩,পৃঃ৩

[১৯] প্রফেসর খুরশীদ আহমদ : Islamic Economics.

Dhaka University Institutional Repository

** খ্যাত নামা অর্থনীতিবিদ ডঃ এম.আকরাম খানের মতে,

Islamic Economics is the study of human falah achieved by organizing the resources of earth on the basis of cooperation and participation.

"সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জাতিগত সম্পদ সংগঠিত করণের মাধ্যমে যে মানবীয় কল্যাণ অর্জন করা যায়, সে সম্পর্কিত জ্ঞানই ইসলামী অর্থনীতি।"[২০]

**অর্থনীতিবিদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী বলেনঃ

"সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রম বিবর্তনের গতিকে অব্যাহত রেখে মানব জীবনের বুনিয়াদী প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ করার ব্যবস্থা করা এবং সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ নিজ যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ ও পরিপূর্ণতা অর্জনের অবাধ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা অর্থনীতির কাজ।"[২১]

*এ.জেড.এম শামসুল আলম বলেন ঃ

"সৃষ্টিজীবের কল্যাণের জন্য সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন, সুষ্ঠতম বন্টন, ন্যায় সংগত ভোগ বিশ্লেষণই হলো অর্থনীতি বিজ্ঞান।"[২২]

*কেহ বলেন ঃ- সৃষ্টি তথা মানব কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত পার্থিব সম্পদকে একমাত্র তাঁরই সার্বভৌমত্ব বা তাঁরই আদেশ -নিষেধ অনুসারে উৎপাদন, বন্টণ, ব্যবহার ও উপভোগ করাকেই ইসলামী অর্থব্যবস্থা বলা হয়। ব্যাপক অর্থে যে অর্থব্যবস্থা অর্থনৈতিক তৎপরতা চালানোর বিভিন্ন পথ সকলের জন্য উন্মুক্ত, ব্যক্তি তার শ্রম, যোগ্যতা প্রকৌশল ও জ্ঞান সুষ্ঠভাবে প্রয়োগ করতে পারে, এরূপ আদর্শ ব্যবস্থাই হল ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা। মূলত ঃ ইসলাম ভিত্তিক যে অর্থ ব্যবস্থা তা-ই ইসলামী অর্থব্যবস্থা।

উপরের সংজ্ঞাগুলো থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে , ইসলামী অর্থনীতি একটি সমাজ বিজ্ঞান, যা সর্বদা মানব কল্যাণে নিয়োজিত - যেখানে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সুষ্ঠভাবে আলোচিত হয় এবং যা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবেই ইসলামী শরীয়তের বিধান ও মৌলিক ইসলামী মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

---

[২০].খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ড.এম আকরাম খান

[২১].অর্থনীতিবিদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী।

[২২].এ.জেড. এম.শামসুল আলম : ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, ই ফা বা.ঢাকা.২য় সং ২০০৩ পৃঃ ১৯

Dhaka University Institutional Repository

৩. প্রচলিত বিভিন্ন অর্থব্যবস্থাঃ

প্রচলিত বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ইসলামী অর্থব্যবস্থা, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা, কমিউনিজম, সামাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং অন্যান্য ধর্মের অর্থব্যবস্থা। এগুলো হল ঃ

৩.১ পুঁজিবাদীঅর্থব্যবস্থাঃ

পুঁজিবাদ শব্দটা সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভাবিত। এটা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রচলিত হয়। পুঁজিবাদ বলতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ভিত্তি করে উৎপাদন ও বাণিজ্যের বিশ্বব্যাপী সংগঠন প্রক্রিয়ার পরিচালনা বুঝায়। মানুষ তার পুর্ব সঞ্চিত সম্পদ বিনিয়োগ করে অথবা বেশীর ভাগ সময় সুদের ভিত্তিতে টাকা ধার করে নিজের ভাগ্য গড়তে চায়।

সবচেয়ে সংক্ষেপে পুঁজিকে অধিকতর সম্পদ উৎপাদনে ব্যবহৃত মুলধন বলা যেতে পারে। আর পুঁজিবাদ হচ্ছে এ পুঁজিবাদ পরিচালনা করার ব্যবস্থা[২৩]

*মার্কসের দৃষ্টিতে পুঁজিবাদ হলো এক বিশালযন্ত্র যার মাধ্যমে শ্রমিকের পরিশ্রমের সময়টা প্রথমে রূপান্তরিত হচ্ছে মুনাফায়। আর পরে মুনাফা রূপান্তরিত হচ্ছে মুলধন বা পুঁজিতে।[২৪]

* H.G Wells বলেন : যদিও আমরা কেউ পুঁজিবাদের সঠিক সংজ্ঞা জানিনা তবু পুঁজিবাদ বলতে আমরা সাধারণত কিছু কঠিন, ঐতিহাসিক শব্দ, অনিয়ন্ত্রিত অর্থোপার্জনের মানসিকতা এবং জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে হলেও বিকৃত সুযোগ সন্ধানকেই বুঝে থাকি।[২৫]

ব্যক্তিগত উদ্যোগই হচ্ছে পুঁজিবাদের প্রাণ। এ ব্যবস্থা উৎপাদন বা বাণিজ্যিক হাজারো পথের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার সুনিশ্চিত স্বাধীনতা দেয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনতা দেয়া এবং অর্থোপার্জন। অধিক অর্থোপার্জনের এ পুঁজিবাদী ধারণা প্রাক পুজিঁবাদী ব্যবস্থা, বিশেষ করে সামন্তবাদী হস্তশিল্প-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জীবিকা অর্জনের ধারণার সম্পুর্ণ বিপরীত। অধিক সম্পদ হস্তগত করার ধারণা থেকেই প্রতিযোগিতার জন্ম। সম্পদ আহরণের মধ্যে অন্তর্নিহিত এ স্বাভাবিক মানসিকতা অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে বাইরের কোন হস্তক্ষেপ সহ্য করতে চায় না।[২৬]

---

[২৩]. ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ; মুল শেখ মাহমুদ আহমদ : অনুবাদ ঃ গুলশান আবদুল হাই। ইফাবা প্রকাশনা : ৭৮২ : দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর -১৯৮০ পৃ; ৯

[২৪]. অর্থনীতিবিদদের যুগ: ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড : প্রকাশকাল :সেপ্টেম্বর ;১৯৮৪; প্রকাশক : আঃ হাফিজ ; বুকস এন্ড বুকস প্রাইভেট লিঃ ; ২৭ ,কলেজ ভিউ , মিরপুর রোড ; ঢাকা । পৃ ঃ ৯৭

[২৫]. ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ: ডঃ এম . এ মন্নান পৃঃ ২৯

[২৬]. ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ : প্রাগুক্ত পৃঃ ২৮

Dhaka University Institutional Repository

৩.১#১ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্য

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার কতগুলো মূলনীতি বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হলঃ

১)*পরিকল্পনার অনুপস্থিতঃ

পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অনুপস্থিতি অন্যতম। পুঁজিবাদী অসংখ্য বেসরকারী ব্যক্তির কর্মকান্ডের উপরই অর্থনীতি নির্ভর করে। এ সব কার্যকলাপ স্ব স্ব স্থানে নিয়ন্ত্রণমুক্ত; কিন্তু পরস্পর নির্ভরশীল। কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এসব কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং কি উৎপাদন করবে, কি পরিমান উৎপাদন করবে এবং কিভাবে উৎপাদন করবে, প্রতিযোগিতামূলক বাজার পদ্ধতি কিম্বা প্রাইস ম্যাকানিজমই এসব প্রশ্নের সমাধান দেবে বলে আশা করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা না থাকলেই অবাধ ব্যবসা নীতি প্রচলিত হবে এ কথা সব সময় ঠিক নয়।

২)*ব্যক্তির মালিকানাঃ

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যক্তির মালিকানার সীমাহীন অধিকার রয়েছে। ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় ঃ-

*নিত্য নৈমত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে পারে।
*অর্থোপার্জনের যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারে।
*ব্যয় করতে পারবে।
* শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে।
* ইচ্ছানুযায়ী মুনাফা লুটে নিতে পারে।
*শোষণ ও করতে পারে।

ব্যক্তি বা গোটা সমাজ মিলিত হয়ে কাকেও কোন প্রকার কাজ হতে বিরত রাখতে পারে না। সে অধিকার কারো নেই।

Every person is free to use his property in any manner he likes and he has not to submit to any dictation from any superior in this respect.[২৭]

৩)*পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতাঃ

পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা কে সবসময়ই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়। শ্রমিকদের নিজ নিজ পছন্দ মোতাবেক পেশা বেছে নেয়ার স্বাধীনতা থাকলে এবং সে অবস্থায় কোন বিশেষ শিল্পে বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন শ্রমিক অধিক হারে নিয়োগ করতে হলে অবশ্যই

---

[২৭] ইসলামের অর্থনীতি : মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম।
খায়রুন প্রকাশনী ১৩, কারকুন বড়ী লেন , চতুর্থ সংস্করণ : আগস্ট, ১৯৮৭ ; পৃঃ ১৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত মজুরী অপেক্ষা উচ্চহারে মজুরী দিতে হবে। সুতরাং পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা আর উপার্জনের সমতা একই থাকতে পারে না।

৪)*অবাধ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাঃ

পুজিঁবাদী অর্থনীতিতে অন্যতম মূলনীতি হল অবাধ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা।এটা কোন বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের মধ্যে নয়, একই শ্রেণীর ও একই দলের বিভিন্ন লোকদের মধ্যে তা বর্তমান রয়েছে। মূলত: তা বাঁচার লড়াই। Struggle for Existance নামক দর্শণ হতেই উদ্ভূত। পুজিঁবাদী অর্থব্যবস্থার মতে প্রতিযোগিতা অবাধ অর্থব্যবস্থায় কেবল সামঞ্জস্যেরই সৃষ্টি করে না, প্রচুর উৎপাদন ও তড়িতোৎপাদনেরই একমাত্র নিয়ামক । এগুলো মানুষকে বিশ্ব রহস্য উদঘাটন করে । অভিনব আবিষ্কার উদ্ভাবনীয় কাজে উদ্বুদ্ধ করে।[২৮]

৫)*স্বাধীন ব্যবসাঃ

স্বাধীন ব্যবসা পুজিঁবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য। উৎপাদনের উপকরণ সমূহের ব্যক্তি মালিকা না ব্যতীত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাহীন অর্থনীতিতে বেসরকারী উদ্যোগে কারবার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ অসম্ভব । যেখানে সরকার নাগরিকদের উৎপাদন কার্যক্রমকে সুসংহত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে না, সেখানে বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মাধ্যমেই উক্ত সমন্বয় গড়ে তোলা সম্ভব ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ব্যক্তি মালিকানা পুজিঁবাদী ব্যবস্থারই একটি অংশ। কারণ উৎপাদন , চাকরী কিংবা বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন এবং তা নিজের ইচ্ছামত হস্তান্তর করতে পারার মানেই স্বাধীনতা, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সম্পদ অন্যের কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে আনা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা আইন সঙ্গত।[২৯]

৬)*মালিক শ্রমিক পার্থক্যঃ

পুজিঁবাদী অর্থব্যবস্থায় মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। এ মৌলিক পার্থক্যের কারণে গোটা মানব সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল উৎপাদন উপায়ের একচ্ছত্র মালিক আর অপরদল হচ্ছে মেহনতি ও শ্রম বিক্রয়কারী জনতা । প্রথম শ্রেণীর লোক নিজেদের একক দায়িত্বে পন্যোৎপাদন করে ; তাতে মুনাফা হলে তা দ্বারা প্রত্যেকে নিজ নিজ সিন্ধুকেই ভর্তি করে ; লোকসান হলে একাই নীরবে বরদাস্ত করে । শ্রমিকদের উপর এর কোন প্রভাব প্রবর্তিত হয় না। এর

---

[২৮].ইসলামে অর্থনীতি : প্রাগুপ্ত পৃঃ১৩

[২৯].ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ : প্রাগুপ্ত পৃঃ ৩১

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিতে পুঁজিদারগণ নিজেদের অমানুষিক ও কঠোরতম কার্যকলাপকে ও ন্যায় সঙ্গত প্রমাণ করতে চেষ্টা করে।পুঁজিদারদের যুক্তি হল : মূলধন বিনিয়োগ, পন্যোৎপাদন ইত্যাদিকে সকল প্রকার ঝুঁকি ও দায়িত্ব যখন তারাই গ্রহণ করে, তখন মুনাফা হলে ও তা এককভাবে তাদেরই প্রাপ্য এবং শ্রমিকদিগকে শোষণ করার ও তাদের অবাধ সুযোগ থাকা বাঞ্চনীয়।

৭)*সুদ, জুয়া ও প্রতারণামূলক কাজ কারবার ঃ

পুঁজিবাদী অর্থনীতি সুদ, জুয়া ও প্রতারণামূলক কাজ কারবারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কেন প্রতিবন্ধকতা নেই । বিনা সুদে কাকে ও এক পয়সা দেয়া ও পুজিবাদীর দৃষ্টিতে চরম নির্বুদ্ধিতা । অভাব অনটন অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতি তোয়াক্কা করা হয় না। বরং যে কোন মুল্যে সুদ আদায় করা হবেই।

৩.২ কমিউনিজমবাদ /সমাজতন্ত্র

কমিউনিজমবাদ বা সমাজতন্ত্র এর সংজ্ঞাঃ

**পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরুপ যে অর্থব্যবস্থা মানব সমাজ আত্মপ্রকাশ করেছে তাই হচ্ছে কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র ।
পুজিঁবাদ সমাজের মজলুম -শোষিত মানুষকে বুঝানো হয়েছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানাই সকল প্রকার বিপর্যয়ের মুল কারণ । এর উচ্ছেদই সকল অশান্তি ও শোষণ নির্যাতনের চির অবসান ঘটবে।

**এনসাইক্লোপেডিয়ার বৃটেনিকার সংজ্ঞাঃ

সাম্যবাদী ব্যবস্থার লক্ষ্যে বর্তমান ব্যবস্থার তুলনায় অধিকতর সুষ্ঠ উৎপাদন ও বন্টণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে কোন কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষ জনগণের যথাযথ আনুগত্যের উপর ভিত্তিশীল যে পলিসি অবলম্বন করেন তাই সমাজতন্ত্র ।[৩০]

সমাজে যখন পুঁজিবাদের কুফল বইতে আরম্ভ করল তখন পুঁজিবাদকে ধবংস করে কিভাবে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা যায়, চিন্তাশীল মণীষীদের তাই হল প্রধান লক্ষ্যবস্তু । এ থেকে Socialism বা সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি । দেশের জাতীয় ধন-সম্পদ ও উৎপন্ন আয়ের সমীকরণই হল Socialism এর প্রধান লক্ষ্য।

৩০.ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ : প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

সোশালিজমের চরম পন্থাই হল কমিউনিজম । কমিউনিজম ও সাম্যবাদ তবে উগ্রবাদ । দেশের যাবতীয় ধনসম্পত্তি হতে ব্যক্তিগত অধিকার (Private ownership) তুলে দিয়ে সমবায় করণ (Collectivization) ই হল লক্ষ্য।[৩১]

বিখ্যাত জার্মান মণীষী কার্ল মার্কস ই কমিউনিজমের আদি প্রবর্তক।

বিশ্ববিশ্রুত রুশ জননায়ক লেনিনই রাশিয়াতে কমিউনিজমের প্রবর্তক।এর মৃত্যুর পর ষ্টালিন এর হাতে ও কমিউনিজম বিরাট শক্তি ও পরিপুষ্টি লাভ করেছে।[৩২]
বর্তমানে একমাত্র রাশিয়াতেই পুরোপুরি কমিউনিজম গৃহীত হয়েছে।

কমিউনিজম সম্পর্কে আমাদের একটু বাঁকা দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর নীতি ও নির্দেশকে মেনে চলি । কমিউনিজমের মূলমন্ত্র হল ব্যষ্টিকে সমষ্টির মধ্যে বিসর্জন দিয়ে সবার মাঝারে একজন হয়ে জীবনকে উপভোগ করা ।

কমিউনিজম আমাদিগকে আত্মকেন্দ্রিক না করে সমাজকেন্দ্রিক করতে চায়। আমাদের চিন্তা ও কর্মকে অন্তর্মুখী না করে বহির্মুখীন করতে চায়।[৩৩]

তবে তাদের এ নীতি আমাদের পারিবারিক তথা জাতীয় জীবনে অনেক খানি মেনে চলি। যেমন ধরি একটি পরিবার ; স্বামী স্ত্রী, দুটি ছেলে একটি মেয়ে একটি চাকর , একটি চাকরানী । বাপ এবং বড় ছেলে রোজগার করে ; ছোট ছেলে এবং একটি মেয়ে স্কুলে পড়ে। বড় ছেলেটি তার যাবতীয় উপার্জন এনে বাপের হাতে দেয়। বাপ কর্তা হয়ে সে পরিবারকে চালনা করে। প্রতিদিন এক পাতিলেই সবার রান্না হয়। তারপর যার যতটুকু প্রয়োজন বা যে যা খেতে চায়, তাকে তাই দেয়া হয়। যার যখন জামা কাপড় দরকার যার যখন চিকিৎসা দরকার সমস্তই সে সাধারণ ভান্ডার হতে যায়। কে কত টাকা রোজগার করে , কে কতটুকু কাজ করে সে হিসেব করে বন্টণ হয়না। প্রত্যেকের অভাবের প্রতিই সমান দৃষ্টি রাখা হয় ।

এখানে বলা যেতে পারে যে এ পরিবারেই যদি প্রত্যেকে রোজগার করে নিজের নিজের খোরপোষ এর ব্যবস্থা করে এবং উদ্বৃত্ত অর্থ গোপনে সঞ্চয় করতে আরম্ভ করে তবে আর সেখানে কমিউনিজম থাকে না। সেখানে আসে পুঁজিবাদের মনোবৃত্তি।

৩১.ইসলাম ও কমিউনিজম :গোলাম মোস্তফা পৃঃ ১৪
৩২.ইসলাম ও কমিউনিজম ; প্রাগুপ্ত পৃঃ ১৬
৩৩.ইসলাম ও কমিউনিজম : প্রাগুপ্ত পৃঃ ৪০

Dhaka University Institutional Repository

ঠিক এ প্রকারে সমস্ত দেশকে যদি একটা বিরাট পরিবার মনে করা যায়, এবং দেশবাসীর সকলেই যদি তাদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে কাজকর্ম করে নিজেদের উপার্জন একটি সাধারণ ভান্ডারে রেখে যখন যার প্রয়োজন, ততটুকুই লয়, তবেই সেখানে সত্যিকার কমিউনিজম আসে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ধন ও সম্পত্তির উপার্জন ও বণ্টণ ব্যবস্থার উপরেই কমিউনিজম নির্ভর করতেছে। অপরকে বঞ্চিত করে আত্মসুখের জন্যে দেশের জনসম্পদ নিজ হাতে মজুত করে ভোগ করতে গেলে হয় পুঁজিবাদ, আর সবার সঙ্গে তা ভোগ করতে গেলে হয় কমিউনিজম

৩.২#১ কমিউনিজমের বৈশিষ্ট্য ঃ

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলঃ

***রাষ্ট্রীয় মালিকানাঃ**

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় দেশের সকল সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানসমূহের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা বজায় থাকে। রাষ্ট্র তথা সরকারই হল সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক। দেশের উৎপাদন যন্ত্রে জনগণের রাষ্ট্রীয় নির্দেশে অংশগ্রহণ করে।

***সমাজতন্ত্র স্থাপনঃ**

সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র স্থাপনই কমিউনিজমের মূল উদ্দেশ্য।

***পুঁজিবাদের বিরোধীঃ**

কমিউনিজম পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী।

***ব্যক্তিগত মুনাফার অবকাশ নেইঃ**

সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিমালিকানার অস্তিত্ব নেই বলে ব্যক্তিগত মুনাফার ও অবকাশ নেই। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় বলে মুনাফার পরিবর্তে সামাজিক কল্যাণের দিকটি অধিক গুরুত্ব পায়।

***সামাজিক নিরাপত্তা ঃ**

সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র ব্যক্তির সকল মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে। এখানে মানুষের কাজ দ্বারাই সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় বলে অলস বা পরগাছা শ্রেণী থাকে না।

***শক্তির সাধনাঃ**

কমিউনিস্টরা শক্তির পূজারী। তাদের ধ্যান-ধারণা অপর সকলে সহজে গ্রহণ না করতে চাইলে শক্তি প্রয়োগ দ্বারা অথবা বিপ্লব ঘটায়ে তারা নিজেদের মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

Dhaka University Institutional Repository

*সম্পত্তির বন্টণ ব্যবস্থাঃ

কমিউনিজম ধন সম্পত্তি হতে ব্যক্তিগত অধিকার তুলে দিয়েছে এবং সমস্ত সম্পত্তিই স্টেটের এ নীতি গ্রহণ করেছে ।

* কমিউনিজাম নাস্তিক ঃ

কমিউনিজম ঈশ্বরহীন ধর্মহীন ও শ্রেণীহীন সমাজ এর লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে লেলিনের লিখিত Religion পুস্তকে গোড়তেই আছে

Atheism is a natural and inseparable part of Marxism can not be conceived without atheism.

(অর্থাৎ নাস্তিকতা মার্কসাবাদের স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য অঙ্গ। নাস্তিকতা ছাড়া মার্কসবাদ কিছুতেই বুঝা যেতে পারে না।[৩৪]

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে স্ট্যালিন-কনস্টিটিনশনের ১২৪ ধারায় লিখিত আছেঃ

Anti religious propaganda is free religions propaganda not free.

অর্থাৎ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করা বাঁধা নেই। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে করায় বাঁধা নেই ।[৩৫]

*কমিউনিজম ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থীঃ

কমিউনিজম মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারকে হরণ করেছে। মানুষকে করেছে একটি যন্ত্র বিশেষ। নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় মানুষ কিছুই করতে পারে না।সব সময় তার মনের উপর একটা নিয়মতন্ত্রের বোঝা চাপিয়েই আছে।প্রশান্ত অবসর বা সহজ মনের সহজ আনন্দ কোন দিনই সে পায় না । একটি কঠিন বন্ধনের অনুভূতি তার মনকে সব সময়েই পীড়া দেয়। ঈশ্বর ও দেব দেবীকে তুলিয়া দিলেও "স্টেট" এবং "ডিক্টেটরই" এখন কমিউনিস্টদের ঈশ্বর। লেলিনকে সত্য সত্যই তারা পূজা করে ।

কমিউনিজম চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট করিয়েছে। প্রত্যেক কমিউনিস্টকে সে একই ধরণের চিন্তা করায় ইংরেজীকে একে বলে Regimentation তা নিশ্চয়ই বুদ্ধির এবং চিন্তার বন্ধন , সন্দেহ নেই।[৩৬]

*শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থাঃ

সমাজতন্ত্রে পুঁজিপতি শ্রেণী থাকে না বলে শ্রমিক শোষণের কোন অবকাশ নেই।এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র সকল সম্পদের মালিক।প্রত্যেকেই এখানে সমান অধিকার ভোগের সুযোগ পায়। এ ব্যবস্থার মুল কথা হল- "ক্ষমতা অনুসারে কাজ ও কাজ অনুসারে মজুরি।"

---

৩৪ .ইসলাম ও কমিউনিজাম -প্রাগুপ্ত পৃঃ- ৮৪

৩৫ .ইসলাম ও কমিউনিজাম -প্রাগুপ্ত পৃঃ- ৯৫

৩৬ .ইসলাম ও কমিউনিজাম -প্রাগুপ্ত পৃঃ- ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

*অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঃ

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ থাকে। কি উৎপাদন করা হবে, কিভাবে উৎপাদন করা হবে, কি পরিমান উৎপাদন করা হবে তা জনগণের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষই নির্ধারণ করে থাকে।

৪.অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে অর্থনীতি ঃ

ইসলাম ছাড়া আরও অনেক ধর্মীয় গোষ্ঠী পৃথিবীতে বর্তমান আছে। যেমন ঃ খৃস্ট ধর্ম , ইহুদী ধর্ম, বৈদিক ধর্ম , জরথুস্ত্রীয় ধর্ম। এসব ধর্মের স্বতন্ত্র ইতিহাস রয়েছে। এসব ধর্মের অর্থনীতি সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলঃ

*খৃস্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেল:

খৃস্টীয় ধর্মগ্রন্থ চারটি বাইবেলের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলো লিখেছেন চারজন পাদরী। তাঁরা হলেন- ইনহান্না বা যোহনা, মাত্তা, মারকাস ও লোকা।[৩৭]

তাদের এ ধর্মগ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, এ ধর্মমত মানুষকে সন্ন্যাসব্রতের শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহর রাজ্যে বিত্তবানদের জন্য কোন অংশ স্বীকার করে না। তাতে বলা হয়েছেঃ

> তোমরা আল্লাহ ও সম্পদ উভয়ের সেবা করতে পারবে না এজন্য আমি তোমাদের বলছি, তোমরা নিজের প্রাণের চিন্তা কর না যে, আমি কি খাব , কি পান করব। নিজের শরীরের কথা ভেবনা কি দ্বারা তা আবৃত করব। প্রাণ কি খাবারের চাইতে এবং শরীর কি পোশাকের চাইতে উত্তম নয়? আকাশের পাখির দিকে তাকাও। তারা কিন্তু বুনে না,কাটে না এবং বাসায় জমা করে না।তারপরও তোমাদের আকাশের পিতা তাদের খাওয়ান। তোমরা কি এসবের চেয়ে মর্যাদাবান নও?[৩৮]

তিনি তাদের বললেন, সাবধান! সকল প্রকার লোভ-লালসা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখ। কেননা কারো জীবন তার অধিক সম্পদের জন্য বসে থাকে না। তিনি তাদের নিকট একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন।

কোন বিত্তবানের জমিতে প্রচুর ফসল হয়। সে মনে মনে বলতে থাকে, আমি কি করব , এসব ফসল রাখার মত আমার ঘরগুলো ভেঙ্গে বড় করে তৈরী করব। অতপর সেগুলোতে সব ফসল ভরে রাখব। নিজের আত্মাকে

৩৭.ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ;পৃঃ৩০৪

৩৮.বাইবেল , মাত্তা , ৬ষ্ঠ অধ্যায় , ২৪-২৬ আয়াত।

Dhaka University Institutional Repository

বলব , হে আত্মা ! তোমার নিকট অনেক বছরের জন্যে প্রচুর সম্পদ জমা আছে। আরাম কর ,খাও ,পান কর এবং আনন্দ কর ।

কিন্তু আল্লাহ্ তাকে বললেন , হে অজ্ঞ ! আজ রাতেই তোমার প্রাণ বের করে নেয়া হবে । সুতরাং তুমি যা তৈরী করছ , এসব অন্যের হবে । যে নিজের জন্যে জমা করে তার দৃষ্টান্ত অনুরূপ । সে আল্লাহর নিকট বিত্তবান নয়।

অতপর তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, এজন্যে আমি তোমাদের বলছি, নিজের জীবনের চিন্তা কর না যে, তুমি কি খাবে । শরীরের চিন্তা কর না , কি দ্বারা তা আবৃত করবে । কেননা খাবারের চেয়ে জীবন বড় এবং পোশাকের চেয়ে শরীর বড়।[৩৯]

আমি তোমাদেরকে সত্য করে বলছি, আকাশের রাজ্যে বিত্তবানদের প্রবেশ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। আমি আবার তোমাদের বলছি, বিত্তবানদের আল্লাহর রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে সুইয়ের চেয়ে ছিদ্র দিয়ে উট বেরিয়ে যাওয়াটা অনেক সহজ।[৪০]

তাদের ধর্মগ্রন্থে অর্থনীতির ব্যাপারে প্রেরণা ও উপদেশ ছাড়া আর কোন আইনগত ও বাস্তব কিছু বলা হয়নি । তবে খৃস্ট ধর্মে থেকে এটুকু জানা যায় যে , তারা পুঁজিবাদকে পছন্দ করেন না ।

***তাওরাত গ্রন্থ ঃ**

তাওরাত গ্রন্থে রাষ্ট্র সম্পর্কিত দুটি অধ্যায় আছে:

১. বাদশাহ্

২.বিচারকদের অধ্যায়;

এগুলোর পুরো কাহিনী হল

*শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা *বিজয় লাভ নতুবা রাজা - বাদশাহ্দের জাঁকজমক, ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রশংসা-কীর্তনে পরিপূর্ণ। এখানে অর্থনীতি ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন মূলনীতি বা বিধান এর উল্লেখ নেই।

*** বেদ গ্রন্থঃ**

বেদগ্রন্থের মূল ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত । এর নির্ভরযোগ্য অনুবাদ এবং মৌলিক ব্যাখ্যা গ্রন্থ হচ্ছে সত্যরথ প্রকাশ ও আদি ভাষ্য ভৌমিক।এখানে বিত্তবানদের জুলুম - নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিছু উপদেশ কিংবা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য আইন-কানুনের ধারা ও খুঁটিনাটি তেমন আলোচনা করা হয়নি।

উপরে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থের অর্থনীতির ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হল । আমরা দেখতে পেলাম যে, অর্থনীতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কোন ধর্মে দেওয়া হয়নি। নিম্নে ইসলাম ধর্মের অর্থনীতির নীতিমালা আলোচিত হল।

৩৯.লোকা, ১২শ অধ্যায়, ১৫-২১ আয়াত।

৪০.মাত্তা , ১৯তম অধ্যায় , ২৩-২৪আয়াত।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ইসলামী অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতিঃ

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল আত্মার কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি সাধন। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি সাধারন অর্থব্যবস্থার তুলনায় বিস্তৃত। সাধারণ অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি, পরিধি ও বিষয়বস্তু সব কিছুই ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোচ্য বিষয়। তার সাথে সাথে ইসলামী অর্থব্যবস্থা ধর্ম, নৈতিকতা, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ইত্যাকার মানবিক বিষয়গুলোকে তার প্রকৃতির মধ্যে ধারণ করে । নিম্নে ইসলামী অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি তুলে ধরা হল ঃ

**ইসলাম শুধু ধর্মই নয়, ইসলাম সমগ্র মানব জাতির একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান । ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত প্রক্রিয়ায় জাগতিক এবং পারলৌকিক সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে। বিভিন্ন জাগতিক কাজকর্ম যেমন- উৎপাদন, বিনিয়োগ,ভোগ,বন্টন,আয়-উপার্জন,ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়াদি ইসলামী পন্থায় সম্পাদন করা ইবাদতের সমতুল্য। সুতরাং মুসলমানদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এ সমুদয় বিষয়সমূহ ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিষয় বস্তুর আওতাভূক্ত। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে ব্যক্তি থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত যে পারস্পরিক সম্পর্ক, লেনদেন ও বিনিময় সংঘঠিত হয় তাও ইসলামী অর্থব্যবস্থার পরিধির মধ্যে পড়ে।

**অফুরন্ত অভাব মিটানোর জন্য সসীম উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্বাচনে ইসলামী অর্থব্যবস্থা ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারকে স্বীকার করে না । ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোন্ উপকরণটি অগ্রাধিকার পাবে তা ধর্মীয় বিধান বা নৈতিকতা দ্বারা নির্দিষ্ট । সাধারণ অর্থব্যবস্থায় যেখানে নিরপেক্ষ সেখানে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় নৈতিকতা একটি নিয়ামক হিসেবে কাজ করে । ফলে ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিষয়বস্তুর মধ্যে নৈতিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

** *জীবন উপকরণের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ইসলামী বিধি - বিধানের মধ্যে কাজ করে । ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় আয়-ব্যয় ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা কতকগুলো ইসলামী নীতিবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে হলে এ নীতি বোধ গুলো আলোচনার পরিধির মধ্যে পড়ে। তাছাড়া ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার পরিধি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সমাজ তথা সামাজিক কল্যাণ, পারস্পরিক সম্পর্ক, মানবতা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

***ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সুষম বন্টন ও মানব কল্যাণ কুরআন নির্ধারিত নীতির উপর নির্ভরশীল । যেমন : গাঁজা আফিম সাধারণ অর্থ ব্যবস্থায় দুটি মূল্যবান দ্রব্য হলেও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় এগুলো মূল্যহীন ।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ এগুলো মাদকাসক্তি সৃষ্টি করে যা কুরআন কর্তৃক নিন্দিত। অর্থোপার্জন ও অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত বিশ্লেষণ সাধারণ অর্থব্যবস্থার ন্যায় ইসলামী অর্থব্যবস্থার ও আলোচ্য বিষয় । তবে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় তা আল্লাহ রাসুলের নছায় হতে হবে ।

***ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মীয় দর্শন ক্রিয়াশীল । ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম স্তম্ভ হল যাকাত । যাকাত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বিষয়বস্তুর মধ্যমনি । কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের সিংহভাগ যাকাত নির্ভর । এজন্য যাকাতকে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রাণ বললেও অত্যুক্তি হবে না। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার পরিধির মধ্যে যাকাত ও সাদকা অবশ্যই অন্তর্ভুক্তি হতে হবে ।

***ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাকে যারা সংজ্ঞায়িত করেছেন তাদের কাছেও ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভাবে আলোচিত হয়েছে।

ডঃ মান্নানের মতেঃ- গণ মানুষের যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা যা ইসলামের আলোকে সমাধানযোগ্য তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোচ্য বিষয়।

ডঃ আকরাম খানের মতে - সবার অংশগ্রহনের মাধ্যমে জাতি গত সম্পদ সংগঠিত করণ ও মানব কল্যাণ সংক্রান্ত জ্ঞানর্জনই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার আলোচ্য বিষয়।[৪১]

খুরশীদ আহমদ মনে করেন -ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বিষয়বস্তু সেসব অর্থনৈতিক বিষয়বলী যা কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত মূল্যবোধের গভীরে নিহিত ।[৪২]

***বিগত সহস্রাধিক বছর ধরে ইসলামী পন্ডিতেরা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাকে মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । এদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) সরকারী আয় ও ব্যয় এবং কৃষি উন্নয়নের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইবনে খালদুন ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মানব কল্যাণ, শ্রম বিভাগ, মূলতত্ত্ব , জনসংখ্যা তত্ত্ব, সরকারী অর্থ ব্যবস্থা রাজস্বনীতি , বাণিজ্য চক্র ও বাজার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৪১.ড.আকরাম খান

৪২.বিখ্যাত অর্থনীতিবীদ খুরশীদ আহমদ

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল।

১)বায়তুলমাল ঃ

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বায়তুল মাল হল সরকারি কোষাগার। বিপদ-আপদের সময় সাহায্য ও বিভিন্ন সরকারি প্রয়োজনে অর্থ যোগানদানের জন্য শক্তিশালী বায়তুল মালের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। সারাদেশে সকল সরকারী বিভাগ পরিচালনায় বায়তুলমালের ভূমিকা অপরিসীম ও অনস্বীকার্য।

২)*সম্পদের মালিকানাঃ

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি হল যাবতীয় সম্পদের উপর মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি। যিনি মানুষ ও বিশ্বের যাবতীয় জিনিসের স্রষ্টা, তিনিই সম্পদের সৃষ্টা ও মালিক। মানুষ শুধু ভোগ, দখলও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। সুতরাং ব্যক্তির ইচ্ছামত সম্পদ ব্যয় ও কুক্ষিগত করার সুযোগ নেই।

৩)*ব্যক্তি মালিকানা ঃ

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা স্বীকৃত। উপার্জনের যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে যে অর্থ উপার্জন করবে ব্যক্তিগত হিসেবে উপার্জনকারী তার মালিক হবে। ইসলাম এটিই সমর্থন করে যাতে তার উপার্জন স্পৃহা বাড়তে থাকে।

৪)*উপার্জনের বৈধতাঃ

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় অবৈধ উপার্জনের কোন স্বীকৃত নেই। এ ব্যবস্থা একমাত্র বৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থকেই সম্পদ বলে স্বীকৃতি দেয়। এতে অবৈধ ও অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জনের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা অবৈধ উপায়ে একে অপরের ধন অধিকার করো না।[৪৩]

৫)*সঞ্চয়ের নিষেধাজ্ঞা ঃ

মূল্য বৃদ্ধি ও অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে অধিক সম্পদ গচ্ছিত রাখা এবং যাকাত আদায় না করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার প্রতি ইসলামের কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

---

৪৩. আলকুরআন সুরা নিসা - আয়াত ২৯

Dhaka University Institutional Repository

যারা স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রয়োজনের অধিক রাখবে তারা তার যাকাত আদায় করবে।

৬)*অর্থনৈতিক সাম্যঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে পূর্ণ অর্থনৈতিক সাম্য বাস্তবে সম্ভব নয় এবং রাষ্ট্র পরিচালনার পক্ষেও তা অনুকূল নয়। তাই ইসলাম ধন-সম্পদ বন্টনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ জমা না করে নিঃস্ব ও অভাবীদের মধ্যে তা বন্টন করে দিতে বাধ্য করেছে।

৭)অবৈধ উপার্জন ঃ**

নাপাক ও হারাম বস্তুর ব্যবসায়, ভিক্ষাবৃত্তি এবং জোর দখল ইত্যাদি অবৈধ অর্থ উপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৮)সুষম বন্টন ঃ**

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ধন-সম্পদের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা রয়েছে। ধন-সম্পদ যাতে একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত থাকতে না পারে, সে জন্য ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

৯)সুদ বিহীন ব্যাংক ব্যবস্থাঃ**

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা। ব্যাংক রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণে সুদ ছাড়া টাকা লেনদেন করবে। তাই ইসলাম সুদকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। হাদীস শরীফে আছেঃ

الراشى والمرتشى كلاهما فى النار

অর্থাৎ ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

১০)দরিদ্রের হকঃ**

সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা মহান আল্লাহই সকলের রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকেন।অথচ সম্পদ দান করেছেন কতিপয় বিশেষ ব্যক্তিকে। এতে বুঝা যায় যে, সম্পদ যার হাতেই থাকুক না কেন তাতে বঞ্চিতদের হক আছে। সুতরাং সম্পদের মালিক অপব্যয় করতে পারে না বা নিজে এসমস্ত সম্পদ ভোগ করতে পারে না। এতে আত্মীয় ও দারিদ্র্যের হক আছে।

১১)যাকাত ব্যবস্থা ঃ**

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ধনীদের সম্পদের উপর যাকাত ফরজ করা হয়েছে। যা বছরের মূল সম্পদের শতকরা ২.৫ ভাগ ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তা দরিদ্রের মাঝে বন্টন করা হবে। এ যাকাতের অর্থের মাধ্যমে গরীব, দুঃখী বেকার, অনাথ, পঙ্গু ও অসহায়দের জীবন ধারণের বিশেষ সহায়ক হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১২)মূল্য নিয়ন্ত্রণঃ

স্বাভাবিক অবস্থায় মূল্য নিয়ন্ত্রন ইসলাম পছন্দ করে না। কেননা মহানবী (সঃ) বলেন ঃ

মহান আল্লাহই একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী, সম্প্রসারণকারী ও রিযিকদাতা। কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতার অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে।

১৩)**শ্রমের মর্যাদা ঃ

ইসলাম শ্রমকেই ধন বলে মনে করে। কথিত আছে, হযরত মুসা (আঃ) এর স্ত্রীর মোহরাণা শ্রম দ্বারা আদায় করেছিলেন। মহানবী (সঃ) বলেছেন -"সবচেয়ে উত্তম উপার্জন হল শ্রমিকের উপার্জন।" অতএব, শ্রমিক ও মালিককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দান করেছেন। শ্রমিককে বলেছেন - মালিকের কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য এবং সকল মালিককে আদেশ করেছেন শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাবার পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দেয়ার জন্য।

১৪)*মিরাসী আদনঃ

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় নিজের প্রয়োজন পূরণ, খোদার রাস্তায় দান এবং যাকাত আদায় করার পর পুঞ্জীভূত সম্পদের ভিত্তি বিক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে শ্রেণীমত সম্পদ বন্টন করার আইন আছে।

১৫)*গনিমত সম্পদ ঃ

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ধর্মযুদ্ধে প্রাপ্ত বিজিত সম্পদের চার -পঞ্চমাংশ যোদ্ধাদের মধ্যে এবং এক পঞ্চমাংশ জাতীয় সমাজকল্যাণকর কাজে ব্যয় করার নির্দেশ রয়েছে।

১৬)*শরীয়তের অনুসরণঃ

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ অর্থ ব্যবস্থার সামগ্রিক তৎপরতা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত হবে। ইসলামী শরীয়ত সমর্থন করে না এমন কোন নীতি ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় নেই।

৬.বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। জনসংখ্যার দিক হইতে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক হইতে বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় খুবই কম এবং জনসাধারণের মানও অত্যন্ত নিচু। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪ এর জরীপ অনুযায়ী চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় : ৪৪৪ মার্কিন

Dhaka University Institutional Repository

ডলার (২৫,৯৪৪ টাকা)এবং মাথাপিছু জিডিপি ৪২১ মার্কিন ডলার (২৪,৫৯৮ টাকা)। বিশ্ব মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে অবস্থান (২০০৩) ১৩৯ তম এবং ২০০২ সালে ছিল ১৪৫ তম।[৪৪]

বাংলাদেশের দারিদ্র্য এবং চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে জীবনযাপন করে যথাক্রমে শতকরা ৪৯.৮০ শতাংশ এবং ৩৩.৩৭ শতাংশ।[৪৫]

বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির এক-তৃতীয়াংশ হইল বেকার এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ ভূমিহীন। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা করা হইল :

১) কৃষির উপর অধিক নির্ভরশীলতা ঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি ভিত্তিক। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের বা জিডিপি (মাথাপিছু জিডিপি ৪২১ মার্কিন ডলার বা ২৪,৫৯৮টাকা) এর শতকরা প্রায় ৪০ ভাগই কৃষি হইতে আসে। কৃষি, বনজ ও মৎস্য শিল্পে ৬২.৩%শ্রমিক নিয়োজিত।কৃষিতে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার (২০০৩-০৪):৫.৫২ শতাংশ ।
(সাময়িক) জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার (২০০২-০৩):৫.২৬ শতাংশ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪)। কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(২) স্বল্প মাথাপিছু আয় ও নিম্ন জীবনযাত্রার মান ঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল জনসাধারণের স্বল্প মাথাপিছু আয় ও নিম্ন জীবনযাত্রার মান। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র এবং তাহাদের মাথাপিছু আয় খুবই কম। বাংলাদেশের দারিদ্র্য এবং চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে জীবনযাপন করে যথাক্রমে শতকরা ৪৯.৮০ শতাংশ এবং ৩৩.৩৭ শতাংশ। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪ এর জরীপ অনুযায়ী চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় : ৪৪৪ মার্কিন ডলার (২৫,৯৪৪ টাকা)এবং মাথাপিছু জিডিপি ৪২১ মার্কিন ডলার (২৪,৫৯৮ টাকা)। বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম।

৩) শিল্প অনগ্রসরতাঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিল্পক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় শিল্প ও কলকারখানা গড়ে উঠে নি।ফলে বাংলাদেশে শিল্পক্ষেত্রে অনুন্নত রয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪ এর একটি জরিপ হলঃ জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান (২০০৩-২০০৪):

---

৪৪. বাংলাদেশ অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত:অর্থনৈতিক সমীক্ষা :২০০৪

৪৫. প্রাগুক্ত:

Dhaka University Institutional Repository

১৬.২৫শতাংশ(প্রাক্কালিত)। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প :১১.৪৭%। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প : ৪.৭৮%

জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার(২০০৩-২০০৪)৭.৪১%(প্রাক্কালিত) বিসিক এর শিল্প ইউনিটে কর্মসংস্থান (২০০৩-২০০৪) :৯৫,৯৫৭ জন।[৪৬]

৪)মূলধনের স্বল্পতাঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মূলধনের স্বল্পতা।বাংলাদেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় কম বলে লোকেরা সঞ্চয়ের ক্ষমতাও কম।ফলে বাংলাদেশের মূলধন গঠনের হার অত্যন্ত কম । পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না । এ কারণে উন্নয়নের অর্থ সংস্থানের জন্য বাংলাদেশকে বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

৫)প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার ঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার । বাংলাদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত মূলধন, দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে এ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়নি। ফলে বাংলাদেশে বহু প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

৬) শিক্ষার অভাব ঃ

বাংলাদেশে অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। ২০০৪ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে স্বাক্ষরতার হার ৬২.৬% (২০০২)। ২০০৩ ইংরেজী সালে স্বাক্ষরতার হার ৬৫%। শ্রমিকেরা উৎপাদনের আধুনিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ন অজ্ঞ । ফলে তাদের উৎপাদন ক্ষমতাও কম । দক্ষ জনশক্তি অভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন গতি ব্যহত হচ্ছে।

৭)বেকার সমস্যাঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব । বাংলাদেশে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং সে অনুসারে সম্পদ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় বেকার সমস্যা দিন দিন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।১৯৯০ সালের লোক গণনার তথ্যানুযায়ী ৫ কোটি ৭৪ লাখ জনশক্তির মধ্যে ১ কোটি ৩৮ লাখই অর্থাৎ মোট শ্রমশক্তির প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ছিল বেকার । বর্তমানে বেকার জনসংখ্যা ২ কোটির ও ওপরে । এসব বেকারত্বের পেছনে একক কোনো কারণকে দায়ী করা যায় না। বরং বেকার সমস্যার পেছনে বহুবিধ কারণ আছে। কৃষিক্ষেত্রে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাপক প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বিরাজ করতেছে।

---

[৪৬].বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা : ২০০৪ ইং

Dhaka University Institutional Repository

৮) খাদ্য-ঘাটতি ঃ

কৃষি- প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাংলাদেশে ব্যাপক খাদ্য-ঘাটতি রয়েছে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়:২৬৬.৯৫ লাখ মেট্রিক টন। নীট চাষ যোগ্য ভূমি এলাকা : ৮.৪০ মিলিয়ন হেক্টর (মোট ভূমির ৫৬.৫৭%)[৪৭]

৯) ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ঃ

বাংলাশের অর্থনীতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হল ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে উৎপাদন হ্রাস এবং অন্যদিকে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে দেশে এর ফলে জনসাধারণের জীবন যাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪ এর একটি প্রতিবেদন দেয়া হল ঃ মূল্যস্ফীতির হার (২০০৩-০৪) : ৫.৮৭ শতাংশ (নয় মাসে) ২০০২-০৩ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ছিল : ৪.৩৮ শতাংশ।

জাতীয় ভোক্তার মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি:[৪৮]

	১৯৯৬-৯৭	২০০১-০২	২০০২-০৩
সাধারণ (শতকরা পরিবর্তন)	১০৩.৯৬(৩.৯৬)	১৩০.২৬(২.৭৯)	১৩৫.৯৭(৪.৩৮)
খাদ্য (শতকরা পরিবর্তন)	১০৩.৬৭(৩.৬৭০	১৩২.৪৩(১.৬৩)	১৩৭.০১(৩.৪৬)
খাদ্য বাহির্ভূত(শতকরা পরিবর্তন)	১০৪.৪৭	১২৭.৮৯(৪.৬১)	১৩৫.১৩(৫.৬৬)

১০)অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ

বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। বাংলাদেশে সড়ক ও রেলপথ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আমাদের জলপথ ও বিমানপথও উন্নত নয়। সড়ক রেলপথ ও বিমানপথের একটি পরিসংখ্যান দেয়া হল ঃ সড়ক: বর্তমানে মোট সড়ক নেটওয়ার্ক (২০০৩)=২৪৪,২০৮কি.মি.* মোট সেতু=৪৬১৪টি
রেল পরিবহনঃ

রেল লাইনের দৈর্ঘ্য: ২৮৮০.০৭কিমি.
রেল ইঞ্জিনের সংখ্যা:(২০০৩-০৪)= ২৭৫ টি

৪৭.প্রাগুক্ত:

৪৮.বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা : ২০০৪ ইং

Dhaka University Institutional Repository

নৌপরিবহন ঃ বিআইডব্লিউটিসির জলযান : ২০২টি।
বিমান পরিবহন: আন্তর্জাতিক রুট : ২৬ টি
অভ্যন্তরীণ রুট :৮ টি,বিমান বহর মোট ১৭ টি।
যাত্রী পরিবহন (২০০২-০৩) ১৬৭০১০০জন। মালামাল পরিবহন (২০০২-০৩) ৪০,৮৪০ জন।[৪৯]
স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্যতম বাধা।

১১)বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীলতা ঃ

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি কৃষিপণ্যের রপ্তানির উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ বিদেশ হতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি , রাসায়ানিক দ্রব্য প্রভৃতি আমদানি করে। কিন্তু বাংলাদেশ রপ্তানি করে মুষ্টিমেয় কয়েকটি কৃষিপণ্য ; যেমন - পাট, চা, চামড়া, মাছ ইত্যাদি।রপ্তানির তুলনায় আমাদের পরিমাণ অনেক বেশি। এ কারণে বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্য সর্বদাই প্রতিকূল থাকে।

১২)প্রতিকূল সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্রতিকূল সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো এবং ধর্মীয় পরিবেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনুকূল নয়। পর্দা-প্রথা, বর্ণ প্রথা, যৌথ পরিবার প্রথা, বাল্যবিবাহ ও বহু-বিবাহ প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে।[৫০]

১৩)জনসংখ্যার চাপঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৫১]
বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা ২০০৪ : ১৩ কোটি ৫০ লাখ ২০ হাজার (প্রেক্ষিত)
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ১.৫% (আদম শুমারি২০০১=১.৪৮%) জনসংখ্যার ঘনত্ব: ৯১৬ জন প্রতি বর্গ কি.মি. । (আদম শুমারি ২০০১= ৮৩৪)[৫২]
বাংলাদেশে বর্তমানে এক ভয়াবহ জনসংখ্যা বিস্ফোরণের সম্মুখীন হচ্ছে।

৪৯.প্রাগুপ্ত:
৫০.বাংলাদেশের অর্থনীতি : মোহাম্মদ লুৎফুল হক ও প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান : পৃঃ ৫৪
৫১.বাংলাদেশের অর্থনীতি :প্রাগুপ্ত;পৃ ঃ ৫৪
৫২.বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা : ২০০৪ ইং

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং স্বল্প মাথাপিছু আয় ও নিম্ন জীবনযাত্রার মান, কৃষি উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা, শিল্প অনগ্রসরাতা, প্রাকৃতিক ও সম্পদের অসম্পূর্ণ ব্যবহার, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, খাদ্য ঘাটতি, দুর্বল অর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা, প্রতিকূল সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। বস্তুত একটি পশ্চাদপদ অর্থনীতির প্রায় সব লক্ষণগুলিই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান।[৫৩]

৭.তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং সার্বজনীন আদর্শ

বিশ্ব প্রতিনিয়তই তার স্বভাবসুলভ ঘূর্ণায়মানে আবর্তিত হচ্ছে। কালের পরিক্রমা যতই সামনে যাচ্ছে ততই শুধু চারদিকে একই রব মুক্তি চাই, মুক্তি চাই। কিসের মুক্তি? অর্থনৈতিক দূরবস্থা থেকে মুক্তি।পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্রবাদ তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ। সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া আজ বহু খন্ডে বিভক্ত। পুঁজিবাদীরা মুক্তির মন্ত্র নিয়ে এগুচ্ছে। কিন্তু তাদের আবদার নিস্ফল। সবক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক শোষণ আর নিপীড়ণ।

কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থা এর ব্যতিক্রম। খোদায়ী অর্থব্যবস্থা জনকল্যাণ, দারিদ্র্য বিমোচন, আর মানবতার মুক্তির জন্য কাছ করছে।ফর্মূলা দিয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তির। উপরে পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিকদের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। সাথে ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে।এ থেকেই আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামী অর্থব্যবস্থা সার্বজনীন।বিষয়টি আর স্পষ্টতার জন্য নিম্নে তুলনামূলক একটি বিশ্লেষণ দেয়া হলঃ

৭.১**ব্যক্তিমালিকানাঃ

➤পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থাঃ

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার মূল হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিস্বার্থ। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যক্তির মালিকানার সীমাহীন অধিকার রয়েছে। ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় ঃ-

*নিত্য নৈমত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে পারে।

*অর্থোপার্জনের যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারে ।

*ব্যয় করতে পারবে।

৫৩.বাংলাদেশের অর্থনীতি :প্রাগুক্ত;পৃঃ ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

* শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে।
* ইচ্ছানুযায়ী মুনাফা লুটে নিতে পারে।
*শোষন ও করতে পারে।

ব্যক্তি বা গোটা সমাজ মিলিত হয়ে কাকেও কোন প্রকার কাজ হতে বিরত রাখতে পারে না। সে অধিকার কারো নেই।

"Every person is free to use his property in any manner he likes and he has not to submit to any dictation from any superior in this respect."[৫৪]

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাঃ

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত নয়। সেখানে আছে রাষ্ট্রীয় মালিকানা। রাষ্ট্রই সব কিছু বহন করবে।সমাজতন্ত্র মানুষের স্বাধীনতা অপহরণ ও মত প্রকাশের অধিকার স্তব্ধ করে আয়ের সমতা বিধানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ফ্যাসিবাদে ও রাষ্ট্রীয় মহাশক্তির কাছে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে হয়; ব্যক্তি মালিকানা থাকা সত্তেও রাষ্ট্রীয় কর , সুদ ও খাজনার চাপে সাধারণ মানুষের জীবন সেখানে হয়ে পড়ে দুর্বিসহ।

ইসলামী অর্থব্যবস্থাঃ

ব্যক্তিগত মালিকানা ধনতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি। এতে ব্যক্তির শ্রম প্রতিভা এবং বুদ্ধি অনুপাতে উপার্জনের এবং ভোগের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে । কিন্তু যদি রাষ্ট্রশক্তি ব্যক্তিগত মালিকনার নিরাপত্তা প্রদান না করে , ধনতন্ত্র অচল হয়ে পড়বে। আর ব্যক্তি যদি সমাজ-স্বীকৃত ন্যায্য পথে উপার্জিত সম্পদ নির্বিঘ্নে ভোগের অধিকার না পায়, তবে ব্যক্তিগত উপার্জনের প্রতি তার কোন আগ্রহ থাকবে না । অথচ ব্যক্তিগত মালিকানার এই নিরাপত্তা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অংশ নয়।অর্থনীতি বহির্ভূত রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থারই অংশ।[৫৫] তাই ইসলামে বিধান হচ্ছে, পৃথিবীর সব কিছুর অবিমিশ্র মালিক আল্লাহ তায়ালা।

কাজেই পৃথিবী জমি, পানি ও বিভিন্ন সম্পদের মালিকানা কোন ব্যক্তি বিশেষের হাতে হতে পারে না । সকল মানুষ সামগ্রিক ভাবে এসবের ট্রাষ্টীমাত্র । এ ট্রাষ্টীশীপের শর্ত হচ্ছে যে, আল্লাহর এ সম্পদ থেকে মানুষ সমান অভাবে উপকৃত হবে। কেউ ধনী থাকবে আর কেউ নিরন্ন থাকবে কিম্বা এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে শোষণ করবে ইসলাম তা বরদাস্ত করে না। কাজেই ইসলামে ব্যক্তিগত সম্পদ বৈধ হলেও তা সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যয়িত হতে হবে।

---

৫৪ .ইসলামে অর্থনীতি : মুহাম্মদ আবদুর রহিম ।পৃঃ১৩

৫৫ .ইসলামী অর্থনীতির রূপ রেখা ঃ এ. জেড. এম. শামসুল আলম : পৃঃ ২১

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী ভাবে সম্পদ আহরণে ইসলাম উৎসাহ দেয় ঠিক কিন্তু তা সমগ্র সমাজের হিতার্থে হতে হবে। অর্থাৎ ইসলাম একদিকে ব্যক্তিকে তাঁর ব্যক্তিগত মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দিচ্ছে, অন্যদিকে ব্যক্তিকে সমাজের একটি অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং তার উপর সমাজের অন্যান্যদের সুখ ও সমৃদ্ধি সাধনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।
মালিকানার ব্যাপারে ইসলামের বিধি-নিষেধসমূহ নিম্নরূপঃ

১)সামাজিক অসুবিধার সৃষ্টি না করে সম্পদের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।
২)যাকাত প্রদান করা ;
৩)আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা ;
৪)সুদ থেকে বিরত থাকা ;
৫)ব্যবসা-বাণিজ্য অসদুপায় অবলম্বন না করা এবং
৬)একচেটিয়া কারবার ও মজুদদারী থেকে দূরে থাকা।

কমিউনিজমে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয় ; ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায় ও উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রেক্ষিতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বলতে কিছু থাকে না। এমতাবস্থায় ইসলামই অবাধ অর্থনীতি ও কেন্দ্রীয় নির্দেশাধীন অর্থনীতির মাঝামাঝি একটা বাস্তব ও মানবিক ব্যবস্থা দিচ্ছে যেখানে কেন্দ্রীয় গতি নির্দেশিকাও রয়েছে আবার ব্যক্তি মালিকানার উৎসাহ ও বিদ্যমান।[৫৬]

*৭.২ সম্পদ গচ্ছিতকরণঃ**

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাঃ

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সম্পদ গচ্ছিতকরণ নীতি প্রতিফলিত। ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা এবং মওজুদকৃত সম্পদ অধিক সম্পদ অর্জনের জন্য বিনিয়োগ করাই হচ্ছে পুঁজিবাদীর মূল শিকড়।

ইসলামী ব্যবস্থাঃ

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ কুক্ষিগত করার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী আরোপ করা হয়েছে। ইসলামের নির্দেশ হল ; বৈধ পন্থায় উপার্জিত ধনসম্পদ যেন মওজুদ করে না রাখা হয় ; কেননা মওজুদদারী কার্যক্রম দ্বারা সম্পদের ক্রমবিবর্তনের গতি বাধা প্রাপ্ত হয় এবং সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় থাকে না সম্পদ কুক্ষিগত করে আবদ্ধ করে রাখা তথা মওজুদদার কেবল নিজেই দুশ্চরিত্রের দুরারোগ্যের মধ্যে নিপতিত হয় না। বরং সে সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে একটি কঠোরতম অপরাধ জনিত কাজে

---

[৫৬].ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ : প্রাগুপ্ত পৃঃ ৫২

Dhaka University Institutional Repository

নির্লিপ্ত থাকে। আর শেষ পর্যন্ত এর প্রতিফল স্বয়ং তার নিজের জন্যও দুষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।[৫৭]

এ কারণে আল কুরআনে কৃপণতা ও কারুণীবাদের কঠোর বিরোধীতা করে থাকে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله هو خيرا لهم- بل هو شر لهم

"যারা আল্লাহ প্রদত্ত ফজল ও নেয়ামতের বেলায় কৃপণতা প্রদর্শন করে তারা যেন এটা ধারনা না করে যে এ কাজ তাদের জন্যে খুবই ভাল কাজ। বরং আসলে এ কাজ তাদের জন্য খুবই খারাপ কাজ।"[৫৮]

অন্যত্র মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل ويكتمون

ما اتهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا

"যারা সম্পদ পুঁজি করে এবং অপরকে সম্পদ পুঁজি করতে উৎসাহ দেয় এবং আল্লাহ অনুগ্রহ বশত যা দান করেছেন, তা গোপন করে আমি (সেই সব) কাফিরদের জন্য গ্লানিকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।"[৫৯]

এ আয়াতটি কৃপণ ও পুঁজি সৃষ্টিকারীদের কাফির বলে গণ্য করা হয়েছে।কুফুরের চেয়ে অধিকতর পাপ ইসলামে নেই। যারা আল্লাহর দেয়া সম্পদে আল্লাহর বান্দার অধিকারকে অস্বীকার করেছে তাদের অপরাধ কাফিরদের থেকে কম নয়।সম্পদ পুঁজি করা এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে তা থেকে বঞ্চিত করা কুফর।ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কুফরকে প্রশ্রয় দেয়া হয় না।
আল-কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم

- يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما

كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون-

যারা স্বর্ণরৌপ্য অর্থাৎ বিত্তসম্পদ জমা করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দান করো। যে দিন

৫৭.পুঁজিবাদ বনাম ইসলাম : মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী : আধুনিক প্রকাশনী। পৃঃ৭

৫৮. আল-কুরআন: সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত নং ১৮০

৫৯.আল-কুরআন: সুরা নিসা :আয়াত নং ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

দোযখের অগ্নিতে ঐ সমস্ত উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ এবং পৃষ্ঠ দাগানো হবে,সেদিন তাদেরকে বলা হবে, এসমস্তই তোমরা জমা করেছিলে এবং এখন তার স্বাদ গ্রহন করো।[৬০]

সম্পদ পুঁজিকরণ সম্পর্কে হযরত আবু যর থেকে রাসুল (সঃ) এর হাদীস বর্ণিত আছে।

হযরত আবু যর বলেন , রাসুল (সঃ) বলেছেন ,"কাবার প্রভুর শপথ করে বলছি , তারা ক্ষতিগ্রস্ত । আবুযর জিজ্ঞেস করলেন , কারা ক্ষতিগ্রস্ত? রাসুল (সঃ) বললেন , যারা সম্পদ বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর পথে খরচ করে না।"[৬১]

আল কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ

ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله هوخيرا لهم بل هو شرلهم

سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة ولله ميراث السموات والارض والله بما

تعملون خبير

"যাদেরকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন তাদের মধ্যে যারা অর্থ পুঁজি করে , তারা যেন মনে না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে , বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণই টেনে আনবে । তারা যা সঞ্চয় করেছে , তা শেষ বিচারের দিন তাদের গ্রীবার বন্ধন স্বরূপ হবে।"[৬২]

আল্লাহ অন্যত্র বলেনঃ

هانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما

يبخل عن نفسه والله الغنى وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم

ثم لا يكونوا امثالكم۔

"দেখ, তোমাদেরকে বলা হয়েছে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে , অথচ তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে,যারা পুঁজি করে। যে পুঁজি করে সে নিজের আত্মার ক্ষতিসাধন করে । আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা দরিদ্র।যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তা হতে বিমুখ হও , তবে আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন,তারা তোমাদের মতো হবে না।"[৬৩]

৬০.আল কুরআন; সুরা তওবা :আয়াত নং ৩৪-৩৫

৬১.বোখারী ও মুসলিম

৬২.আল-কুরআন: সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত নং ১৮০

৬৩.আল-কুরআন: সুরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত নং ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

রাসুল (সঃ) এর বহু হাদীস হতে এটা সুস্পষ্ট যে, ধন পুঁজিকরণ ইসলামে নিষিদ্ধ। ইমাম আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেনঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا

আল্লাহর নবী কখনে আগামী দিনের জন্য কিছু জমা করে রাখতেন না।[৬৪]

বিবি আয়শা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ

ان رسول الله عليه و سلم قال الدنيا لادار له

و مال من لامال له ولها يجمع من لا عقل له -

"যার ঘর নেই এ দুনিয়ায় সে বাসস্থান পাবে, যার সম্পদ নেই, সে সম্পদ পাবে, কিন্তু যার কোনো বিবেক নেই - সে সম্পদ পুঁজি করবে।"[৬৫]

৭.৩ ব্যয় করার নির্দেশ

বিশ্ব নিয়ন্তা মহান আল্লাহ তায়ালা সম্পদ অর্জনের কথা যেমন বলেছেন তেমনি ব্যয় করার ও নির্দেশ দিয়েছেন।

* পুঁজিবাদীদের মতামতঃ

পুঁজিবাদীরা বলে থাকেন যে, ধন সম্পদ ব্যয় করলে গরীব ও নিঃস্ব হয়ে পড়বো এবং উহা কুক্ষিগত করে রাখলে বিত্তশালী হতে পারবো।

*তারা আরো বলেন : যে যা কিছু ব্যয় করে তা হাত ছাড়া হয়ে যায়।

* ধন সম্পদ কুক্ষিগত করে তা সুদের ভিত্তিতে খাটানো হলে তা দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

*পুঁজিবাদীদের কাছে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির অর্থ হচ্ছে আপনি সর্ব প্রথম পারস্পরিক সাহায্য সমিতিতে টাকা দিয়ে সদস্য ভুক্ত হোন। অতঃপর আপনার যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তবে সমিতি আপনাকে বাজারে প্রচলিত সুদের হারের তুলনায় কিছুটা কম হারে ঋণদান করবে।

আর যদি আপনার নিকট পয়সা না থাকে তবে তা আর আপনি পারস্পরিক সাহায্য সমিতি হতে কিছুমাত্র সাহায্য লাভ করতে পারছে না।[৬৬]

*পুঁজিবাদীরা যদিওবা কিছু সমাজ কল্যাণ খাতে ব্যয় করে তা মনের অনিচ্ছায় করে। খারাপ হতে খারাপতম জিনিস দিয়ে থাকে থাকে। আবার

---

৬৪. তিরমিজি শরীফ

৬৫. আহমদ, বায়হাকী

৬৬. পুঁজিবাদ বনাম ইসলাম :মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী : আধুনিক প্রকাশনী। পৃঃ১৩

Dhaka University Institutional Repository

যাকে দান করে তার মনপ্রাণকে মুখের কর্কশবাক্য দ্বারা ব্যথিত ও মর্মাহত করে তুলে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাঃ

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার নিয়ম হল যাবতীয় ব্যয় তা রাষ্ট্রই করবে এক্ষেত্রে জনগণের কোন অধিকার থাকবে না।

****ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাঃ****

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার পরিবর্তে সর্বদা ব্যয় করার জন্যই নির্দেশ দিয়ে থাকে। তার এ নির্দেশের উদ্দেশ্যে এ নয় যে মানুষ আরাম আয়েশ বিলাসিতা ও অপচয়ের খাতে অকাতরে সম্পদ লুটিয়ে দিবে। বরং সে ব্যয় করার নির্দেশটি ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর পথে) খাতে ব্যয় করার শর্ত আরোপ করে দিয়েছে। অর্থাৎ আপনার প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ সমাজের কল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় করুণ। এটাই হচ্ছে ফি সাবিলিল্লাহর অর্থ। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

ويسئلونك ماذا ينفقون - قل العفو،

"আর তারা আপনার নিকট জিজ্ঞেস করে থাকে যে তারা কি পরিমাণ ব্যয় করবে ? আপনি বলে দিন যে, প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করুন।"[৬৭]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتمى والمسكين

والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب

আর সদাচার মূলক ব্যবহার ও বদান্যতা মূলক আচরণ প্রদর্শন করো নিজ পিতামাতা ও আপন আত্মীয়দের সাথে। আর করো এতীম, মিসকীন, নিকটতম প্রতিবেশী, অপরিচিত দূরতম প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মোসাফির ও নিজেদের দাসদাসীদের সাথে।[৬৮]

তিনি আরো বলেনঃ وفى اموالهم حق للسائل والمحروم

আর তাদের ধন-সম্পদে ভিক্ষুক ও দীনহীনদের ও অধিকার রয়েছে।[৬৯]

ইসলামের মতে সম্পদ ব্যয় করণ দ্বারা বরকত হয়ে থাকে এবং সম্পদ ঘেটে যাওয়া বা কমে যাওয়ার পরিবর্তে তার দ্বারা অধিক মাত্রায় প্রাচুর্য দেখা দেয়। যেমন কালামে পাকে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিচ্ছেনঃ

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء - والله

يعدكم مغفرة منه و فضلا

---

৬৭. আল-কুরআন: সুরা বাক্বারাহ ঃ আয়াত নং ২১৯

৬৮. আল-কুরআন: সুরা আন-নিসা ঃ আয়াত নং ৩৬

৬৯. আল-কুরআন: সুরা আয-যারীয়াত ঃ আয়াত নং ১৯

Dhaka University Institutional Repository

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রতার ভয় দেখিয়ে থাকে এবং কৃপণতা করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের কাছে ক্ষমা ও অধিক দান করার ওয়াদা প্রদান করে থাকেন।[৭০]

পুঁজিবাদীদের ব্যয় করলে হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার মতামত প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান হল ঃ সম্পদ কখনোই হাতচ্যুত হয়ে যায় না, বরং তা হল উত্তম উপকারিতা আবার তোমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لاتظلمون

"তোমরা সদাচার মূলক কাজে যা কিছু ব্যয় করবে, তা সম্পূর্ণ রূপে তোমরা ফেরত পাবে। এ ব্যাপারে আদৌ জুলুমের আশ্রয় নেয়া হবে না।"[৭১]
তিনি আরো বলেনঃ

وانفقوا مما رزقنهم سرا وعلانية يرجون تجارة

لن تبور - ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله

"যারা আমার দেয়া রিজিক হতে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে থাকে, তারা এমন ব্যবসার আশা পোষণ করে থাকে যে ব্যবসায় ঘাটতি ও লোকসানের আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। তার বিনিময় আল্লাহ তা'য়ালা তাদের পূর্ণরূপে প্রতিফল দান করবেন। শুধু তাই নয় বরং নিজ ফজল ও ভান্ডার হতে আরো অধিক প্রাচুর্য দান করবেন।[৭২]
তিনি আরো বলেনঃ يمحق الله الربوا ويربى الصدقت

"আল্লাহ সুদের সম্পদকে মিটিয়ে ফেলেন আর দান সদকার দ্বারা সম্পদ বাড়িয়ে তোলেন।"[৭৩]
অন্যত্র তিনি বলেনঃ

وما اتيتم من ربا ليربوا الناس فلا يربوا عند الله وما

اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون

"মানুষের ধন সম্পদ বৃদ্ধির জন্য তোমরা যে সুদ প্রদান করো, তা দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা নিকট কখনোই সম্পদ বৃদ্ধি পায় না। আর আল্লাহ

---

[৭০]. আল-কুরআন: সুরা আল বাক্বারাহ ঃ আয়াত নং ২৬৮
[৭১]. আল-কুরআন: সুরা আল-বাক্বারাহঃ আয়াত নং ২৭২
[৭২]. আল-কুরআন: সুরা ফাতের ঃ আয়াত নং ২৯-৩০
[৭৩]. আল-কুরআন: সুরা আল বাক্বারাহ ঃ আয়াত নং ২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

তা'য়ালার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তোমরা যে যাকাত প্রদান করে থাকো তা দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি হয়।"[৭৪]

পুঁজিবাদীদের কাছে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির অর্থ হচ্ছে আপনি সর্বপ্রথম পারস্পরিক সাহায্য সমিতিতে টাকা দিয়ে সদস্য ভুক্ত হোন। অতঃপর আপনার যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তবে সমিতি আপনাকে বাজারে প্রচলিত সুদের হারের তুলনায় কিছুটা কম হারে ঋণদান করবে।

পক্ষান্তরে ইসলামী আদর্শে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির ধ্যান ধারণা হচ্ছে যে, যারা ধনবান ও বিত্তবান হবেন তারা প্রয়োজনের সময় কম ক্ষমতা সম্পন্ন ও অভাবীদেরকে কেবল ঋণই দান করেনা, বরং ঋণ আদায় করে নেয়ার বেলায়ও তারা তাদরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবে। সুতরাং যাকাতের ব্যয়ের খাতের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, সেখানে ঋণ গ্রহীতার ঋণ মুক্ত করার জন্যএকটি খাত নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।[৭৫]

পুঁজিবাদীদের সমাজ কল্যাণ খাতে ব্যয় করার দৃষ্টিভঙ্গির জবাবে ইসলামের অবস্থান হল ঃ

ইসলাম সর্বোত্তম সম্পদ ব্যয় করার জন্য এবং দান করে তা বলে বেড়াতে নিষেধ করার শিক্ষা দেয়। এমন কি কোন লোক দাতার সম্মুখে দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক, এমন মনোভাব পোষণকেও ঘৃণা করে থাকে।

মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

انفقوا من طيبت ما كسبتم و مما اخرجنا لكم من

الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

"তোমরা যা কিছু কামাই রোজগার করেছো এবং আমি যা কিছু তোমাদের জন্য ভূগর্ভ হতে বাহির করে দিয়েছি তা থেকে সর্বোত্তম মাল আল্লাহর রাহে খরচ করো। তা থেকে খারাপ মাল বাছিয়া তা দান করো না।"[৭৬]

তিনি আর ও বলেনঃ

لاتبطلوا صدقتكم بالمن والاذى

"নিজেদের অনুদানকে বলে বেড়ায়ে এবং কষ্ট দিয়ে নষ্ট করে ফেলো না।"[৭৭]

৭৪.আল-কুরআন: সুরা আর-রূম ঃ আয়াত নং ৩৯

৭৫.পুঁজিবাদ বনাম ইসলাম :মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী : আধুনিকপ্রকাশনী। পৃঃ১৩

৭৬.আল-কুরআন: সুরা আল বাক্বারাহ ঃ আয়াত নং ২৬৭

৭৭.আল-কুরআন: সুরা আল বাক্বারাহ ঃ আয়াত নং ২৬৪

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র বলেনঃ

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و اسيرا-

انما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء و لاشكورا

"আর তারা আল্লাহর মহব্বতে এতীম , মিসকীন ও কয়েদীগণকে খানা দান করে থাকে এবং বলে যে , আমরা আল্লাহর জন্যই তোমাদেরকে খানা খাইয়ে থাকি। আমরা তোমাদের থেকে প্রতিদান, শুকরিয়া জ্ঞাপন ইত্যাদি কোন কিছুরই প্রত্যাশা করি না।"[৭৮]

৭.৪ নৈতিক মূল্যোবোধ ও অর্থনৈতিক কল্যাণঃ

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাঃ

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজে মায়া-মমতা এবং সহানুভূতির কোন স্থান নেই। নৈতিক মূল্যোবোধ তথা অর্থনৈতিক কল্যাণের কোন চিন্তা নেই। তারা তাদের অর্থনৈতিক মুক্তিকেই বেশী প্রধান্য দিয়ে থাকে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থাঃ

ইসলামী অর্থব্যবস্থা নৈতিক মূল্যোবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। সামগ্রীক কল্যাণ সাধনের জন্যে সামগ্রীক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। মানব কল্যাণের জন্যই যে ইসলামী অর্থব্যবস্থা তা নিম্নোক্ত আল কুরআন ও আল হাদীসের দৃষ্টি ভঙ্গির আলোকেই উপলব্ধি কতে পারি।

"ইসলাম বৈরাগ্যের ধর্ম নয়।"[৭৯]

আলকুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

" কিন্তু সন্ন্যাসবাদ এটাতো তারা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে, আমি তাদেরকে এর বিধান দেইনি।"[৮০]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

"ইসলাম মুসলমানদের দুনিয়ায় আল্লাহর দেয়া নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করতে চায় না।"[৮১]

জীবন সম্পর্কে ইসলামের এ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মানুষকে জন্ম-পাপী হিসেবে বিবেচনা করা হয়া না বা কোন আজন্ম পাপের জন্যে সে চিরকাল ধীকৃত হয় না ।

"মানুষ দুনিয়ায় আল্লাহর খলীফা।"[৮২]

---

৭৮. আল-কুরআন: সুরা আদ-দাহার ঃ আয়াত নং ৮-৯

৭৯. ইসলামের আহবান :খুরশিদ আহমদ

৮০. আল-কুরআন: সুরা হাদীদ আয়াত নং ২৭

৮১. আল-কুরআন: সুরা আরাফ আয়াত নং ৩২

৮২. আল-কুরআন: সুরা বাক্বারাহ আয়াত নং ৩০

Dhaka University Institutional Repository

এবং দুনিয়ার সব কিছু মানুষের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৮৩]

সুতরাং আল্লাহর নিয়ামত ত্যাগ করার মধ্যে কোন পুণ্য নেই। বরং সৎ জীবন যাপনের জন্যে যে মূল্যবোধ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে সে অনুযায়ী নিয়ামত ভোগ করার মধ্যে পুণ্য নিহিত রয়েছে। যার মাধ্যমে ইসলাম মানবতার কল্যাণ সাধন করতে চায়।

সৎ জীবন যাপনের জন্যে ইসলাম যে মূল্যোবোধের কথা বলে তাতে সকল প্রকার মানবীয় তৎপরতার অনুমোদন রয়েছে। ইসলামের মতে নির্ভেজাল পার্থিব বিষয় বলতে কিছুই নেই। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সহ মানব জীবনের সকল কর্মকান্ডকে আধ্যাত্মিক হিসেবে গণ্য করা হয়। শর্ত হলো তা ইসলামী জীবনের লক্ষ্য ও মূল্যোবোধের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। বস্তুত এ সব মূল্যোবোধ ও লক্ষ্য ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণ করে।
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين

আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা হতে তোমরা পানাহার কর এবং সত্যত্যাগী হয়ে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়িও না।[৮৪]
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

يايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا

ولا تتبعوا خطوت الشيطان-

"হে মানব জাতি ! পৃথিবতিে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু আছে তাহতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।"[৮৫]
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

يايها الذين امنوا لا تحرموا طيبت ما احل الله

لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين- وكلوا

مما رزقكم الله حلالا طيبا و اتقوا الله الذى

انتم به مؤمنون

" হে বিশ্বাসীগণ ! আল্লাহ তোমাদের জন্যে উৎকৃষ্ট যে সব বস্তু বৈধ করেছন, সে সমুদয়কে তোমরা অবৈধ করো না এবং সীমালংঘন করো না , আল্লাহ সীমালঙ্ঘন কারীকে ভাল বাসেন না. আল্লাহ তোমাদেরকে যে বৈধ

---

৮৩. আল-কুরআন: সুরা বাক্বারাহ: আয়াত নং ২৯
৮৪. আল-কুরআন: সুরা বাক্বারাহ: আয়াত নং ৬০
৮৫. আল-কুরআন: সুরা বাক্বারাহ : আয়াত নং ১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা হতে আহার কর এবং ভয় কর আল্লাহ কে যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।"[৮৬]

ইসলাম মুসলমানদেরকে আল্লাহর দেয়া নিয়ামত ভোগ করতে তাগিদ দেয় এবং মুসলিম সমাজের বস্তুগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিমান গত সীমা নির্ধারণ করে দেয়নি।

বরং অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্যে প্রচেষ্টা চালানো পুণ্যের কাজ বলে মনে করে।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض

وابتغوا من فضل الله

"সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে।"[৮৭]

যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাউকে কোন জীবিকা অর্জনের সুযোগ দান করেন, সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বা নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত সে যেন তা ত্যাগ না করে।[৮৮]

হাদীস শরীফে আছেঃ

কোন মুসলমান যদি একটি গাছ লাগায় বা এক খন্ড জমি চাষ করে, তার ফল -ফসল থেকে কোন পশু-পাখি বা মানুষ আহার করে তার প্রতিটি দান হিসেবে গণ্য হবে।[৮৯]

হাদীসে আরো আছে ঃ

"যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দূরে থেকে পরিবারের ভরণ পোষণ করতে চায়। প্রতিবেশীর প্রতি সদয় থাকে সে পূর্ণ চাঁদের মত আলোকিত চেহারা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।"[৯০]

রাসুল (সঃ) বলেনঃ

এবং যেহেতু রাসুল(সঃ) বলেছেন ঃ এমন কোন বেদনা নেই যার উপশম আল্লাহ সৃষ্টি করেননি।[৯১]

---

[৮৬].আল-কুরআন: সুরা আল মায়িদাহ :আয়াত নং ৮৭-৮৮

[৮৭]. আল-কুরআন: সুরা জুমআ; আয়াত নং ১০

[৮৮].ইবনে মাজাহ , কায়রো , ১৯৫২, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭২৭: ২১৪৮

[৮৯].বুখারী , ৩য় খন্ড , পৃঃ ১২৮; মুসলিম ,৩য় খন্ড , পৃঃ ১১৮৯:১২ এবং তিরমিযি, ৩য় খন্ড, পৃ ৬৬৬:১৩৮২

[৯০].বায়হাকীর নুর আল ঈমান , মিশকাত থেকে উদ্ধৃত , দামেশক ১৩৮১খৃঃ ২য় খন্ড,পৃঃ ৬৫৮:৫২০৭

[৯১].বুখারী ,৭ম খন্ড পৃঃ ১৫৮এবং ইবনে মাযাহ ;২য় খন্ড পৃঃ ১১৩৮:৩৪৩৯

Dhaka University Institutional Repository

তাই মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা।

অর্থনৈতিক কল্যাণের ব্যাপারে ইসলামে এত গুরুত্ব প্রদানের কারণ ইসলামের বাণীসমূহের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ইসলাম মানব জাতির জন্যে কল্যাণকর হিসেবে নাযিল হয়েছে। ইসলামের উদ্দেশ্য মানুষের জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করে তোলা, জীবনকে দুঃখময় দারিদ্র্যে ভরপুর করে তোলা নয়।

৭.৫. সুদ প্রথা

সমাজতান্ত্রিকও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাঃ

সমাজতান্ত্রিকও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে সুদও সুদী কারবার। পুঁজিপতি চড়া সুদে বিনিয়োগ করে পুঁজিহীনদের শোষণ করে থাকে। আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ সুদে পুঁজি না খাটলে ও পরোক্ষভাবে ব্যাংক ও বীমার মাধ্যমে সুদকেই চালু রাখে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থাঃ

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সুদ বিলুপ্ত করে ব্যবসা হালাল করেছে এবং যাকাত সাদকার মাধ্যমে বিনা সুদে অর্থহীনদের সাহায্য করে থাকে।
এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ
আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।অর্থনৈতিক মুক্তির উপর জোর দেয়া হয়েছে।

ধনী-দরিদ্রের আকাশচুম্বী ব্যবধান ক্রমেই পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অসার করে তুলেছে। এতে অনেক পাশ্চাত্য চিন্তাবিদও আতঙ্কিত হচ্ছেন।

অধ্যাপক কোলিন ক্লার্ক বলেছেন:

বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে সবচেয়ে বেশি আয়ের মধ্যে শতকরা বিশ লক্ষগুণ পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ রকম পার্থক্য অসামঞ্জস্যের পরিণতি একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্যে কতটা ভয়াবহ এটা সহজেই অনুমেয়। পক্ষান্তরে পার্থিব ও পারলৌকিক উদ্দেশ্য অর্জনের পাশাপাশি ইসলামই বিশ্বকে দিতে পারে একটি সুন্দর, সুসামঞ্জস্য, সময়োপযোগী এবং ভারসাম্যপূর্ণ কল্যাণকর অর্থব্যবস্থা।

উপসংহারের দ্বার প্রান্তে এসে ইসলামী অর্থব্যবস্থার সার্বজনীনতা প্রমানের জন্য পুঁজিবাদী ও কমিউনিজম অর্থব্যবস্থার কয়েকটি কুফল আবারও তুলে ধরা হলঃ

Dhaka University Institutional Repository

*পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ উপার্জন, ব্যয়, পুঞ্জিভূতকরণ ইত্যাদিতে অবাধ স্বাধীনতা থাকায় সম্পদ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের দ্বারা কুক্ষিগত হয় এবং সাধারণ মানুষ অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

*পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা সমাজে স্বার্থপরতা, হিংসা, হানাহানি, শোষণ-জুলুম ইত্যাদি ছড়িয়ে দেয় এবং মানুষের মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়।

*পুঁজিবাদ ব্যক্তি মানুষের ভোগের ধারাকে মোটেই নিয়ন্ত্রণ করে না। ভোগের ব্যাপারে সীমাহীন স্বাধীনতাই পুঁজিবাদের নীতি।ভোগের সীমাহীন স্বাধীনতা মানুষকে বিবেকহীন ও চরম স্বার্থপর করে তোলে।

* পুঁজিপতিরা মুনাফার নেশায় মাতাল হয়ে সমাজের অনিষ্টকারী দ্রব্যাদিও উৎপাদন করার সুযোগ লাভ করে থাকে।

কমিউনিজম এর কুফলঃ

* কমিউনিজম অর্থ ব্যবস্থা চরমভাবে ধর্মহীনতা ও আল্লাহহীনতা। মানব রচিত এ ব্যবস্থা মানুষের মহৎ গুণাবলীকে ধ্বংস করে চতুষ্পদ জন্তুর পর্যায়ে নামিয়ে দেয়।

*কমিউনিজম অর্থ ব্যবস্থা দেশ ও জনগণের মধ্যে ন্যায় পরায়ণতা, সুবিচার, মনুষ্যত্বের মর্যাদা, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করতে সামর্থ হয় না।

কমিউনিজম অর্থ ব্যবস্থায় মানুষের সম্পদ উপার্জনের পন্থা উপায়, উৎপাদন পরিকল্পনা সম্পুর্ণ থাকে রাষ্ট্রের করায়েত্বে। এখানে গোটা দেশটাই যেন সরকারী কোষাগার এবং জনগণ সরকারের চাকর।

সার্বজনীন আদর্শঃ

উপরে ইসলামী অর্থব্যবস্থা এবং অন্যান্য অর্থব্যবস্থার সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা হল।সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাদের ব্যর্থতার কারণ, তাদের ব্যর্থ চেষ্টার তথ্য প্রদান করা হয়েছে। সাথে সাথে ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সহ সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ও আলোচনা করা হয়েছে।

এখন সার্বজনীনতা প্রমানের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি যৌক্তিক চিন্তার বিকাশ ঘটাই ঃ

Dhaka University Institutional Repository

*এ বিধানের কোন ক্ষতিকর প্রভাব আছে কি?
*এ আইন সকলের জন্য মঙ্গলজনক কিনা ?
*এ বিধান প্রযোজ্য হলে কি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে?
*জাগতিক সমস্যার কোন সমাধান হবে কিনা?
*অন্যান্য ধর্মে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে কিনা?

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজ, জাতি,সকল শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য। মঙ্গল সবার জন্য নিহিত। যা উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।সুতরাং আমরা উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারি যে, এ ব্যবস্থার কোন ক্ষতিকর প্রভাব নেই এবং সকলের জন্য মঙ্গলজনক।নেতিবাচক প্রভাবের কোন সম্ভাবনা নেই।ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু হলে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য অর্থনৈতিক সফলতা বয়ে নিয়ে আসবে।

তাই পরিশেষে বলতে পারি যে , ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাই হল আমাদের অর্থনৈতিক সফলতার চাবিকাঠী। এ আদর্শই হল সার্বজনীন।পুঁজিবাদী আর সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা আমাদের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশেও যদি ইসলামী অর্থব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন হয় তা হলে আমরাও এর সুফল পাব।আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুদ

অভাব,অনটণ, দারিদ্র্য যখন দরিদ্রের মাথায় পাহাড়সম বোঝা হয়ে চেপে বসেছে তখন সুদী কারবারের কুটকৌশল তাদের বোঝা অপসারণের আশ্বাস বাণী দিয়েছে। প্রতারিত হয়ে দারিদ্র্যের সিংহভাগ জনগোষ্ঠী সুদী কারবারে, লেনদেনে জড়িত হয়ে পড়ে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের উপলব্ধি হল তারা লাভবান। বাস্তবতার নিমিষে দারিদ্র্যের অবস্থার প্রতি অন্তরদৃষ্টি প্রসারিত করলে শুধু এটুকুই দৃষ্টিগোচর হবে যে, দারিদ্র্য তার শাখা প্রশাখা নিয়ে দরিদ্রের উপর ভূত হয়ে চেপে বসেছে। এ থেকে যেন তার মুক্তি নেই । বের হবার উপায় নেই। দারিদ্র্যের কষাঘাতে তার সোনালী, সুন্দর, সুখময় জীবন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন । আসলে সুদ সমাজগোষ্ঠীর জন্য আশীর্বাদ নয় বরং অভিশাপ।

ধনী কর্তৃক দরিদ্রদের শোষণ করার প্রধান হাতিয়ার হল সুদ প্রথা। এটি ধনীকে যেমন ধনী করে দরিদ্রকে তেমনি নিঃস্ব করে দেয়।এ কারণে এ সুদ প্রথা ইসলামে নিষিদ্ধ। কিন্তু পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে সুদ। সুদের ক্ষতিকর প্রভাব আজ সারা বিশ্বের অর্থনীতেকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরেছে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাগণ তাদের স্বার্থেই সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ও প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে এবং এখনও করে চলেছে।[১]

সুদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অর্থ সঞ্চয়ের আকাংক্ষা থেকে শুরু করে সুদী ব্যবসায়ের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যন্ত সমগ্র মানবিক কর্মকান্ড স্বার্থন্ধতা, কার্পণ্য, সংকীর্ণতা, মানসিক কাঠিণ্য ও অর্থ পূঁজার পারদর্শিতার প্রভাবাধীনে পরিচালিত হয় এবং ব্যবসায়ে মানুষ যতই এগিয়ে যেতে থাকে এ পারদর্শিতা ততই তার মধ্যে বিকাশ লাভ করতে থাকে ।[২]

ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী সুদী ঋণের ক্ষতিকর প্রভাবের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, "এ ধরণের ঋণ সুদখোর সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থলিপ্সা, লোভ, স্বার্থপরতা ও সহানুভূতিহীন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়।"[৩]

---

[১].সুদ সমাজ অর্থনীতি ;অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, পৃঃ ৮ ঢাকা ঃ ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯২

[২].সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী,সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং,অনুবাদ: আব্বাস আলী খান ও আবদুল মন্নান তালিব । পৃঃ ৮২ (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯ ইং)

[৩]. Dr. Anwar Iqbal Quraishi, Islam and the Theory of Interest (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1987) P. 148

Dhaka University Institutional Repository

সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভোগ বসায় সুদের সাহায্যেই। স্বল্প ঋণ গ্রহীতার যে কারণে টাকা ঋণ নেয় সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক তাকে সুদের অর্থ দিতেই হবে। এর ফলে বহু সময়ে ঋণ গ্রহীতাকে স্থাবর - অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হলে ও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। সুদ গ্রহীতারা হচ্ছে সমাজের পরগাছা। এরা অন্যের উপার্জন ও সম্পদে ভাগ বসিয়ে জীবন যাপন করে।

উপরন্ত বিনাশ্রমে অর্থলাভের ফলে সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এদের কোন অবদান থাকে না।[৪]

সমাজের বিষবাষ্প এ সুদ সম্পর্কে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত ধারা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিক আলোচনা করা হলঃ

*১.সুদের সংজ্ঞাঃ
*২.সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মীয় মতামত ঃ
*৩.সুদ সর্ম্পকে আল-কুরআনের বাণীঃ
*৪.সুদ সর্ম্পকে আল-হাদীসের বাণীঃ
*৫.সুদের কুফল সমূহঃ
*৬.বাংলাদেশে প্রচলিত সুদী ব্যাংক সমূহ এবং তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
*৭. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক সমূহ এবং তাদের সুদবিহীন আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি সমূহ ঃ
*৮.ইসলামের সার্বজনীন নীতি ঃ

১.সুদের সংজ্ঞাঃ

শাব্দিক বিশ্লেষণঃ

সুদের আরবী প্রতিশব্দ হল রিবা। এর আভিধানিক অর্থ হল ঃ

*বৃদ্ধি,বেশি হওয়া, মূল থেকে বেড়ে যাওয়া।[৫]
*উচ্চতা বা বিকাশ হওয়া।

যেমন আল-কুরআনে আছে ঃ

فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت

'যখন আমি তার ওপর বর্ষণ করলাম তখন তা সবুজ শ্যামল হয়ে উঠল এবং শস্য ও ফল দান করতে লাগলো।'[৬]

৪.আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল- হাদীসের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ; ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন পৃঃ২৫৬

৫.সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২) খন্ড ২, পৃঃ ৩৯৩।

৬.আল-কুরআন: সুরা হাজ্জঃ আয়াত নং ৫

Dhaka University Institutional Repository

يمحق الله الربوا ويربى الصدقت

'আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সাদকাতকে বৃদ্ধি দান করেন।'[৭]

فاحتمل السيل زبدا رابيا

'যে ফেনপুঞ্জ উপরে উঠে এসেছিল বন্যা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো ।'[৮]

ان تكون امة هى اربى من امة

'যাতে এক জাতি থেকে অগ্রসর হয়ে যায়।'[৯]

او ينبئا الى ربوة

'আমি মরিয়ম ও ঈসাকে একটি উচ্চ স্থানে আশ্রয় দান করলাম ।'[১০]

وما اتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلا يربوا عند الله

'যে সুদ তোমরা দিয়েছো এ উদ্দেশ্যে যে ,মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে । আল্লাহর নিকট তার সাহায্যে ধন বৃদ্ধি হয় না ।'[১১]

এ সকল আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আসল অর্থের উপর যা কিছু বাড়তি পাওয়া যাবে তাকেই 'রিবা 'বলা যাবে ।

ইসলামে 'রিবা' অর্থাৎ বৃদ্ধি পাওয়াকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু সকল প্রকার বৃদ্ধিকে ইসলামে 'রিবা' বলে আখ্যায়িত করা হয়নি কারণ ব্যবসা বাণিজ্যে ও মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, যা 'মুনাফা' নামে আখ্যায়িত। মূলধনের এ বৃদ্ধি অর্থাৎ 'মুনাফা' সুদের অন্তর্ভূক্ত নয় এবং তা হারাম ও নয় বরং সম্পূর্ণ হালাল।

পারিভাষিক অর্থঃ

সুদের পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদগণ এবং বিভিন্ন অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন। যেমনঃ

*রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন:

كل قرض جر نفعا فهو ربا

অর্থাৎ 'যে ঋণ কোন মুনাফা টানে তাই রিবা বা সুদ।'[১২]

*কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

৭.আল-কুরআন: সুরা বাক্বারাহ ঃ আয়াত নং ২৭৬

৮.আল-কুরআন: সুরা রাআদ ঃ আয়াত নং ১৭

৯.আল-কুরআন: সুরা নাহল ঃ আয়াত নং ৯২

১০.আল-কুরআন: সুরা মুমিনুন ঃ আয়াত নং ৫০

১১.আল-কুরআন: সুরা রূম ঃ আয়াত নং ৩৯

১২.আল হাদীস :সুত্র: ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপরেখা ; মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী ; পৃঃ ১৪৭;প্রকাশ কাল : ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

فهو زيادة احد البدلين المجالسين من غير ان يقابل

هذه الزيادة عوض

অথাৎ 'একই জাতীয় কোন পণ্য সামগ্রীর পারস্পরিক লেনদেনের সময় কোন বিনিময় ব্যতীত এক পক্ষ কর্তৃক যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করা হয়, সে অতিরিক্ত মাল বা অংশকে বলা হয় সুদ।' যেমন কেউ এক কেজি চাল দিয়ে দেড় কেজি চাল নিল। এখানে অতিরিক্ত আধা কেজি চালের কোন বিনিময় দেয়া হয়নি। ইসলামী শরীয়ায় এ অতিরিক্ত আধা কেজি চাল সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

*মুজামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ[১৩]

كل زيادة في العقد خالية عن عوض مشروع

'শরীয়া সম্মত বিনিময় ব্যতিত চুক্তির শর্তানুযায়ী যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করা হয় তাকে সুদ বলে।'

*মুফতি আমীমুল ইহসান তাঁর কাওয়াইদুল ফিকহে গ্রন্থে বলেনঃ

চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষের যে কোন এক পক্ষ পারস্পরিক লেনদেনে শরীয়া সম্মত বিনিময় ব্যতীত শর্ত মোতাবেক যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করে তাকে সুদ বলে।

*আহকামুল কুরআন গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল আরাবী (রঃ) লিখেছেন ঃ[১৪]

الربا في اللغة الزيادة والمراد في الاية كل زيادة لا يقابلها عوض

অর্থাৎ রিবার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি। পবিত্র কুরআনে ঐ বৃদ্ধিকে বুঝানো হয়েছে যার বিপরীতে কোন বিনিময় নেই।

*ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে সুদের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

ইসলামী শরীয়ায় সুদ ঐ মালকে বলা হয়েছে যা মালের পরিবর্তে মালের লেনদেনকালে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে প্রদান করা হয়, যার কোন বিনিময় নেই।

*প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবু ইসাহাক আল যাজ্জাজ এর মতে ঃ

كل قرض يوخذ اكثر منه فهو ربا

অর্থাৎ"যে ঋণের দরুণ আসলের অতিরিক্ত নেয়া হয় তা সুদ।"

*ইমাম আবু বকর আল জাসসাস এর মতে ঃ

"একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে প্রদেয় ঋণে মেয়াদোত্তীর্ণের পর পূর্ব শর্ত অনুযায়ী আসলের অতিরিক্ত যে অর্থ আদায় করা হয় তা হচ্ছে সুদ।"

---

[১৩].প্রাগুক্ত; পৃঃ ১৪৭

[১৪].প্রাগুক্ত; পৃঃ ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

"ইসলাম ঐ বৃদ্ধিকে রিবা বলা হয়েছে, যা প্রদত্ত ঋণের ওপর পূর্বে নির্ধারিত হারে আদায় করা হয় । জাহিলী যুগে আরব দেশে অর্থ ধার দেয়া হলে ঋণ দাতার কাছ থেকে আসলের ওপর পূর্ব-নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করত। অনেকে দ্রব্য-সামগ্রী ও শস্য ধার দিত এবং শর্ত অনুসারে অতিরিক্ত পণ্য ও শস্য ফেরত নিত। তদানীন্তন আরবে আসলের ওপর অতিরিক্ত অর্থ এবং দ্রব্যের অতিরিক্ত পরিমানকে বলা হতো রিবা।"[১৫]

*মুজাহিদ (রঃ) বলেন.

"জাহেরী যুগের রিবা ছিল নিম্নরূপ। এক ব্যক্তি অন্যের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাকে বলতো , যদি তুমি আমাকে অমুক দিন থেকে অমুক দিন পর্যন্ত ঋণ দাও তা হলে আমি তোমাকে এ পরিমান বেশী দিবো।"[১৬]

*ইবনে হাজার আসকালানী(রঃ) বলেনঃ

"পণ্য বা অর্থের বিনিময় অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হচ্ছে রিবা। যেমন ঃ এক দীনারের বিনিময় দুই দীনার ।"[১৭]

*অধ্যপক সিনিয়র বলেন ঃ

সুদ হচ্ছে বর্তমান ভোগ বিরতির পুরস্কার ।[১৮]

*অধ্যাপক মার্শাল বলেন ঃ

সুদ হচ্ছে ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য প্রতীক্ষার পুরস্কার [১৯]

*লর্ড কেনস বলেনঃ

কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নগদ অর্থ হাতছাড়া করার পারিতোষিক হল সুদ ।[২০]

*অধ্যাপক রবার্টসন বলেন ঃ

Interest is the paid for the use of loanable fond.

সুদ হল ঋণযোগ্য তহবিল ব্যবহারের দাম ।[২১]

অর্থাৎ সুদ হল ঃ ঋণের শর্ত হিসেবে ঋণের অতিরিক্ত যা কিছু আদায় করা হয় তাই সুদ। পণ্য রূপান্তর না করে অর্থাৎ যে পণ্য ঋণ প্রদান করা হয় একই পণ্য নির্দিষ্ট সময়ান্তে বা হাতে হাতে যদি উহার অতিরিক্ত কোন কিছু

১৫.অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ, সুদ সমাজ অর্থনীতি (ঢাকা ঃ ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো , ১৯৯২ ইং) পৃঃ ১

১৬.ইবনে জারীর, তাফসীরে তাবারী (কায়রো ঃ দারুল মাআরিফা, ১৪০১ হি.) খন্ড ৩ পৃঃ ৬২

১৭.ইবনে হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী (কায়রো ঃ দারুল মাআরিফা ,১৪০৩হিজরী,খন্ড ৪ পৃঃ ২৬

১৮ .প্রফেসব মোস্তাফিজুর রহমান; উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি।(২য় পত্র)পৃঃ ৫৯

১৯. প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান; উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি। (২য় পত্র)পৃঃ ৫৯

২০. প্রাগুপ্ত ;পৃঃ ৫৯

২১.প্রাগুপ্ত ;পৃঃ ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

নেয়া হয় সেটাই সুদ। যেমন: ১০০০/= (এক হাজার) টাকা ঋণ করে ১বছরে যদি ১১০০(এক হাজার এক শত টাকা) নেয়া হয় তবে ১০০টাকা সুদ । আবার যদি ১০০০(এক হাজার) টাকা এবং ৫(পাঁচ) কেজি ধান আদায় করা হয় তাহলেও ৫ কেজি ধান সুদ । এছাড়া যদি চৈত্র মাসে ১০কেজি ধান দিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে ১৫ কেজি ধান নেয়া হয় তবুও ৫ কেজি সুদ হবে। তবে যদি চৈত্র মাসের বাজার দর অনুযায়ী দাম নির্ধারণ করে বাকীতে ১০ কেজি ধান দিয়ে অগ্রহায়ণ মাসে উক্ত দাম গ্রহণ করে বা এ দামে যে পরিমান ধান পাওয়া যায় তা ক্রয় করে দেয় তবে তা সুদ হবে না । আবার যদি ১ কেজি দাম নির্ধারণ করে বিক্রয় করে বিক্রয় করে তা দ্বারা দেড় কেজি চাল ক্রয় করলে তা সুদ হবে না অর্থাৎ পণ্যের রূপান্তর না করে ঋণের অতিরিক্ত নেয়া হলে তা সুদ হবে ।

*২.সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মীয় মতামত ঃ

সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন ধর্মে সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । আবার কোন কোন ধর্মে আবার এর অবস্থান অনেক নমনীয়।নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল ।

*খৃস্ট ধর্মঃ

হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রবর্তিত ধর্মে সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। খৃস্টীয় ধর্মীয় নেতাগন বলেন ঃ

The holy with forbade it. The Mosaic Law profits usury taking from a brother .Christ said, lend hoping for nothing again.[২২]

কিন্তু পরবর্তীতে পরিবেশ ও অবস্থার পরিবর্তনে বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে এ নীতির পরিবর্তন ঘটে।

অধ্যাপক এরিকরোল এ সম্পর্কে বলেনঃ

In spite of the more determined attitude of the church and its more sophisticated arguments, the practice of the taking interest grew with Economic expansion.[২৩]

*ইহুদী মতবাদঃ

প্রাচীন ইহুদী মতবাদে সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিলা। মধ্যযুগের ইহুদীগণ এ নীতির পরিবর্তন করে ইহুদীগণ শুধুমাত্র অ-ইহুদীদেরকে ঋণ দিয়ে সুদ

---

[২২].Luke P. 35 সুত্রঃ আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল হাদীসের অবদান ঃ প্রাগুপ্ত: পৃঃ ২৫০

[২৩].Eric Roll .A History of Economics thought (London: 1953)P .49

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া বৈধ করে। তাই এক ইহুদী অন্য ইহুদীকে ঋণ দিয়ে সুদ নিতে পারত না।[২৪]

Exodus এ বলা হয়েছেঃ

তোমরা যদি আমার কোন লোককে টাকা ধার দাও, যারা গরীব, তবে তোমরা তার উত্তম মহাজন হবে না এবং তোমরা তার কাছ থেকে সুদ আদায় করবে না।[২৫]

*হিন্দু ধর্ম মত ঃ

হিন্দু ধর্মের নীতি নির্ধারক ব্রাহ্মণরাও সুদকে অত্যন্ত নিচ কাজ হিসেবে মনে করত।এ জন্যে তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যকে তৃতীয় শ্রেণীর (বৈশ্য) লোকদের পেশা হিসেবে নির্বাচিত করেন।[২৬]

*রোমান দার্শনিকদের মতামতঃ

রোমান দার্শনিকগণ সুদকে মানুষ খুনের মতো পাপ কার্য বলে মনে করতেন। রোমান দার্শনিক সিসোরা সুদ সম্পর্কে কঠোর অভিমত ব্যক্ত করে বলেনঃ

Usury i.c. interest as bad as murder, saying would you take interest? Would you kill a man?[২৭]

কিন্তু রোমান সাম্রাজ্য যখন বিশাল হতে বিশালতর হতে থাকে এবং ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন রোমান আইনবেত্তাগণ সুদ নেয়াকে সম্পূর্ণ নিষেধ না করে এর জন্যে নিম্নহার নির্ধারণ করেন। অবশ্য পরবর্তীতে এ আইন বহুবার পরিবর্তিত হয়।[২৮]

***অর্থনীতি বিশারদ অমুসলিম লর্ড কীনস এর অভিমত ঃ**

অর্থ বন্টনের অসমতা এবং পরিপূর্ণ কম বিনিয়োগে পথে বাঁধার কারণ হচ্ছে সুদ প্রথা। কেননা এর দরুণ মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে।

তিনি সুদের অশুভ পরিণতি ব্যাখ্যা করে সুদের হারকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার জন্য সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের সুপারিশ করেন।

I mean the doctrine that the rate of Interest is not self-adjusting at a level best suited to the social advantage but constantly tend to rise

---

২৪.অধ্যাপক হেন: History of Economic Thought (1964) পৃঃ ৪১-৪২

২৫.মোহাম্মাদ শরীফ হুসাইন ও শাহ মোঃ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতি কি ও কেন? (ঢাকাঃ ই.বি.বি.এল. ১৯৮৪) খ. ২. পৃঃ ৮৬

২৬.আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল হাদীসের অবদান ঃ প্রাগুপ্ত ঃ পৃঃ ২৫১

২৭.Alexander Gray: The Development of Economic Doctrine .(Edn, 1965)P. 24.

২৮.শফিকুর রহমান, অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ক্রমবিকাশ, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি)

Dhaka University Institutional Repository

too high. So that a wise government is concerned to curb it by statute and custom and even by evoking the sanctions of the moral law.[২৯]

উপরের আলোচনায় এটা আমাদের নিকট একেবারে সুস্পষ্ট যে, সুদ একটি অকল্যাণ ও শোষণমূলক ব্যবস্থা।সুদ সমাজের জন্য একটি অভিশাপ।

*৩.সুদ সম্পর্কে আলকুরআনের বাণীঃ

সুদ মানব জাতির জন্য এক অভিশাপ, শোষণের হাতিয়ার। যা মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে। ধনীকে আরো ধনীএবং গরীবকে আরো গরীব করে।আল্লাহ তায়ালা এ সুদকে হারাম করেছেন।পবিত্র কুরআনের ৭ টি আয়াতে সুদ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সুদের সাথে সংশ্লিষ্টদের মন্দ পরিণতি, হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনা, ভ্রষ্টতা ও কঠোর শাস্তির বাণী শুনিয়েছেন।

আল-কুরআনের আয়াতগুলো হলঃ

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذين يتخبطه

الشيطن من المس. ذالك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا .واحل

الله البيع وحرم الربوا .فمن جاء ه موعظة من ربه فانتهى فله

ما سلف . وامره الى الله. ومن عاد فاؤلئك اصحب النار

১."যারা সুদ খায়, তারা (কিয়ামতের দিন) সে ব্যক্তির ন্যায় দন্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলে, নিশ্চয় ব্যবসা তো সুদেরই অনুরূপ, অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম । অতএব যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশ এসেছে, অনন্তর সে বিরত রয়েছে, তবে যা অতীত হয়েছে তা তারই এবং তার কৃতকর্ম আল্লাহর প্রতি নির্ভর । আর যারা পুনরায় সুদ গ্রহন করবে , তারা দোযখবাসী হবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে । "[৩০]

يايها الذين امنو ا لا تأكلون الربوا اضعافا مضعفة . واتقوا

الله لعلكم تفلحون

২."হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ভক্ষণ করো না, আল্লাহকে ভয় করো, যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।"[৩১]

---

[২৯]. J.M. Keyn's. The General Theory of Employment Interest and Money (New York)

[৩০].আল কুরআন : সুরা আল বাক্বারা : আয়াত নং ২৭৫।

[৩১].আল কুরআন : সুরা আল ইমরান : আয়াত নং ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

يايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين

৩."হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহকে ভয় কর। আর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে সুদের মধ্যে যা অবশিষ্ট আছে তা পরিহার কর।"[৩২]

فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله -وان تبتم فلكم

رؤس اموالكم - لاتظلمون ولا تظلمون

৪."কিন্তু যদি তোমরা তা না কর (অর্থাৎ সুদ পরিহার না কর) তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা রইল আর যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা তোমাদের মূলধন প্রাপ্ত হবে। তোমরা অত্যাচার করো না । তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করা হবে না।"[৩৩]

يمحق الله الربوا ويربى الصدقت والله لا يحب كل كفار اثيم

৫."আল্লাহ্ সুদকে ধ্বংস করে দেন এবং সাদাকাকে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ্ অবিশ্বাসী পাপীদের ভালবাসেন না ।"[৩৪]

واخذهم الربو وقد نهوا عنه و اكلهم اموال الناس بالباطل -

واعتدنا للكفرين منهم عذابا اليما

৬."তারা (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলরা) নিষিদ্ধ হওয়া সত্তেও সুদ গ্রহণ করত এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধন সম্পদ গ্রাস করত, আর আমি তাদের মধ্যে অবিশ্বাসীদের জন্যে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"[৩৫]

وما اتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلا يربوا عند الله -

وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون

৭."তোমরা যে বস্তু এ উদ্দেশ্যে প্রদান কর যে, তা মানুষের সম্পদে মিশে বর্ধিত হবে, তা আসলে আল্লাহর নিকট বর্ধিত হয় না। পক্ষান্তরে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে যে যাকাত প্রদান করে থাকে , এরূপ লোকেরাই আল্লাহর সমীপে প্রদত্ত মালে বর্ধিত পাবে।"[৩৬]

৩২.আল কুরআন:সুরা আল বাক্বারা : আয়াত নং ২৭৮।
৩৩.আল কুরআন:সুরা আল বাক্বারা : আয়াত নং ২৭৮।
৩৪.আল কুরআন:সুরা আল বাক্বারা : আয়াত নং ২৭৬।
৩৫.আল -কুরআন: সুরা নিসা ,আয়াত -১৬১।
৩৬.আল -কুরআন: সুরা রুম ,আয়াত -৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪.*সুদ সম্পর্কে হাদীসের বাণীঃ

সুদের চরম অভিশাপ থেকে মানবতাকে মুক্তির লক্ষ্যে মহান আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনের মাধ্যমে সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন।এ নিষিদ্ধ ঘোষণা মহানবী (সঃ) এর মুখনিসৃত অমীয় বাণী হাদীস গ্রন্থেও উল্লেখ রয়েছে। ৪০ টির ও অধিক হাদীস এবং ইজমা দ্বারা সুদ হারাম প্রমাণিত। সুদের অবৈধতা এবং সুদের সাথে সংশ্লিষ্টদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস নিম্নে দেয়া হলঃ

وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال لعن رسول الله صلى

الله عليه وسلم اكل الربا و موكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء

১)হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)হতে বর্ণিত আছে, "আল্লাহর রাসুল (সঃ) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের লেখক এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, তারা সকলেই সমান অপরাধী।"[৩৭]

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه

وسلم قال الربا ثلث وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه

২)হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "সুদের মধ্যে তিয়াত্তরটি গুনাহ রয়েছে। আর সর্বনিম্ন গুনাহটি হল নিজের মাতাকে বিবাহ করার সমতুল্য।"[৩৮]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم الربا سبعون بابا ادناها كالذى يقع على امه

৩)হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন,"সুদের ভিতর সত্তর প্রকার গুনাহ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহ হল নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সমতুল্য।"[৩৯]

وعن عبد الله بن هنزلة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ستة و ثلثين زنية

---

৩৭. মুসলিম শরীফ : সূত্র ঃ মিশকাতুল মাছাবীহ ; শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ : বাবুর রিবা; মাকতাবা মাজারেকুল কুরআন ; চকবাজার ; ঢাকা ; ১২১১ ;প্রাগুক্ত ; পৃঃ ২৪৪

৩৮. মুসতাদরাকে হাকিম

৩৯. বায়হাকী : মিশকাতুল মাছাবীহ ; প্রাগুক্ত ; পৃঃ ২৪৩; ইবনে মাজাহ :হাদীস নং ২২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন,"জেনে শুনে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশ বার যিনা করা (ব্যভিচার লিপ্ত হওয়া) অপেক্ষা মারাত্মক অপরাধ।"[৪০]

وعن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم

اذا اراد الله بقوم هلاکا فشی فیهم الربا

৫) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,"আল্লাহ তায়ালা যখন কোন জাতিকে ধ্বংসে করার ইচ্ছা পোষণ করেন তখন তাদের মধ্যে সুদী লেনদেন ব্যাপক আকার ধারণ করে।"[৪১]

وعن ابی هریرة (رض) قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لیاتین

علی الناس زمان لا یبقی احد الا اکل الربا فمن لم یأکله اصابه من غباره.

৬)হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "এমন এক সময় আসবে যখন কোন মানুষই সুদ ব্যতীত বাকী থাকবে না।কেউ যদি সুদ না খায় কমপক্ষে ধুলিকনা হলেও শরীরে লাগবে।"[৪২]

قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کل قرض جر منفعة فهو ربا

৭)রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

" যে ঋণ সুবিধা টানে তা সুদ।"[৪৩]

৮)হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে,

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "ক্ষতিকর সাতটি বিষয় থেকে তোমরা পরহেজ থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল(সাঃ) সে সাতটি বিষয় কি? জবাবে তিনি বললেন, (১)আল্লাহর সাথে কাকেও শরীক করা,(২)যাদু বিদ্যা শিক্ষা ও প্রদর্শন করা, (৩)অন্যায়ভাবে কাকেও হত্যা করা,(৫)ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা,(৬)ধর্ম যুদ্ধে পলায়ন করা এবং(৭)কোন স্বতী সাধবী রমনীকে অপবাদ দেয়া।"[৪৪]

৯)হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে,

৪০.মুসনাদে আহমদ ও তাবারানী

৪১.কানযুল উম্মাল

৪২. সুনানু ইবনে মাজাহ: প্রাগুক্ত : বাবুত তাগালিজি ফির রিবা : পৃঃ ১৬৬

৪৩.কানযুল উম্মাল

৪৪.সহীহ বুখারী,মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বনবী (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, "সুদখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৪৫]

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ليلة اسرى بى لما انتهينا الى السماء السابعة فنظرت فوقى فاذا انا برعد وبروق وصواعق قال فاتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم قلت ياجبرئيل من هؤلاء قال هؤلاء اكلة الربا.

১০)হযরত আবু হুরায়রা(রাঃ) হতে বর্ণিত,

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মিরাজ রজনীতে আমি সপ্তম আকাশে পৌঁছে যখন উপরের দিকে তাকালাম তখন বজ্রধ্বনী, বিদ্যুৎ ও গর্জন দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট এলাম যাদের পেট ছিল একটি ঘরের ন্যায় বিস্তৃত। তাদের পেট ছিল সর্পে ভরপুর। সর্পগুলো বাহির থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হল সুদখোর সম্প্রদায়।"[৪৬]

১১)আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেছেন,মনে রেখ, জাহিলিয়্যাতের সমুদয় প্রথা আমার পদতলে সমাধিস্থ করা হলো। জাহেলি যুগের অন্যায় রক্তপাত সংক্রান্ত প্রতিশোধের বিষয়টি রহিত করা হলো। প্রথমে আমি আমার আত্মীয় ইবনে রবীয়া বিন সা'দ গোত্রের স্তন্য পানের জন্যে পাঠানো হয়েছিল। হুজায়েল গোত্রের লোকেরা তাকে সেখানে হত্যা করেছিল। অতঃপর তিনি বললেন, জাহেলী যুগের প্রচলিত সকল সুদ বাতিল ঘোষণা করা হলো। সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস বিন মোত্তালিবের সকল সুদ বাতিল ঘোষণা করলাম।

১২) হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত,

তিনি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছেন যে, উসামাহ ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন যে,নবী করীম (সাঃ) বলেছেন: " রিবা নাসিয়া ছাড়া কোন রিবা নেই।"[৪৭]

৪৫.হাকিম

৪৬.মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ২২৬৪ মিশকাতুল মাছাবীহ : প্রাগুক্ত ; পৃঃ ২৪৬

৪৭.আন নাসায়ী শরীফ : হাদীস নং ৪৫০৪

Dhaka University Institutional Repository

১৩)উবায়দুল্লাহ ইবনে আবী ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছেন, উসামা ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, রিবা হচ্ছে রিবা নাসিয়া।[৪৮]

১৪)হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,

চার শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহতায়ালা এই ফয়সালা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না আর না সেখানকার কোন নিয়ামতের স্বাদ তারা আস্বাদন করবে। তারা হলো :(১)মধ্যপানে আসক্ত,(২)সুদখোর,(৩) ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতকারী এবং (৪)পিতামাতার অবাধ্য সন্তান।(হাকিম)

১৫)হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন,

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সুদ ভিত্তিক মুদ্রা ব্যবসায়ীদের জাহান্নামের খবর পৌছে দিও।"(তাবারাণী)

উপরে উল্লেখিত হাদীসগুলো ছাড়াও আরও অনেক হাদীস রয়েছে যা সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

৫.সুদের কুফল সমূহঃ

সুদ মানুষকে শোষণের অর্থনৈতিক হাতিয়ার। সুদের প্রভাবে মানুষের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই দেখা দেয় তা নয় নৈতিক ও চারিত্রিক সর্বোপরি মানবিক বিপর্যয় ও সৃষ্টি হয়। একদিকে সুদের নিষ্পেষণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্রমেই দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হতে থাকে। অপরদিকে পুঁজিপতি ধনীরা সুদ গ্রহণ করে আরো ধনী হতে হতে এমন পর্যায় পৌছে যে সুদের নেশায় লোভাতুর হয়ে তার মধ্যে নৈতিক, চারিত্রিক ও মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়।[৪৯]

নিম্নে সুদের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

৫.১*সুদের নৈতিক কুফলঃ

(১)সুদ মানষের মধ্যে নির্মমতা,সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা,কৃপণতা, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়।

(২)সুদ হচ্ছে মানুষের উন্নত চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক।

৪৮.মুসলিম শরীফ:হাদীস নং ২৯৯১

৪৯.ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর একুশ বছর পুর্তি সংখ্যা পৃঃ ৪২৭

Dhaka University Institutional Repository

(৩)সুদ মানুষকে কর্ম বিমুখ করে। কারণ বিনা পরিশ্রমে সুদ পাওয়া যায় বলে জনগণ অর্থকে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ না করে ব্যাংকে জমা রাখে।

(৪)সুদ মানুষকে পরস্পরের প্রতি উদার হবার পরিবর্তে অত্যাচারী হতে শিক্ষা দেয়।

(৫)সুদ মানুষের হিতাহিত জ্ঞানকে হ্রাস করে।

(৬)সুদ মানুষকে দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে রাখে। ফলে তার কর্ম ক্ষমতা হ্রাস পায়।

(৭)সুদখোররা কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিরে প্রতি দয়াদ্র হবার পরিবর্তে তার বিপদ ও অসহায়ত্বের সুযোগ অধিক সুদ তথা অবৈধ মুনাফা অর্জনের চেষ্টায় মত্ত থাকে।

(৮)সুদ মানুষের মধ্যে অর্থ লালসা সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দেয়। অধিক অর্থ (সুদ) পাবার আশায় সে এত মত্ত হয়ে পড়ে যে, ভালমন্দের ও জ্ঞান থাকে না।

(৯)সুদ মানব চরিত্রের মহৎ গুণাবলী তথা দানশীলতা, মহানুভবতা, উদারতা, সহানুভূতি ও আত্মত্যাগকে হ্রাস করে দেয়।

(১০)সুদখোর ব্যক্তি অপরের উপকার করাতো দূরের কথা অপরের নিজ চেষ্টায় ও নিজ পুঁজি দিয়ে তার সমতুল্য হতে দেখলে তাও সহ্য করতে পারে না।[৫০]

৫.২*সুদের সামাজিক কুফলঃ

(১) সুদ সমাজে মারামারি, হানাহানি ও হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়।

(২)সুদ মানুষকে সমাজের অন্যদের প্রতি নির্মম হতে এবং অমানবিক আচরণ
করতে শিক্ষা দেয়।

(৩)সুদ সমাজে বেকারত্ব বৃদ্ধি করে।

(৪)সুদ সমাজে চুরি,ডাকাতি , ছিনতাই,রাহাজানি, ইত্যাদি বাড়িয়ে দেয় এবং নিরাপত্তা ও শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে।

(৫)সুদভিত্তিক সমাজে অশ্লিল ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রসার ঘটে। ফলে সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়।

(৬)সুদ সমাজের অসহায়, দারিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের ঋণের ভারে জর্জরিত করে। কারণ ঋণ গ্রহীতা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদে আসলে পরিশোধ করতে না পারে তখন ঋণদাতা সুদের হার বাড়িয়ে দেয়।

৫০.ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপরেখা : মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী :পৃঃ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

(৭)সুদী সমাজ ব্যবস্থায় জনকল্যাণমূলক কাজ উপেক্ষিত থাকে।

(৮)সুদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

(৯)সুদী সমাজে গরীব শোষিত হয় এবং কালবাজারী ও মজুদদারী বৃদ্ধি পায়।

(১০)সুদ সমাজে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষকে ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব ও সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত করে এবং কিছু সংখ্যক পুঁজিপতিকে বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক বানিয়ে দেয়।

(১১)সুদ প্রথা সম্পদকে সমাজের কতিপয় পুঁজিপতির হাতে তুলে দেয়।

৫.৩* সুদের অর্থনৈতিক কুফলঃ

(১)সুদ দেশের অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল ও বিপর্যস্ত করে ফেলে।

(২)সুদ মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়িয়ে দেয়।

(৩)সুদ জাতীয় উৎপাদন ও বিনিয়োগকে বিনষ্ট করে।

(৪)সুদ ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগকে অনুৎসাহিত করে।

(৫)সুদ ভিত্তিক অর্থনীতিতে সুদ ধনীকে আরো ধনী হবার এবং গরীবকে আরো গরীব বানাবার সুযোগ করে দেয়।

(৬)অধিক হারে সুদ দেশে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

(৭)সুদ ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ বিনিয়োগকে অনুৎসাহিত করে।

(৮)সুদ ভিত্তিক অর্থনীতিতে সুদের হার ঝুঁকিমুক্ত ও পূর্বনির্ধারিত থাকে বলে অনেক সময় অর্থকে অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে।

(৯)সুদ ভিত্তিক অর্থনীতিতে সুদ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর মূল্য বাড়িয়ে দেয় এবং জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

(১০)সুদী অর্থ ব্যবস্থায় সুদী ব্যাংক,বীমা, কর্পোরেশন ও অন্যান্য সুদী প্রতিষ্ঠানগুলো জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে না। কারণ সুদ সহ মূলধন ফেরত পাবে এটাই তাদের প্রধান হিসাব।

(১১)সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে যার যত বেশী সম্পদ আছে, সে তত বেশী ঋণ পেয়ে থাকে। অপরদিকে যার সম্পদ নেই সে ঋণ পায় না। ফলে সুদী অর্থব্যবস্থায় গরীবের স্বার্থ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।

(১২)সুদী অর্থব্যবস্থায় সুদী প্রতিষ্ঠান গুলো বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকে না।[৫১]

---

[৫১].ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপরেখা: প্রাগুক্ত:পৃঃ ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

(১৩)সুদী অর্থব্যবস্থায় সুদ মানুষকে অলস ও অকর্মন্য বানিয়ে দেয়। বিনা পরিশ্রমে সুদ পাওয়া যায় বলে অনেকে অর্থকে ব্যবসায় না খাটিয়ে ব্যাংকে জমা রাখে।

(১৪)সুদ মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও মেধার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

(১৫)সুদী অর্থব্যবস্থায় সুদ পুঁজিপতি ও ব্যাংকারদের কে স্বেচ্ছাচারী আচারণে বাধ্য করে। তারা দেশ ও জাতির স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য থাকে না।

(১৬)সুদী অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত থাকে। কারণ একাদিকে বিনিয়োগ কম থাকায় শ্রমের চাহিদা কমে যায়, অপরদিকে মালিকপক্ষ সুদের বোঝা বহন করে শ্রমিকের ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে সক্ষম হয় না।

(১৭)সুদ কালবাজারী ও মজুদদারদের উৎসাহিত করে।

(১৮) সুদ মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ব্যবহৃত করে।

(১৯) সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে সুদের হার যত বেশী হয়, দ্রব্য মুল্য তত বেড়ে যায়।

৫.৪ *সুদের রাজনৈতিক কুফলঃ

➢সুদ দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয় এবং ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা সৃষ্টি করে।

➢সুদ দেশের রাজনৈতিক অবস্থাকে বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল করে তোলে।

➢সুদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় কতিপয় ব্যক্তি অধিক সুবিধা ভোগ করে জনগণের অধিকার হরণ করে।

➢সুদ দেশের সরকার ও জনগণের ওপর বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়িয়ে দেয়। ফলে দেশে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে।

➢সুদের ব্যাপক প্রচলনের ফলে উন্নত দেশগুলো অনুন্নত দেশগুলোর ওপর কালো হাত বাড়িয়ে দেয়।

➢সুদভিত্তিক সরকার ব্যবস্থায় জনকল্যাণমুলক অর্থব্যয় করতে চায় না।

➢সুদের ফলে রাজনৈতিক দলগুলোতে চরম অরাজকতা সৃষ্টি হয়। সবাই নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে তোলে।

➢সুদের ফলে মানুষ দেশ ও জাতির সেবা করার মন-মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। তারা দেশ সেবার মত কাজ থেকে বিরত থাকে।

➢সুদভিত্তিক সরকার ব্যবস্থায় দেশের সম্পদের সুষ্ঠব্যবহার নিশ্চিত না করার কারণে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব হয়ে উঠে না।

Dhaka University Institutional Repository

সুদ ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে তারা নিজেদেরকে দারিদ্র্যের ছোবল থেকে মুক্তির জন্যে, সাময়িক অভাব মেটানোর জন্যে তারা সুদ দাতাদের আশ্রয় নিচ্ছে।ফলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা সুদের রাহুল গ্রাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি বরং সুদী কারবার,লেনদেনে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছে। লক্ষ্য তাদের এটাই যে, তারা যেন তাদের বর্তমান অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে। সোনালী সুখের স্বপ্নে তারা বিভোর।বাংলাদেশে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা ব্যক্তিমালাকানাধীন সুদের লেনদেন হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলঃ

*বাংলাদেশের সুদী সরকারী/বেসরকারী ব্যাংক সমূহ;
*এনজিও সমূহ;

৫.বাংলাদেশে প্রচলিত সুদী ব্যাংক সমূহ এবং কার্যাবলী ঃ

বাংলাদেশে প্রচলিত সুদী ব্যাংক সমূহের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা ৪টি; যথাঃ (১)সোনালী ব্যাংক, (২)অগ্রণী ব্যাংক, (৩)জনতা ব্যাংক, (৪)রূপালী ব্যাংক। (রূপালী ব্যাংকের সরকারী মালিকানার অংশ বর্তমানে ৯৪.৫ ভাগ।)

এবং বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো হলঃ

(১)পূবালী ব্যাংক লিঃ,(২)উত্তরা ব্যাংক লিঃ,(৩)আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ,(৪)ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ (৫)ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ,(৬)সিটি ব্যাংক লিঃ,(৮)ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ,(৯)সিটি ব্যাংক লিঃ,(১০)ইস্টার্ণ ব্যাংক লিঃ, (১১)প্রাইম ব্যাংক লিঃ,(১২)ঢাকা ব্যাংক লিঃ,(১৩)সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, (১৪)মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ,(১৫)স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ,(১৬)ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ,(১৭)ওয়ান ব্যাংক লিঃ,

বাংলাদেশে বিদেশী ব্যাংকের যে সমস্ত শাখা কর্মরত আছে সেগুলো হল ঃ

১.আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক (যুক্তরাষ্ট্র) ২.এ.এন.জেড গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক,

৩.ষ্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক.(বৃটেন) ৪.হাবিব ব্যাংক.(পাকিস্তান) ৫.স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া. ৬.ইন্দোসুয়েজ ব্যাংক (ফ্রান্স), ৭.ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, ৮.মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক.(পাকিস্তান) ৯. সিটি ব্যাংক এন এ

Dhaka University Institutional Repository

(যুক্তরাষ্ট্র)১০.হংকং ব্যাংক,১১. হানিল ব্যাংক (দঃ কোরিয়া) ১২. সোশিয়েতে জেনারেল (ফ্রান্স),১৩. স্কশিয়া ব্যাংক (কানাডা)।

বাংলাদেশে রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক । যার নাম বাংলাদেশ ব্যাংক । সরকারের এক আদেশ বলে (১৯৭২ সালের ১২৭ নং আদেশ) স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই সাবেক স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সমস্ত দায় ও সম্পদ নিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।এটি সকল ব্যাংককে নির্দেশনা তথা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ।

আধুনিক ব্যাংকের কার্যাবলীঃ

বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যে সব কাজ সম্পাদন করে তা নিম্নরূপ ঃ

(১)আমানত গ্রহণ। (২)ঋণদান। (৩)ঋণ হতে আমানত সৃষ্টি।
(৪)ঋণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা। (৫)বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা।
(৬) এক স্থান হতে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তর ।(৭)অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা।
(৮)দলিল , স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্রের সংরক্ষণ ।
(৯)বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ঋণপত্রের ক্রয় বিক্রয়।(১০)মকেকলদের বাড়ি ভাড়া,গ্যাস বিল, বিদ্যুৎ বিল, আয়কর ইত্যাদি পরিশোধ প্রভৃতি।

*এনজিও সমূহঃ

বাংলাদেশে অনেক এনজিও রয়েছে যারা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঋণ বিতরণ করছে।তবে এ ঋণ সুদমুক্ত ঋণ নয়,সাপ্তাহিক কিস্তি, মাসিক কিস্তি এভাবে করে তারা প্রদেয় টাকার অনেক বেশী টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে অসহায় দরিদ্রের কাছ থেকে।

এনজিওরা মুলত:১৯৭০ দশকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প শুরু করে।তবে তাদের কার্যক্রম প্রসার লাভ করেছিল সরকারী সেক্টরগুলোতে, ব্যাংকসমূহে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহে এবং জাতিসংঘের এজেন্সীসমূহে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১০০০ এন.জি.ও. ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের কাজ করছে।

বিশ্বে মাত্র ৫ টি প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণের সংখ্যা ১ মিলিয়নের অধিক। তার মধ্যে ৪টি ই হল বাংলাদেশের। সেগুলো হল; গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক, প্রশিকা ও আশা। সিডিএফ (Credit Development Forum)এর এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, সিডিএফ-এর সক্রিয় এনজিও সংখ্যা ৭০০। ঋণ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১কোটি ৫১ লাখ। তাদের সম্পদের পরিমান প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। আদায়ের হার ৯৫%। সুদ/সার্ভিস চার্জ ৮% থেকে

Dhaka University Institutional Repository

২.৪%। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ ২০০৩ মোতাবেক এনজিও ও গ্রামীন ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা পরিবার সংখ্যা শতকরা ৮৭ভাগ।[৫২]

এনজিওদের সুদের হারঃ

ক্ষুদ্র এনজিওগুলো সুদের হার কমানোর পদক্ষেপ নিলে ও বড় এবং অধিকাংশ এনজিও সুদের হার কমাচ্ছে না ক্ষুদ্র ঋণ অর্থায়নকারী এসব এনজিও (এম এফ এনজিও) উচ্চ সুদের হার অব্যহত রাখছে।

সুত্র মতে ,গত জুলাই ২০০৪ ইং মাস থেকে এনজিওগুলোকে ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার কমানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কারণ , বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী বেসরকারী সংস্থাগুলোর সুদের হার বেশী বলে দীর্ঘদিন থেকে সমালিত হয়ে আসছিল।এনজিও গুলো বর্তমানে ২২ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত সুদ নিচ্ছে।কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত সুদের হার ৪০শতাংশও ছাড়িয়ে যায়।অথচ এনজিওগুলো পিকেএসএফ থেকে মাত্র ৪ থেকে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ হারে সুদে ঋণ নিচ্ছে।[৫৩]

উল্লেখ্য দেশে মোট ১২শ এম. এফ.-এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করছে। এদের মধ্যে ব্রাক, আশা, প্রশিকা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, টিএমএসএস, কারিতাস মোট ক্ষুদ্র ঋণের ৮০.৬৭ শতাংশ বিতরণ করছে।[৫৪]

গ্রামীণ ব্যাংক ঃ

গ্রামীণ ব্যাংক পৃথীবির সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান । এটি প্রথমে প্রজেক্ট হিসেবে কাজ করে ১৯৭৬ সালে এবং বিশেষ একটি ব্যাংক হিসেবে কাজ শুরু করে ১৯৮৩ সালে। ডিসেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত এটি ১১৩৭ টি শাখার মাধ্যমে ৩৯০৪৫টি গ্রামে ২.৩৯মিলিয়ন জনগোষ্ঠীকে মবিলাইজড করেছে। এখান থেকে ঋণ গ্রহণকারীর অধিকাংশই মহিলা।

পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন(PKSF)ঃ

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে । এর উদ্দেশ্য ছিল MF-NGO এর ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ প্রদানের জন্য ৩% অথবা ৫% হারে পার্টনার অর্গানাইজেশনগুলোকে ফান্ড সরবরাহ করা । ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত PKSF ৬০ টি জেলায় ১৭৮ টি পার্টনার অর্গানাইজেশনকে ৪,৬৮৩ মিলিয়ন টাকা প্রদান করেছে। যাহোক বর্তমানে PKSF কে ক্ষুদ্র ঋণের মূল উৎস হিসেবেই মনে করা হয়।

---

৫২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর একুশ বছর পুর্তি সংখ্যা ; পৃঃ ২০৮: সংকলক :ডঃ মুজিবুর রহমান খান।

৫৩. দৈনিক ইত্তেফাক : ৩০ অক্টোবর,২০০৪

৫৪. দৈনিক ইত্তেফাক :প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

Nationalized Commercial Bank:

ভূমিহীণ ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে Nationalized Commercial Bank সহ আরও কয়েকটি ব্যাংক। এ সমস্ত ব্যাংকগুলো MF-NGO অথবা নিজস্ব প্রোগামের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করে থাকে।

সরকারী প্রোগাম সমূহঃ

ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্যে বাংলাদেশ সরকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে ঋণ বিতরণের বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ৯টি মন্ত্রণালয় ও সরকারের তিনটি বিভাগ (Rural Development and Co-operative Division . Cabinet Division . Local Government Division)ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্রের সেবা করছে।তাছাড়া সরকার সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সুদমুক্ত ঋণ ও প্রদান করছে।

১৯৯৮ জুন পর্যন্ত সরকার ১৬,০৬৩ মিলিয়ন টাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ করছে। ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত Integrated Rural Development Program (IRDP) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু করে ১৯৭৪ সালে। IRDB কে ১৯৮২ সালে নামকরণ করা হয় BRDB নামে যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতা দূরীকরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।[৫৫]

ক্ষুদ্র ঋণ বা মাইক্রো-ফাইন্যানেন্সর বর্তমান অবস্থাঃ

মাইক্রো-ফাইন্যান্সের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল নারীদেরকে ক্ষুদ্র পুঁজি (small capital) প্রদানের মাধ্যমে মানিলেন্ডার এর শোষণ থেকে তাদেরকে রক্ষা করা। কিন্তু বর্তমানে এটি বিভিন্ন সেক্টরকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে অনেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রসার লাভ করেছে। বর্তমানে মাইক্রো-ফাইন্যান্সের অধীনে আছে প্রায় ১৪.৫ মিলিয়ন লোক (বাংলাদেশে)। আজকাল মাইক্রো-ফাইন্যান্সের এর মাধ্যমে বেকার যুবকদেরকেও ঋণ প্রদান করা হচ্ছে যাতে তারা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। সুতরাং বর্তমানে মাইক্রো-ফাইন্যান্সে অনেক পদ্ধতিগত কৌশল পরিবর্তন এসেছে। দরিদ্র ক্লায়েন্টের তুলনায় ফান্ডের স্বল্পতামাইক্রো-ফাইন্যান্স সেক্টরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা। জুন ৯৯ পর্যন্ত প্রায় ৫২৪ টি MF-NGO গুলো ২০ বিলিয়ন টাকা নিয়েছে " Revolving Loan Fund"(RLF) থেকে।

1) Foreign donation(20.707%) 2) members savings (23.63%)এবং PKSF (23.18%) কিন্তু আন্তর্জাতিক উৎসসমূহ হলো service charge ।তবে আর, এল এফএ service charge এবং স্থানীয় ব্যাংকগুলোর অবদান ক্রমান্বয় হ্রাস পাচ্ছে । একইভাবে foreign donation ও হ্রাস পাচ্ছে।

---

[৫৫].কাজী মোহাম্মাদ মাহবুবুর রহমান :কারেন্ট ওয়ার্ল্ড :জুন ২০০৩ পৃঃ ২৮

Dhaka University Institutional Repository

যেমন ঃ জুন ১৯৯৮ থেকে জুন ১৯৯৯ এর মধ্যে foreign donation হ্রাস পেয়ে ২৫.৯৬% থেকে ২০.৭০% -এ নেমে এসেছে।[৫৬]

যা হোক বর্তমানে বাংলাদেশে কার্যরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে তাদের ফান্ড সংগ্রহ করে কৃষি, মৎস চাষ,খাদ্য প্রস্তুতকরণ, ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষুদ্র ব্যবসা, বস্ত্র প্রস্তুতকরণ, পরিবহন, গৃহনির্মান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি খাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান করে যাচ্ছে।নিম্নে এর একটি টেবিল দেয়া হলোঃ

Sub-sector-wise microfinance performance of reported NGOs [৫৭]

sub sector	% disbursed up to December 1997 (326)NGOs	%disbursed up to December 1998 (316)NGOs	% disbursed up to December 1999 (434)NGOs
Agriculture	13.57	12.19	12.46
Fisheries	4.27	4.33	4.60
Food processing	12.23	10.17	9.31
small business	45.71	42.13	42.60
Cottage industries	2.82	2.83	2.60
Transport	3.83	3.39	3.31
Housing	1.87	1.49	1.49
Health	0.56	0.51	0.59
Education	0.05	0.04	0.04
Livestock	11.66	17.94	18.41
Other	3.06	4.81	4.53
Total	100.00	100.00	100.00

***৭. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক সমূহ এবং তাদের সুদবিহীন আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি সমূহঃ**

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য ইসলামী ব্যাংক সমূহঃ

(১)ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ,(২)আল বারাকা ব্যাংক লিঃ, (৩)আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ,(৪)বাংলাদেশসোশাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক

---

[৫৬]. প্রাগুক্ত ঃ পৃঃ ২৯

[৫৭].CDF statistics. Vol -5 : P. 687, CDF Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

লিঃ, (৫)ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইন (৬)শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ।

ইসলামী ব্যাংকের আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ পদ্ধতি সমূহঃ

যাদের পক্ষে টাকা নিজের নিকট রাখা সম্ভব হয় না তারা ব্যাংকে টাকা জমা রেখে থাকেন।পাশাপাশি যাদের ব্যবসায়ে বিনিয়োগের সুযোগ নেই বা ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী নয় বা সময় সুযোগের অভাবে টাকা পয়সা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ না করে ব্যাংকে জমা রাখতে আগ্রহী এবং বিনিময়ে কিছু লাভও পেতে আগ্রহী হন। তারা ইসলামী ব্যাংক-এ টাকা জমা রেখে হালাল উপায়ে লাভবান হতে পারেন।

১.আমানত গ্রহণ পদ্ধতিঃ

ইসলামী ব্যাংক মূলত দুটি উপায় আমানত গ্রহণ করে থাকেন। তা হলঃ

ক)আল ওয়াদিয়াঃ

ইসলামী ব্যাংক চলতি হিসেবে আল ওয়াদিয়া নীতি অনুসারে গ্রাহকদের নিকট আমানত গ্রহণ করে। এ পদ্ধতিটি হলো ব্যাংক তার গ্রাহকদের নিকট এ ওয়াদা করে যে, চাহিবামাত্র তার টাকা ফেরত দিতে ব্যাংক বাধ্য থাকবে । তবে গ্রাহকদের থেকে এ মর্মে সম্মতি নেয় যে, ব্যাংক তার টাকা ব্যবসায় খাটাবে ।

খ) আল-মুদারাবাঃ

আল-মুদারাবা ভিত্তিতে ব্যাংক গ্রাহকদের কাছ থেকে টি, ডি,আর সেভিংস, লাভ-লোকসান ভিত্তিক এক, দুই ও তিন বছর মেয়াদী আমানত গ্রহণ করে থাকে । এ ব্যবস্থায় ব্যাংক হলো মুদারিব, আর গ্রাহক হলো সাহেব-আল-মাল। এখানে মূলধনের মালিক ব্যাংক নয় বরং গ্রাহক । ফলে গ্রাহকের টাকা ব্যাংক ব্যবসায় খাটাবে, আর লাভ-লোকসান হলে তার দায়ভার গ্রাহক বহন করবে । লাভ হলে গ্রাহক তার অংশ পাবে।

২.ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি সমহঃ

ব্যাংক থেকে যাদের বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় তারা সুদী লেনদেন থেকে বাঁচার জন্য ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়া মোতাবেক হালাল উপায় বিনিয়োগ গ্রহণ করে ব্যবসা করতে পারেন বা বাড়ি ঘর নির্মান করতে পারেন। আমানত কারীদের নিকট থেকে যে অর্থ বিভিন্ন হিসাবে ইসলামী ব্যাংক জমা করে থাকে তা থেকে বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে লাভ অর্জন করে থাকে । মূলতঃ তিনটি কৌশলে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করে থাকে।আর তা হলঃ

ক.শেয়ার মেকানিজম ঃ

শেয়ার মেকানিজমে মূলতঃ লাভ ক্ষতির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত দুই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করা হয় ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

১) মুদারাবা বিনিয়োগ পদ্ধতিঃ

মুদারাবা আরবী শব্দ "দারবা"থেকে গ্রহণ করা হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে চলাফেরা করা বা প্রচেষ্টা চালানো । মুদারাবা হচ্ছে এমন একটি চুক্তি ভিত্তিক ব্যবসা পদ্ধতি যাতে এক পক্ষ পুঁজি সরবরাহ করে এবং অপর পক্ষ মেধা, যোগ্যতা, শ্রম ও সময় বিনিয়োগ করে ব্যবসা পরিচালনা করেন। লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করা হয় এবং ক্ষতি হলে পুঁজি সরবরাহকারী বহন করেন। এতে উদ্যোক্তার মেধা, শ্রম ও সময় ব্যয় হয়। পুঁজি সরবরাহকারীকে সাহেবাল মাল এবং উদ্যোগ গ্রহণকারীকে মুদারিব বলে।

২) মোশারাকা বিনিয়োগ পদ্ধতি ঃ

মোশারাকা আরবী শব্দ " শিরকাত" বা শিরক শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে যার অর্থ হচেছ পরস্পর লাভ ক্ষতিতে অংশীদারিত্ব ভিত্তিক ব্যবসা পদ্ধতি। মুশারাকা বলতে এমন একটি চুক্তি ভিত্তিক অংশীদারী কারবারকে বুঝায়,যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে কারবার পরিচালনা করে এবং কারবারের লাভ ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে । লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত হারে অংশীদারদের মধ্যে ভাগ করা হয় এবং ক্ষতি হলে নিজ নিজ পুঁজির আনুপাতিক হারে তা বহন করে ।

খ) বাইয়ে মেকানিজম ঃ

১. বাইয়ে মুয়াজ্জাল ঃ

যদি মালামাল বাকীতে আগে সরবরাহ করা হয় এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে পরে মূল্য পরিশোধ করা হয় তবে তাকে বাইয়ে মুয়াজ্জাল বলা হয় যেমনঃ- কৃষি যন্ত্রপাতি, সার,কীটনাশক ইত্যাদি আগে কৃষককে সরবরাহ করে উৎপাদনের পর মূল্য পরিশোধ করা ।

২) বাইয়ে মুরাবাহা পদ্ধতিঃ

'বাই মুরাবাহা' শব্দটি আরবী বাইয়ুন ও রিবহুন শব্দদ্বয় থেকে গৃহীত হয়েছে। বাইয়ুন অর্থ ক্রয় বিক্রয় এবং রিবহুন অর্থ মুনাফা।অর্থাৎ মুনাফার ভিত্তিতে ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতিকে বাইয়ে মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি বলে ।

অগ্রীম চুক্তির ভিত্তিতে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়কে মুরাবাহা বলা হয়। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাংক গ্রাহকের চাহিদামত বাজার যাচাই করে পণ্য ক্রয় করে । এখানে গ্রাহকের মূলধন শরীকানা থাকে । পণ্যের ওপর পূর্ণ মালিকানা থাকে ব্যাংকের । ব্যাংক চুক্তির মাধ্যমে একটি মূল্য নির্ধারণ করে। গ্রাহক তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ দরে একবারে অথবা কিস্তিতে ক্রয় করে । গ্রাহক অবশ্যই ক্রয়মূল্য-বিক্রয়মূল্য এবং লাভ সম্পর্কে অবগত থাকবে।

৩)বাইয়ে সালাম ঃ

বাইয়ে সালাম হলো দ্রব্যের মূল্য অগ্রিম পরিশোধের মাধ্যমে চুক্তিতে ক্রয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী ক্রীত দ্রব্য ব্যাংকের কাছে নির্দিষ্ট দিনে অর্পন করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। যেমন- কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল সরবরাহ করার জন্য পূর্বেই তাকে কাঁচামালের ক্রয়ের জন্য অর্থ যোগান দেয়া হয় এ শর্তে যে, সে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে চুক্তিগত উৎপাদিত পণ্য ব্যাংককে সরবরাহ করবে।

৪)বাইয়ে ইস্তিসনাঃ

বাইয়ে ইস্তিসনা হচ্ছে ফরমায়েশের ভিত্তিতে ক্রয় বিক্রয়। অর্থাৎ ক্রেতা পণ্য ক্রয়ের জন্য ফরমায়েস প্রদান করে ভবিষ্যতের নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহের শর্তে আংশিক মূল্য পরিশোধ করে সরবরাহের সময় বাকী মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রেতার নিকট থেকে যে পদ্ধতিতে ক্রয় করে থাকে তাকে বাইয়ে ইস্তিসনা বলে। যেমন দর্জির নিকট কাপড় তৈরীর জন্য ফরমায়েশ প্রদান করে আংশিক মূল্য অগ্রিম প্রদান করে বাকী মূল্য পণ্য সরবরাহের সময় পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ পদ্ধতি হচ্ছে বাই ইস্তিসনা।

গ. ইজারা মেকানিজমঃ

ইজারা বা ভাড়া পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক মূলত : দুই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে ঃ

১)হায়ার পারচেজঃ

হায়ার পারচেজ এমন একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি যাতে ব্যাংক নিজেই সাকুল্য অর্থ যোগান দিয়ে প্রকল্প, বাড়ি বা কোন স্থায়ী সম্পদের মালিক হয়, অতপর উক্ত প্রকল্প,বাড়ি বা সম্পদ গ্রাহকের কাছে ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া দেয়। গ্রাহক মাসিক বা বার্ষিক নির্ধারিত ভাড়া এবং ব্যাংকের নিয়োজিত পুঁজির কিস্তি পরিশোধ সাপেক্ষে প্রকল্প, বাড়ি বা সম্পদ দখল ও ভোগ ব্যবহার করতে থাকে। ব্যাংকের পুঁজি যত পরিশোধ হয় সে অনুসারে সম্পদের ভাড়ার পরিমান কমতে থাকে। কিস্তি সম্পূর্ণ পরিশোধিত হলে গ্রাহক সম্পদের মালিকানা পায়।

২)হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্কঃ

যে পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে কোন স্থায়ী প্রকৃতির সম্পত্তি ক্রয় বা তৈরি করে গ্রাহক সম্পূর্ণ সম্পত্তি ব্যবহার করে এবং ব্যাংকের অংশের মালিক হতে থাকে, পাশাপাশি গ্রাহক ভাড়া পরিশোধ করতে থাকে এবং কিস্তির টাকা পরিশোধ হওয়ার সাথে সাথে ভাড়ার পরিমান ও কমতে থাকে। কিস্তির টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ হলে গ্রাহক পুরো সম্পত্তির মালিক হয়ে যায়।[৫৮]

---

[৫৮].ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর একুশ বছর পুর্তি সংখ্যা ঃ পৃঃ ৪৩০

Dhaka University Institutional Repository

৮.সার্বজনীন আদর্শ

সুদ মানুষকে শোষণের অর্থনৈতিক হাতিয়ার। সুদের প্রভাবে মানুষের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই দেখা দেয় তা নয় নৈতিক ও চারিত্রিক সর্বোপরি মানবিক বিপর্যয় ও সৃষ্টি করে। একদিকে সুদের নিষ্পেষণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্রমেই দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হতে থাকে। অপরদিকে পুঁজিপতি ধনীরা সুদ গ্রহণ করে আরো ধনী হতে এমন পর্যায়ে পৌছে যে সুদের নেশায় লোভাতুর হয়ে তার মধ্যে নৈতিক চারিত্রিক ও মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়।[৫৯] সুদ কখনোই কোন জাতি, গোষ্ঠীর জন্য মঙ্গলজনক নয়। সুদের অভিশাপ সকলের উপর আবর্তিত হয়। কোন বিষয় সার্বজনীন হতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর বিশ্লেষণ করতে হয় । তা হল ঃ

*এ বিধানের কোন ক্ষতিকর প্রভাব আছে কি?
*এ আইন সকলের জন্য মঙ্গলজনক কিনা ?
*এ বিধান প্রযোজ্য হলে কি প্রভাব পড়বে?
*জাগতিক সমস্যার কোন সমাধান হবে কিনা।
*অন্যান্য ধর্মে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে কিনা।

এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে, সুদের উপর আল-কুরআন এবং হাদীসের নিষেধাজ্ঞা অবশ্যই সকল জাতি, গোষ্ঠীর জন্য মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসবে। সুদ সমাজে ছড়িয়ে পড়লে যে কুফল হবে তা উপরে সুদের কুফল শিরোনামে আলোচিত হয়েছে।সুদের নিষেধাজ্ঞা সমাজে কার্যকর হলে সুদের অভিশাপ থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সকল শ্রেণীর লোকই উপকৃত হবে। আর সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা ও চলতে পারে। যার প্রমান স্বরূপ ইসলামী ব্যাংক পদ্ধতিকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেছি। ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচী ও সুদমুক্ত করা যেতে পারে। যেমন ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করে।ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি উপরে উল্লেখ করেছি। প্রথম অবস্থায় সুদ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সাময়িক সমস্যা দেখা দিতে পারে । কিন্তু পরবর্তী ফলাফল অত্যন্ত ভাল।জনগণ সুদ মুক্ত সমাজকে আশীর্বাদ জানাবে। পরকালে আল্লাহর সুদের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে।অন্যান্য ধর্মে এর বিরূপ প্রভাব পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কেননা অন্য ধর্মে ও সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই অন্যান্য জাতি ও এর সুফল ভোগ করবে। তাইতো বলব ইসলামে সুদের নিষেধাজ্ঞার বিধান সার্বজনীন।

---

[৫৯].মোঃ আনিছুর রহমান: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর একুশ বছর পুর্তি সংখ্যা পৃঃ ৪২৭

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

দারিদ্র্য বিমোচন

দারিদ্র্য বর্তমান বিশ্বে আলোচিত একটি অন্যতম সমস্যা। অর্থনৈতিক জীবনে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র , নিঃস্ব, অসহায় ও বঞ্চিত শ্রেণীর মৌলিক অধিকার হিসেবে জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান নিঃসন্দেহে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও দারিদ্র্য বিমোচনে দ্বীন ইসলামের পদক্ষেপ ও ভূমিকা সর্বোচ্চ ফলপ্রদ ও বাস্তবমুখী।[১]

বিশ্বের ১.৩ বিলিয়ন মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে। তাদের দৈনিক আয় মার্কিন ১ ডলারের নীচে এবং ২.৮বিলিয়ন মানুষের দৈনিক আয় মার্কিন ২ ডলারের নীচে। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য মোতাবেক বিশ্বের ১.২০ বিলিয়ন মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। বর্তমানে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের চিন্তার অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্ব দারিদ্র্য । তাই এই দারিদ্র্যের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির ভয়াবহ পরিণতির বিষয় অনুধাবন করে শুরু থেকেই জাতিসংঘ বিভিন্ন পদক্ষেপ, নীতি কৌশল, ঘোষণা অনুমোদন করেছে যাতে ক্রমবর্ধমান বিশ্ব দারিদ্র্য প্রবণতা রোধ এবং হ্রাস করা যায়।

কিন্তু ইতোপূর্বে গৃহীত পদক্ষেপগুলো দারিদ্র্য বিমোচনে তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ১৯৯৯ সালে বিশ্ব ব্যাংক ও আই এফ এম যৌথভাবে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোকে (বাংলাদেশসহ ৭০টি) দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে পোভারটি রিডাকশন স্ট্রাটেজি পেপার (পি আর এসপি) অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচনে কৌশলপত্র তৈরী করে। মুক্ত বাজারভিত্তিক এ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য হলো যে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল কেন্দ্র বিন্দু হবে দারিদ্র্য বিমোচন।[২]

ইসলাম দারিদ্র্য মুক্ত জীবন ব্যবস্থাকে সমর্থন করে। দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল পত্র প্রণয়ন করেছে। ভিক্ষা বৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যাকাত ভিত্তিক, সাম্য ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছে। সামাজিক ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। সমাজ থেকে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে ইসলাম বহু নীতিমালা

---

[১].আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ :ড.মোহাম্মদ জাকির হুসাইন পৃঃ৫৯

[২].ড. মুজিবুর রহমান খান: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর একুশ বছর পুর্তি সংখ্যা পৃঃ ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা করেছে।এরই প্রাসঙ্গিক আলোচনায় নিম্নোক্ত ধারাবাহিক বর্ণনার প্রয়াস পাব।

*১.দারিদ্র্য কি/সংজ্ঞাঃ
*২.দারিদ্র্য বিমোচন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ ঃ
*৩.বাংলাদেশে দারিদ্র্যের বর্তমান পরিস্থিতি ও বিমোচন কর্মসূচীঃ
*৪.ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত নীতিঃ
*৫.সার্বজনীন নীতি ঃ

*১.দারিদ্র্য কি/সংজ্ঞাঃ

দারিদ্র্য একটি আপেক্ষিক বিষয়। একে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। আভিধানিক অর্থে দারিদ্র্য বলতে অভাব বা অনটনকেই বুঝায়। দারিদ্র্য মানে মৌলিক সামর্থ্যে অভাব।নূন্যতম খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবসমূহ মৌলিক সামর্থ্যের অভাবের আওতায় পড়ে। বস্তুত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দরিদ্র হলো সে ব্যক্তি, যে তার আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার নূন্যতম মানও বজায় রাখতে পারে না। দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, মনীষিগণ বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমনঃ

***সমাজবিজ্ঞানী গিলিন ঃ**

সমাজবিজ্ঞানী গিলিন বলেন : যাদের জীবন যাত্রার মান তাদের সমাজ নির্ধারিত জীবন যাত্রার নিচে তারাই দরিদ্র।[৩]

***J.L Hanson :**

J.L Hanson বলেন ঃ দারিদ্র্যভূক্ত বলতে এমন ব্যক্তি বা দেশ বুঝায় যার সামান্য সম্পদ ও অল্প আয় রয়েছে, যার দ্বারা ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ।[৪]

***সমাজতত্ত্ববিধ বুথ ঃ**

সমাজতত্ত্ববিধ বুথ যিনি দারিদ্র্যকে অভাব ও বঞ্চনার মধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন।[৫]

***বি.সুবাই রাউনিট্রি ঃ**

*বি.সুবাই রাউনিট্রি বলেন, দারিদ্র্য হল স্বল্প আয় যা কিনা শুধুমাত্র প্রকৃত দক্ষতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনসমূহ অর্জনের জন্য অপ্রতুল।[৬]

---

[৩].সমাজ বিজ্ঞানী গিলিন

[৪].J.L Hanson, A Dictionary of Economics and Commerce, (London: 1975) P. 308

[৫].Charles Booth, Labour and life of the People in London, (London: 1902)

[৬].Seebohm Rowntree, Poverty and Progress, (London: 1941) P. 225.

Dhaka University Institutional Repository

*Rose Michael এর অভিমতঃ

দারিদ্র্যকে অনেকে জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের অভাব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৭]

*থিওডরসনের মতে, দারিদ্র্য প্রাকৃতিক , সামাজিক ও মানসিক উপোস।

*রবার্ট চেম্বার্সঃ

রবার্ট চেম্বার্স দারিদ্র্যকে জীবন ধারণের জন্য আয় এবং ব্যয়ের চৌহদ্দি থেকে আকস্মিক সংকটে পড়ার অবস্থা বা সম্ভাবনা, সম্পদ বিক্রি বা মন্দার সময় জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি পরাধীনতা, নিরাপত্তাহীনতা, ক্ষমতাহীনতা এবং একাকীত্বের অবস্থা পর্যন্ত বিস্তৃতি দিয়েছেন।[৮]

* Bangladesh Institute of Development Studies এর মতে ,

যাদের বার্ষিক গড় আয় ৯০০০ টাকার কম তারাই দরিদ্র্য।[৯]

* ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের উপর রিপোর্টে অটোয়া ভিত্তিক নর্থ-সাউথ ইনষ্টিটিউট দরিদ্রতা সম্পর্কে বলেছেনঃ

"Poverty is a state of economic, social and psychological deprivation occurring among people or countries lacking sufficient ownership, control or access to resources to maintain acceptable livings standards." [১০]

*প্রখ্যাত অধ্যাপিকা আয়েশা রোমানের মতে,

"সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দারিদ্র্য হচ্ছে মানবজীবনের সে স্তর যেখানে মানুষ জীবন ধারণের মৌল প্রয়োজনসমূহ পূরণে অক্ষম।"

*কেহ কেহ বলেনঃ Poverty is such an oppressive socio-economic condition where people can not meet the bare subsistence of living to depend on others for livelihood and to possess low status in the Society.

*বিশ্বব্যাংক এর মতে ঃ যদি কোন ব্যক্তির বার্ষিক আয় ৫০ মার্কিন ডলার বা তার কম হয় তবে সে দরিদ্র। কাজেই বলা যায় যে, যে পরিস্থিতির জন্য জনগণের বার্ষিক আয় এ ধরণের হয় সে পরিস্থিতিই হচ্ছে দারিদ্র্য।

প্রতিদিন জীবন ধারণের জন্য ২১২২ ক্যালোরী খাদ্য ও ৫৮ গ্রাম প্রোটিন জোগাতে অক্ষম জনগোষ্ঠীকে ধরা হয় দারিদ্র্যসীমার নীচে। আর ১৮০৫ ক্যালোরী খাদ্য ও কোনভাবে জোটাতে পারে না যে জনগোষ্ঠী, দারিদ্র্যসীমার চরম নিচে তাদের অবস্থান ।

৭.Rose Michael , The Relief of Poverty, (London: Macmillan, 1989)

৮.Robert Chambers, Poverty in India, Concepts, Research and Reality, (Delhi: Concept Publishing Co. 1996).

৯.BIOS Report -1999

১০.প্রিমিয়াম সাধারণ জ্ঞান ঃ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ঃ পৃঃ ১৩০

Dhaka University Institutional Repository

*ইসলামী দৃষ্টিকোণঃ

পবিত্র কুরআন ও হাদীস দারিদ্র্যকে দুটি স্তরে বিন্যাস করেছে।একটি চরম দারিদ্র্যসীমা যার মধ্যে পড়ে ফকীর ও মিসকীন। যাদের জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় নেই, যারা সর্বতোভাবেই নিঃস্ব, পথের ভিখারী, তারাই ফকীর।

আর মিসকীন হচ্ছে তারা, অভাব যাদের এখনো চরমে পৌছেনি, তবে আশু ব্যবস্থা না হলে রাস্তায় দাঁড়াতে যাদের বিলম্ব হবে না। সহীহ মুসলিম শরীফে আছে ঃ মিসকিনদের পরিচয়ে এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ-
১. যার ধনী হবার জো নেই, ২. দারিদ্র্য প্রকাশ পায় না বলে ভিক্ষাও জোটেনি, ৩. হাত পেতে কারো কাছে কিছু চায়ও না।
সূরা আল বাকারায় ফকীরদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون في الارض يحسبهم

الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس الحافا

১. তাদের আত্মমর্যাদার অবস্থা তো এই যে, অজ্ঞরা তাদের ধনী বলেই ভাবে। ২. আপনি শুধু তাদের চেহারা দেখেই ভেতরের অবস্থা আঁচ করে নিতে পারবেন।তারা কখনো কারো পেছনে লেগে কিছু চেয়ে ফিরে না। [১১]

*২.দারিদ্র্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ ঃ

পুঁজিবাদী অভিমতঃ

পুঁজিবাদীরা দারিদ্র্যকে জীবনের অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে বটে, তবে তাদের ধারণায় এটা ব্যক্তির ভাগ্যের পরিহাস। এ জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র মোটেই দায়ী নয়।ব্যক্তি তার অর্জিত সম্পদের পূর্ণ মালিক, এতে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের কোন অধিকার নেই। পুঁজিপতি তার সম্পদকে যে কোন পথে আয়-ব্যয়ের অধিকার সংরক্ষণ করে।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদঃ

সমাজতন্ত্রের মতে, সমাজের বিত্তবানদের ব্যক্তিগত সম্পদকে বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা যেতে পারে। তারা সমাজের বিভিন্ন সমস্যার জন্য ব্যক্তিমালিকানাকে দায়ী করেছে এবং ব্যক্তিমালিকানা নস্যাত করে সকল সম্পদ সরকারের হাতে সোপর্দ করেছে। ব্যক্তি মালিকানাকে উচ্ছেদকরণের মধ্য দিয়েই তারা সমাজের ধনী-দরিদ্র্যের বৈষম্য নির্মূল করতে চায়। [১২]

---

[১১].আলকুরআন :সূরা আল বাকারাহ: আয়াত নং ২৭৩

[১২].ডঃ ইউসুফ আল-কারযভী, মুশকিলাতুল ফাকরি ওয়া কাইফা আলজাহাল ইসলাম, (কায়রোঃ মাকতাবায়ে ওহাবা, ১৯৮৬ইং)সংস্করণ ৫ পৃঃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository

জাবরিয়াদের মতবাদঃ

জাবরিয়াদের মতে, ধনী-দরিদ্র স্রষ্টা নির্ধারিত অমোঘ বিধান, এতে মানুষের কোন হাত নেই। আল্লাহ পরীক্ষামূলকভাবে কাকেও ধনী, কাকেও গরীব বানিয়েছেন। দরিদ্রদের প্রতি তাদের নসীহত হলোঃ এটা তোমাদের প্রতি আল্লাহর বন্টন ব্যবস্থা, এতে সন্তুষ্ট থেকো, অধিক পাওয়ার ও একে পরিবর্তন করার চেষ্টা করো না।[১৩]

দুনিয়াবিমুখদের অভিমত ঃ

তারা দারিদ্র্যকে আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত ও আশীর্বাদ বলে মনে করে এবং পার্থিব স্বচ্ছলতাকে আল্লাহ-দ্রোহিতার কারণ বলে চিহ্নিত করে।তাদের মতে,দারিদ্র্য খারাপ কোন অবস্থা নয়, সমাধান করার মতোও কোন সমস্যা নয়। বরং তা আল্লাহর এক নিয়ামত যাতে বান্দা দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও আখেরাতের প্রতি অনুরাগী হতে পারে। আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং মানুষের প্রতি ভালবাসার উন্মেষ ঘটাতে পারে।[১৪]

ব্যক্তিগত অনুগ্রহ প্রদর্শন প্রবক্তাদের অভিমত ঃ

এ মতবাদে বিশ্বাসীগণ গরীব-মিসকীনদেরকে স্বল্পে তুষ্ট থাকার সাথে সাথে বিত্তবানদেরকে পরকালে উত্তম প্রতিদান পাবার আকাঙ্ক্ষায় নিঃস্বদের প্রতি দানের হাত সম্প্রসারণে উৎসাহিত করে থাকে । ধনীদের সম্পদে যে গরীবদের সুনির্দিষ্ট হক আছে যা আদায় করা কর্তব্য — এ ধারণা তারা পোষণ করে না।[১৫]

*৩.বাংলাদেশে দারিদ্র্যের বর্তমান পরিস্থিতি ও বিমোচন কর্মসূচীঃ

দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি । মোর অধিকার
আনন্দের নাহি -নাহি ।[১৬]

আমদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সুবিখ্যাত দারিদ্র্য কবিতায় উপরি উক্ত পংক্তিগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাক্তি ও সমাজ জীবনের দারিদ্র্যের ভয়াবহ রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। দারিদ্র্য ব্যক্তি জীবনের সুখ-শান্তি ও আনন্দ, নষ্ট করে, মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। বৃহত্তর সমাজ জীবনে ও জাতীয় জীবনে দারিদ্র্য উন্নতির পথ রুদ্ধ করে এবং পরিণামে হতাশা, ক্ষোভ বিশৃঙ্খলা অপরাধ ও বিদ্রোহ আনায়ন করে ।

১৩.ডঃ ইউসুফ আল-কারযভী, মুশকিলাতুল ফাকরি ওয়া কাইফা আলজাহাল ইসলাম: প্রাগুপ্ত ; পৃঃ ৭

১৪.প্রাগুপ্ত :পৃঃ ৬

১৫.প্রাগুপ্ত: পৃঃ ১২

১৬.দারিদ্র্য কবিতা : কবি কাজী নজরুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দারিদ্রতা মানব জীবনের এক চরম অভিশাপ।

*কবি সুকান্ত যথার্থই বলেছেন-

"ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

জ্যোৎস্নালোকের মত স্নিগ্ধ ও পবিত্র প্রেম-ভালবাসা দারিদ্র্যতার চরম কষাঘাতে বিতাড়িত হয়।

বাংলাদেশ একটি গ্রাম প্রধান কৃষিভিত্তিক দেশ। শিল্প ক্ষেত্রে এখনও শৈশব অবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্য ও খুবই অনুন্নত। সম্পদ সীমিত এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে পীড়িত। ক্ষুধা ও দরিদ্রতা এর নিত্যসঙ্গী। শিল্প-স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবন-যাত্রার মান সব দিক থেকেই বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। আমাদের এ অনগ্রসরতার কারণ দারিদ্র্য। বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ বাস করে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত এশিয়া-আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলোতে এদের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থা সবচেয়ে বেশি শোচনীয়।

*দারিদ্র্যের প্রকারভেদঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতামত অনুযায়ী দারিদ্র্য ৩ প্রকার যথাঃ

- স্বাভাবিক দারিদ্র্য
- চরম দারিদ্র্য এবং
- আপেক্ষিক দারিদ্র্য।

স্বাভাবিক দারিদ্র্য ঃ

প্রতিদিন জনপ্রতি ২১২২ কিলোক্যালোরি গ্রহণকে স্বাভাবিক দারিদ্র্য সীমা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

চরম দারিদ্র্যঃ

প্রতিদিন জনপ্রতি ১৮০৫ কিলোক্যালোরি গ্রহণকে চরম দারিদ্র্য সীমা বলা হয়।

আপেক্ষিক দারিদ্র্যঃ

এটা এক ধরণের মানসিক অবস্থা। মানুষ চায় অন্যের তুলনায় উন্নত জীবন-যাপন করতে। কিন্তু এটা করতে না পারাটাই আপেক্ষিক বা Relative poverty.

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতিঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মূল উজ্জীবনী শক্তি ছিলো বৈষম্য সচেতনতা। স্বাধীনতা পরবর্তী বিধ্বস্ত অর্থনীতি নিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির কঠিন যাত্রা শুরু। স্বাধীনতা পরবর্তী বছরগুলোতে দেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে জনসংখ্যার পরিমান ছিলো ৭৫ ভাগ। আশানুরুপ না হলেও সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে দারিদ্র্যের এ সীমা ২০০০ সালে নেমে এসেছে ৫০ ভাগের কাছাকাছি।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০০ জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে দৈনিক মাথাপিছু ২১২২কিলোক্যালোরি গ্রহণ পরিমাপে ২০০০ সালে পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৪২.৩ শতাংশ ছিল দারিদ্র্যসীমার নীচে এবং দৈনিক ১৮০৫ কিলোক্যালোরি গ্রহণ পরিমাপে ১৮.৭ শতাংশ ছিল চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে। ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে গ্রামাঞ্চলে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল ৩৬.৭ শতাংশ এবং ২০০০ সালে তা নেমে আসে ১৮.৭ শতাংশে। অপরদিকে ২০০০ সালে শহরাঞ্চলে ৫২.৫ শতাংশ দারিদ্র্য এবং ২৫.০ শতাংশ চরম দারিদ্র্য বিরাজমান ছিল। ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে তা ছিল যথাক্রমে ৬৭.৭ শতাংশ এবং ৩৭.৪ শতাংশ। পক্ষান্তরে ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে ৬২.৬ শতাংশ দারিদ্র্য এবং ৩৬.৮ শতাংশ চরম দারিদ্র্য বিরাজমান ছিল। ২০০০ সালে তা নেমে আসে যথাক্রমে ৪৪.৩ শতাংশ ও ২০.০ শতাংশে। নিচে বিগত কয়েক বছরের বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি সারণি[১৭] আকারে উপস্থাপন করা হলোঃ

দারিদ্র্যের ধরণ		১৯৮৩-৮৪	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৮-৮৯	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	২০০০
দারিদ্র্য	জাতীয়	৬২.৬	৫৫.৭	৪৭.৮	৪৭.৫	৪৭.৫	৪৪.৩
	পল্লী	৬১.৯	৫৪.৭	৪৭.৮	৪৭.৬	৪৭.১	৪২.৩
	শহর	৬৭.৭	৬২.৬	৪৭.৬	৪৬.৭	৪৯.৭	৫২.৫
চরম দারিদ্র্য	জাতীয়	৩৬.৮	২৬.৯	২৮.৪	২৮.০	২৫.১	২০.০
	পল্লী	৩৬.৭	২৬.৩	২৮.৬	২৮.৩	২৪.৬	১৮.৭
	শহর	৩৭.৪	৩০.৭	২৬.৪	২৬.৩	২৭.৩	২৫.০

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, ২০০৩ সালে দেশের দারিদ্র্যের পরিমান ছিল; ৩৩.৭ শতাংশ। নিম্ন দারিদ্র্যের পরিমান;৩৩.৭ শতাংশ। শহরে :১৯.১% গ্রামে : ৩৭.৪% মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরি গ্রহণ (২০০০ সালে জাতীয়) : ২২৪০.৩; পল্লীতে ২২৬৩.২ এবং শহরে ২১৫০.০ মানব দারিদ্র্য সূচক (১৯৯৮-২০০০): ৩৪.৮ [১৮]১৮ ২০০৪সালে দরিদ্র ও চরম দারিদ্র্যের শতকরা হার যথাক্রমে ৪৯.৮০% এবং ৩৩.৩৭% সর্বোচ্চ দারিদ্র্যের হার : রাজশাহী বিভাগে ৪৬.৭৫% সর্বনিম্ন দারিদ্র্যের হার চট্টগ্রাম বিভাগে ২৫%। [১৯]

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীতে ২০০৪ সালে প্রত্যাশিত আয়ু , বয়স্ক স্বাক্ষরতার হার ও ক্রয় ক্ষমতা সমন্বিত প্রকৃত মাথাপিছু আয়, মোট দেশজ

---

[১৭] .বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরিপ, ২০০০ (প্রাথমিকপ্রতিবেদন)

[১৮] .বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩

[১৯] .বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদন- এ তিনটি বিষয়কে মানদন্ড করে ১৭৭ টি দেশের মানব উন্নয়নসূচক চিত্র তুলে ধরেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৮ তম। জাতিসংঘের এ রিপোর্ট হতে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের প্রকৃতি বোঝা যায়।

দারিদ্র্যের প্রকারভেদ অনুযায়ী স্বাভাবিক ও চরম বাংলাদেশের দারিদ্র্যের প্রকৃতি (শহর ও গ্রামের) একটি ছকের [২০]
মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

সাল	এলাকা	প্রকার ভেদ	শতাংশ
১৯৯৫-৯৬	শহর	স্বাভাবিক	৪৯.৭
	গ্রাম		৪৭.১
	শহর	চরম	২৭.৩
	গ্রাম		২৪.৬
১৯৯৮-৯৯	শহর	স্বাভাবিক	৪৪.৯
	গ্রাম		৪৩.৩
	শহর	চরম	৪৭.৯
	গ্রাম		৪৪.৪
২০০০-২০০১	শহর	স্বাভাবিক	৪৩.২
	গ্রাম		৪২.৯
	শহর	চরম	৪৯.৮
	গ্রাম		৪৮.৩

সারণির তথ্য বিশ্লেষণে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্য পরিস্থিতির ক্রমাগত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এ দেশের দারিদ্র্যের হার খুব ধীরে হলে ও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। তবে অঙ্ক যা-ই বলুক, এখনো বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত। তাদের সংখ্যা যত দ্রুত কমা উচিত ছিল তা কমেনি। প্রবৃদ্ধির হার মোটামুটি ভালো হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যের হার দ্রুত কমেনি। এর প্রধান কারণ বাংলাদেশের ধনী-দরিদ্র্যের সম্পদের ব্যবধান দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া।

ধনী-গরীবের বৈষম্য বৃদ্ধি:

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেলেও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এর সুফল ভোগ করতে পারছে না। দেশে ধনী আরো ধনী এবং গরীব আরো গরীব হচ্ছে। অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত

---

[২০]BIDS রিপোর্ট /১৯৯৬,১৯৯৯,২০০১

Dhaka University Institutional Repository

'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩'-এ এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে দেখা যায়, ১৯৯৫-৯৬ সালে দেশের সর্বোচ্চ ধনী মাত্র ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ছিল মোট জাতীয় আয়ের ২৩.৬২ শতাংশ। মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় ২০০০ সালে তা বেড়ে হয় ৩০.৬৬ শতাংশ।

অপরদিকে ১৯৯৫-৯৬ সালে দেশের সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ছিল মোট জাতীয় আয়ের ০.৮৮ শতাংশ । ২০০০ সালে তা আরো কমে ০.৬৭ শতাংশে নেমেছে। অর্থাৎ সবচেয়ে গরিব জনগোষ্ঠীর আয় কমেছে প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৪শতাংশ)। সবচেয়ে ধনী এ পরিবারগুলোর পরে যারা আছে , সেই ৯৫ শতাংশ মানুষের আয় গত পাঁচ বছরে ৭ শতাংশ কমে ৭৬ শতাংশ থেকে ৬৯ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে সর্বোচ্চ ধনী ৫ শতাংশের আয়ের পরিমান ছিল সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশের আয়ের তুলনায় ২৭ গুণ বেশি। ২০০০ সালে তা বেড়ে ৪৬ গুণ হয়েছে। সমীক্ষার তথ্যে দেখা যায়, সবচেয়ে গরিবদের মধ্যে ও শহর-গ্রামের বৈষম্য বেড়েছে। শহরের চেয়ে গ্রামীণ গরিবদের আয় কমেছে অনেক বেশি হারে । নিচে ধনী ও গরিব পরিবারের আয়ের বৈষম্যের চিত্রটি সারণি আকারে উপস্থাপন করা হলো ঃ

জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন (শতাংশ) [২১]

সাল	১৯৯৫-৯৬	২০০০
সর্বাধিক ৫%ধনীপরিবার	২৩.৬২%	৩০.৬৬%
অবশিষ্ট ৯৫%পরিবার	৭৬.৩৮%	৬৯.৩৪%
সর্বাধিক দরিদ্র ৫%পরিবার	০.৮৮%	০.৬৭%

মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি অনুসারে বিভাগওয়ারী দারিদ্র্যের হার (মাথা-গণনার অনুপাত) [২২]

জাতীয়/বিভাগ	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে			উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয়	৩৩.৭	৩৭.৪	১৯.১	৪৯.৮	৫৩.১	৩৬.৬
বরিশাল	২৮.৮	২৯.৬	১৯.৫	৩৯.৮	৪০.০	৩৭.৯
চট্রগ্রাম	২৫.০	২৫.৩	২৩.৩	৪৭.৭	৪৮.৪	৪৪.০
ঢাকা	৩২.০	৪১.৭	১২.০	৪৪.৭	৫২.৯	২৮.২
খুলনা	৩৫.০	৩৬.৮	২৭.৫	৫১.৪	৫২.২	৪৭.১
রাজশাহী	৪৬.৭	৪৮.৮	৩২.৩	৬১.০	৬২.৮	৪৮.১

[২১]. দৈনিক প্রথম আলো ,১০ সেপ্টেম্বর ,২০০৩

[২২]. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ : ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতবিদগণ মনে করেন ,

দীর্ঘদিন যাবৎ জাতীয় আয় বন্টনের ক্ষেত্রে গরিব জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত রাখা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে গ্রামাঞ্চলকে উপেক্ষা করাই এ বৈষম্য বৃদ্ধির কারণ। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার দারিদ্র্য বিমোচনের বাহারি কর্মসূচি এ ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। শহরগুলোতে এক শ্রেণীর মানুষের ভোগবিলাসের পাশাপাশি সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাহীন জীবনযাপন প্রকটভাবেই এ বৈষম্যের বিষয়টি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

*সমাজে দারিদ্র্যের প্রভাবঃ

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ বর্তমানে দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত হবার কারণে এ দেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে দারিদ্র্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা দারিদ্র্যের প্রভাবমুক্ত। এ দেশের প্রতিটি সমস্যার সাথেই দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে দারিদ্র্যের বিরূপ প্রভাবের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো নিচে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

১.দারিদ্র্যের ব্যাপকতার ফলে দেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী অন্ন, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদনসহ তাদের জীবনের কোনো মৌলিক চাহিদাই সঠিরভাবে পূরণ করতে পারছেনা ।

২.'যত মানুষ তত রোজগার'-এ ধারণার বশবর্তী হয়ে দরিদ্র জনগণ অধিক সন্তান জন্ম দেয় বলে দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.দাম্পত্য কলহ, পারিবারিক ভাঙন, আত্মহত্যা, যৌতুকপ্রথা, পতিতাবৃত্তি, অপরাধপ্রবণতা প্রভৃতি দারিদ্র্যের কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪.দারিদ্র্যের ব্যাপকতার কারণেই বাংলাদেশে কৃষিখাত ,ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ভারী শিল্পসহ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উন্নতি ঘটছে না।

৫.দারিদ্র্যের প্রভবে দেশে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বার্ধক্য,অকালমৃত্যু, অন্ধত্ব, দুর্বলতা, অসুস্থতা প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬.দারিদ্র্যের প্রভাবে দেশে সামাজিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শ্রমিক অসন্তোষ, যুব অসন্তোষ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, হরতাল, ধর্মঘট প্রভৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭.দারিদ্র্যের কারণে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারায় দেশে বেকারত্বের হার বেড়েই চলছে।

৮.দারিদ্র্যের প্রভাবে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় অগ্রগতি অর্জন করা যাচ্ছে না ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারনঃ

বাংলাদেশের দারিদ্র্যের ব্যাপকতার জন্য কোনো একক কারণ দায়ী নয় বরং বহুবিধ কারণেই এ দেশে দারিদ্র্য ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিস্তারের কারণগুলোর অন্যতম হলোঃ

১.অনগ্রসর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ঃ

বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত ও প্রাচীনপন্থী। ফলে কৃষি উৎপাদনের কম এবং অধিকাংশ কৃষকই থাকে দরিদ্র।

২.অনুন্নত শিল্প ব্যবস্থা ঃ

অনুন্নত শিল্প ব্যবস্থা বাংলাদেশের দরিদ্রতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। মূলধনের স্বল্পতা উদ্যোক্তার অভাব। দক্ষ জনশক্তির অভাব প্রভৃতির কারণেই শিল্প অনুন্নত। শিল্প অনগ্রসর বলে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই কম। ফলে দরিদ্রতা ও বেকারত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.অনুন্নত ও ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

বৈষম্যমূলক-ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা দরিদ্রতাকে আরো প্রসারিত করছে। প্রচীন শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান ও কর্মমূখী শিক্ষার অভাব ও দরিদ্রতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে।

৪.জনসংখ্যা স্ফীতি ঃ

এ টি বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। বর্ধিত জনসংখ্যা দরিদ্রতাসহ আরো বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করছে।

৫.উৎপাদনের স্বল্প ঃ

কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদন খুবই কম। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অভাব মানুষের দরিদ্রতাকে আরো বৃদ্ধি করছে। অধিকাংশ মানুষের পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় অভাবগুলো পূরণ করা সম্ভব হয় না এর কারণ ও দরিদ্রতা।

৬.ত্রুটিপূর্ণ ভূমিস্বত্ব-প্রথাঃ

এ ব্যবস্থার ব্যাপক ত্রুটি ও বৈষম্য থাকায় বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই ভূমিহীন। পরের জমি চাষ করে। ফসল বন্টনেও কৃষকরা বরাবরই শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়।ফলে তাদের পক্ষে দরিদ্রতা কাটিয়ে উঠে সম্ভব হয় না।

৭.দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রঃ

এটি বাংলাদেশের দরিদ্রতার জন্য একটি মৌলিক কারণ। উৎপাদন, বন্টন, বিনিয়োগ, মূলধন গঠন, সঞ্চয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র সর্বদা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

৮.প্রাক-ঐতিহাসিক কারণঃ

আমাদের দেশ সুদীর্ঘকাল ইংরেজরা শাসন করে তারা এ দেশকে নিজেদের পুঁজি ও ভোগের ক্ষেত্রে পরিণত করে ব্যাপকভাবে শোষণ করে ।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও পাকিস্তানিদের শোষণ পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প স্থাপন এ দেশের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের মানুষ দরিদ্রতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

৯.প্রাকৃতিক দুর্যোগঃ

বাংলাদেশের প্রতি বছরই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস,নদী-ভাঙ্গন, প্রভৃতি কারণে বিপুল পরিমানে সম্পদ ও ফসল ধ্বংস হয় এবং লোকজন হয় গৃহহারা নিঃস্ব ও সহায় সম্বলহীন। শস্যহানী-সম্পদ ধ্বংস লোকজনের ক্ষতি জাতীয় পর্যায়ে দরিদ্রতাকে বৃদ্ধি করে।

১০.নিরক্ষরতা ও অন্ধতাঃ

দরিদ্রতার জন্য নিরক্ষরতা ও অন্ধতা বহুলাংশেই দায়। নিরক্ষর মানুষ নিজেদের ভালমন্দ বুঝে না এবং তারা জীবন জীবিকা অর্জনের ও দক্ষ হয় না ফলে তারা দরিদ্রই রয়ে যায়।

১১.মহিলাদের কর্মসংস্থানের অভাবঃ

মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকই মহিলা । কিন্তু বাংলাদেশের মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই কম। সুতরাং এর ফলে বিপুল সংখ্যক মহিলা পরিবারের বোঝা স্বরূপ ও দরিদ্রতাকে বৃদ্ধি করছে।

১২.প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহারঃ

বাংলাদেশে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও নানাবিধ কারণে তার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না । ফলে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কম হচ্ছে এবং পরোক্ষভাবে দরিদ্রতা বৃদ্ধি করছে।

১৩. ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি ঃ

আমাদের দেশে রপ্তানির তুলনায় আমদানির পরিমান অতিমাত্রায় বেশি হওয়াতে বাণিজ্য ঘাটতি ব্যাপক । এ বাণিজ্য ঘাটতি পূরণ করতে জনগণের দরিদ্রতা আরো বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত কারণ ছাড়াও বেকারত্ব দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি, ধর্মান্ধতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের দরিদ্রতা সমস্যাটি প্রকট হচ্ছে।

* দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহঃ

বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বৃদ্ধিসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যাতে দারিদ্র্য লাঘব এবং টেকসই উন্নয়ন হয়, সেজন্য তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সাথে মাথাপিছু আয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার। পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন অকৃষি খাতসহ শহর অঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রয়োজন।বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি (এনজিও)পর্যায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী রয়েছে। এসকল কর্মসূচী দরিদ্র

Dhaka University Institutional Repository

জনগোষ্ঠীর উৎপাদন স্বত্ব বৃদ্ধির সাথে তাদের ক্ষমতায়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।সরকারি পর্যায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা যথা-কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় , মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, যুবও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, (বিআরডিবি) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর , বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা ইত্যাদির দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী রয়েছে ।

এ ছাড়া সরকারের গৃহীত কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিডি কর্মসূচী, গ্রামীণ সড়ক/অবকাঠামো নির্মান/ রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। অপরদিকে শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচী যথা- শিক্ষার জন্য খাদ্য, বিশেষ বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সরাসরি শিক্ষার ব্যয়ভার লাঘব করছে। সমাজকল্যাণ, নারী ক্ষমতায়ন, শিশু অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমানে সচেতনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নত জীবনযাপনে উৎসাহিত করছে।

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীঃ

বাংলাদেশ সরকার দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলঃ

১.নিরপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিঃ

২০০২-২০০৩ সালের অর্থবছরে

কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) ৪৫১.০০ কোটি টাকা। জিআর (Gratuitious)এবং টিআর (Test Relief)=২০৪.০৪কোটি টাকা ভিজিডি (Vulnerable Group Development) ২৪০.৬৯ কোটি টাকা ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding)১০৮.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।[২৩]

২০০৫-০৬অর্থ বছর ঃ

কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা), জিআর(Gratuitious)এবং টিআর (Test Relief) ভিজিডি (Vulnerable Group Development) ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding)এ সকল খাতে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৮ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ১ লক্ষ ৩২ হাজার টনের প্রস্তাব করা হয়েছে।[২৪]

---

২৩. ২০০৩-০৪অর্থ বছরের বাজেট

২৪. সূত্র ঃ অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা:দৈনিক ইনকিলাব : ১০ জুন , ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

চরম দারিদ্র্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সরবরাহ এবং তাদের আয় বর্ধনকারী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রতি বছর রাজস্ব বাজেট থেকে সম্পদের সংস্থান করছে।

এ লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর থেকে ২০০১-২০০২ অর্থবছরের মাঝে যে পরিমাণ সম্পদ কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) জিআর (Gratuitious)টিআর (Test Relief) ভিজিডি (Vulnerable Group Development) ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding) ইত্যাদি কর্মসূচি বাবদ ব্যয় করেছে তার বিবরণ নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলোঃ

নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি[২৫] কোটি টাকায়

কর্মসূচি	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০	২০০০-০১	২০০১-০২
১.কাবিখা	৫৫৮.৫৩	৮১০.৮১	৮৩৬.০০	৭১৫.৫৮	৮০৬.০০	৮৮৫.০০	৭০৫.০০
২.জিআর ওটিআর	৪০০.৭৬	২৫৬.১০	২৫৮.৭১	২১০.২৩	২৭২.০০	১৯৯.০০	২৪৮.০০
৩.ভিজিডি	০	২১৫.২৭	২২৫.০৯	২০৮.৯০	২২৮.০০	২৩৬.০০	২৪৩.০০
৪.ভিজিএফ	০	০	৭৬.২৪	৫৮৪.৮১	২২৯.০০	২৯৭.০০	১৩১.০০
৫.স্কুল ফিডিং	০	০	১.০২	০	—	০	০
৬.অন্যান্য	১.৭৪	১৫.২৪	০.৫১	৬৫.৮৮	১.০০	০	০
মোট	৯৬১.০৩	১২৯৭.৪২	১৩৯৭.৫৭	১৭৮৫.৪০	১৫৩৬.০০	১৬১৭.০০	১৩২৭.০০
প্রবৃদ্ধি	-১২.৬৫%	৩৫.০০%	৭.৭২%	২৭.২৫%	-১৩.৯৬%	৫.২৭%	-১৭.৯৩%
জিডিপি	১৬৬৩২৪.০	১৮০৭০১.৩	২০০১৭৬.৬	২১৯৬৯৭.২	২৩৭০৮৫.৬	২৫৩২৫৪.৭	২৭১১২৪
মোট/জিডিপি	০.৫৮%	০.৭২%	০.৭০	০.৮১%	০.৬৫%	০.৬৪%	০.৪৯%

২০০৫-০৬ অর্থ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নুতন দুটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।তা হলোঃ

***অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতাঃ**

সম্পূর্ণভাবে অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জীবন ধারণে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে মাসিক ২০০ টাকা হারে ১ লক্ষ ৪ হাজার প্রতিবন্ধীকে ভাতা প্রদানের কর্মসূচি জুলাই ২০০৫ থেকে শুরু করা হবে। এ লক্ষ্যে অত্র বাজেটে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। (প্রস্তাবিত অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা)[২৬]

---

[২৫].বিভিন্ন অর্থবছরের বাজেট সমূহ।

[২৬].সূত্র ঃ অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা:দৈনিক ইনকিলাব ১০ জুন ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িক বেকারত্ব মোচন তহবিলঃ

দেশের নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলের প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাঁরা প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক এবং ভৌগলিক কারণে বছরের কিছু সময় কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন তাদের দুঃখ-দুর্দশার লাঘব এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি রাজস্ব বাজেটে একটি তহবিল সৃষ্টি করে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।(প্রস্তাবিত অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা)[২৭]

২.আবাসন প্রকল্পঃ

গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন, গৃহহীন , দুস্থ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৫০ হাজার পরিবারকে পুর্ণবাসনের লক্ষ্যে সরকার ৪৪৭.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এটি বাস্তবায়ন হলে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

৩.দারিদ্র্য বিমোচন ও ছাগল উন্নয়ন প্রকল্পঃ

ছাগল পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দারিদ্র্য বিমোচন ও ছাগল উন্নয়ন শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ছাগল পালনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হবে। ২১৭.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

৪.বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি ঃ

দেশের প্রায় পতিটি ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে দশজন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও দরিদ্র ব্যক্তিকে মাসিক একশত টাকা হারে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এতে দেশের চার লক্ষাধিক দরিদ্র বয়স্ক ব্যক্তি উপকৃত হচ্ছে।(২০০৪-০৫)অর্থ বছরঃ বয়স্ক ভাতা : জনপ্রতি ১৬৫ টাকা
বয়স্ক ভাতা ভোগকারীঃ ১০ লাখ।
(২০০৫-০৬)অর্থ বছরঃ বয়স্ক ভাতা : জনপ্রতি ১৮০ টাকা
বয়স্ক ভাতা ভোগকারী ঃ ১৫লাখ। (প্রস্তাবিত অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা)[২৮]

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় /অধিদপ্তর সার্বিভাবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে।

৫.গৃহায়ন তহবিলঃ

দারিদ্র্য বিমোচনে নির্দিষ্ট কর্মসূচি হিসেবে গৃহহীন , দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর গৃহায়নের জন্য গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যে ৩৩,০৫০টি গৃহ নির্মানের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে

---

[২৭].সুত্র ঃ অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা:দৈনিক ইনকিলাব ; ১০ জুন ২০০৫

[২৮].সুত্র ঃ অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা:দৈনিক ইনকিলাব ; ১০ জুন ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

দেশের প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৫০ জন লোক উপকৃত হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে ৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪অর্থ বছরে বরাদ্দ ৯৮.০০কোটি টাকা।

৬. কর্মসংস্থান ব্যাংক ঃ

দেশের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের বিভিন্ন লাভজনক ও উৎপাদনমুখী খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কাজ শুরু করেছে। এ ব্যাংকের কার্যক্রমের ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে তাঁত, হাঁস-মুরগীর পালন, দুগ্ধ খামার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৭.দুস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচিঃ

অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্ত দুস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি চালু আছে। এ প্রকল্পের অধীনে বর্তমানে ২ লক্ষাধিক দরিদ্র, দুস্থ, অসহায়, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে মোট ৪৬১ টি উপজেলার ৪৪৭৯ টি ইউনিয়নে ৪ লক্ষ অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাকে ভাতা দেয়া হয়েছে। জুলাই ২০০২ ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪৪৮৮ টিকে উন্নীত করা হয়েছে।

২০০৫-২০০৬অর্থ বছরঃ মাসিক ভাতার পরিমানঃ ১৬৫ টাকা থেকে ১৮০ টাকা এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ঃ ৬ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ ২৫ হাজার উন্নীত করণ (প্রস্তাবিত অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা)[২৯]

৮. দরিদ্র ও অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য গৃহায়ন কর্মসূচিঃ

এ কর্মসূচির আওতায় ৬ টি বিভাগীয় শহরে ৬ টি শান্তি নিবাস স্থাপন করা হচ্ছে, যার প্রতিটিতে ১০০ জন অসহায় ষাটোর্ধ বয়সের মানুষ বসবাস করবে। তারা সেখানে পর্যাপ্ত খাদ্য, কাপড়, চিকিৎসা ও বিনোদন সুবিধাসহ সুস্থ থাকার প্রশিক্ষণ পাবেন।

৯. আশ্রায়ন প্রকল্পঃ

দেশের ছিন্নমূল তথা গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য আত্মকর্মসংস্থান ও গৃহায়নের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আশ্রায়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ৩০০ কোটি টাকার এ প্রকল্পের আওতায় ৫০,০০০ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে আশ্রয়দানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

---

[২৯] .সূত্র ঃ অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা:দৈনিক ইনকিলাব ১০ জুন ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে সরকার এবং এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীঃ

গত ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে প্রধান প্রধান এনজিও সমূহ প্রায় ১ কোটি ৯৭ লাখ সুবিধাভোগীর মধ্যে প্রায় ৩১ হাজার ৬২৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। ক্ষুদ্র ঋণ গৃহীতার কাছ থেকে এনজিও সমূহ আদায় করেছে প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা। দেশে প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা ভোগীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি হলে পরোক্ষভাবে উপকারভোগীর সংখ্যা আরও বেশী।

এ পল্লীর দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিওদের পাশাপাশি সরকার ১৯৯০ সাল থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাইন্ডেশনের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করেন। গ্রামীন ব্যাংক গত এপ্রিল ২০০৫ ইং সাল পর্যন্ত ১৪৫৬ টি শাখার মাধ্যমে ৬৩ টি জেলায় ৪৩৩ টি উপজেলায় প্রায় সাড়ে ৪৩ লাখ সদস্যের মধ্যে ২২ হাজার ৫১৭ কোটি ঋণ বিতরণ করে। এ সময় ঋণের বিপরীতে আদায় করেছে ২০ হাজার ৩৮২ কোটি টাকা। ২০০৪ সাল পর্যন্ত দেশে প্রায় ৭২০ টি এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ১কোটি ৪৬ লাখ প্রায়। এর মধ্যে ২৫ লাখ পুরুষ এবং ১ কোটি ২৫ লাখ মহিলা।

৩১ডিসেম্বর ২০০৫ ইং এ সকল এনজিও প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। আদায় হার ৯৭.১৭%। এছাড়া সরকার কর্তৃক ১৯৯০ সালে ক্ষুদ্র ঋণের কার্যক্রমের মাধ্যম দারিদ্র্য বিমোচন পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন গঠন করেন। ফাউন্ডেশনটি ২৩০ টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২ হাজার ৯১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেন। মাঠ পর্যায় ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৫৩ লাখ ৯৬ হাজার। মহিলা প্রায় ৪৯ লাখ।[৩০]

সরকার গ্রামে বসবাসকারী মানুষের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ২০০৩-২০০৪ সালের বাজেটে ৪ হাজার ৩শ ৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এর মধ্যে বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্য বিমোচনে মুখ্য হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত ক্ষুদ্র ঋণ খাতে ৩শ ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ বরাদ্দ থেকে বেকার যুবক, ক্ষুদ্র কৃষক, গরীব মুক্তিযোদ্ধা এবং দুস্থ নারীদের প্রশিক্ষণ পূর্বক ঋণদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এ ঋণ প্রদানের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে ২ শত কোটি টাকা, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়কে ৩০ কোটি টাকা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে ২৫ কোটি টাকা এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দেশে কর্মরত এনজিওগুলোর ক্ষুদ্র ঋণ

---

৩০. সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক : ২০ জুন ২০০৫ ইংরেজী

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচীকে গতিশীল করার উদ্দেশ্যে একটি আলাদা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা।

২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার জন্য দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) এর আওতায় বিশ্ব ব্যাংক ও আইএম এফ কর্তৃক জুন ২০০৩ মাসে ১০২ কোট টাকা মার্কিন ডলার ঋণ মঞ্জুর করা হয়। বিশ্ব ব্যাংকের মঞ্জুরিকৃত ৫৩ কোট ডলারের মধ্যে ৩০ কোটি ডলার সরাসরি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যয় হবে এবং বাকী অর্থ সড়ক ও অন্যান্য খাতে ব্যয় করা হবে।[৩১]

***দারিদ্র্য বিমোচনের একটি জরীপঃ**

সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকের খবরে বলা হয়েছে, বর্তমান অর্থবছরে আমরা দারিদ্র্য বিমোচনে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করতে সফল হয়েছি। ২০০৪-০৫অর্থ বছরে দেশের গরিব মানুষ নগদ অর্থ সাহায্য হিসেবে পেয়েছে ২ হাজার ৫ শত কোটি টাকা। একই সাথে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে সরকারী ও বেসরকারি খাত থেকে বিতরণ করা হয়েছে ৫০ হাজার কোটি টাকা।এ ঋণের অর্থ এখন আবর্তিত হচ্ছে।এ সময় গরিব মানুষের মাথাপিছু আয় ও ব্যয় বেড়েছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়।

প্রাপ্ত পরিসংখান অনুযায়ী ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে গরিব মানুষের মাথাপিছু মাসিক আয় দাড়িঁয়েছে ৬৩১ টাকা । ১৯৯১ সালে এর পরিমান ছিল ৬০২ টাকা । অপরদিকে ১৯৯৯ সালে গরিব মানুষের মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ছিল ৪৪৬ টাকা। ২০০৪ সাল তা বেড়ে দাড়াঁয় ৪৮২ টাকায়।১৯৯৯ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৬.২ শতাংশ । ২০০৪ সালে তা কমে ৪০.৯ শতাংশে দাড়িয়েঁছে।১৯৯৯ সালে গরিব রোগীর শতকরা হার ছিল ১৭.৪ শতাংশ । ২০০৪সালে তা কমে দাঁড়ায় ১৫.৩ শতাংশ।[৩২]

*৪.ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত নীতিঃ

মানব সভ্যতার বিজ্ঞানের এ বৈপ্লবিক যুগে দারিদ্র্যতা শুধু উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধকই নয় বরং এটা এক চরম অভিশাপ । এ থেকে মুক্তির সন্ধানে বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদগণ, বৈজ্ঞানিকগণ অসংখ্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রাত দিন অবিরাম গবেষণায় লিপ্ত রয়েছেন।আর আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বেও মানবতার মুক্তির কান্ডারী বিশ্ব নবী (সঃ) দারিদ্র্য বিমোচনের নীতিগত কৌশল প্রণয়ন করেছেন। ইসলাম দারিদ্র্যের বিপরীতে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। মহানবী (সঃ) বলেনঃ

---

৩১ .ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর ২১ বছর পুর্তি সংখ্যা ; পৃঃ ২০৮

৩২ .দৈনিক নয়া দিগন্ত ;১৫/৫২০০৫ ইং

Dhaka University Institutional Repository

"দারিদ্র্য মানুষকে কাফির বানিয়ে দিতে পারে।" [৩৩]

এ জন্য তিনি প্রায় সবসময় আল্লাহর নিকট এ বলে প্রার্থনা করতেন,"হে আল্লাহ্ তুমি আমাদের খাদ্যে বরকত দাও। আর আমাদের ও আমাদের খাদ্যের মাঝে তুমি কোন ব্যবধান সৃষ্টি করো না। কেননা যথারীতি খাদ্য না পেলে আমরা নামায- রোযা করতে পারবন , আমাদের মহান রব নির্দেশিত কর্তব্যসমূহ পালন করাও আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না ।"[৩৪]

জঠোর-জ্বালায় অস্থির মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হয়ে যায় ,অভাবের দহনে দগ্ধ হয়ে ন্যায়-অন্যায় বিস্মৃতি আদম সন্তান পাপের পঙ্কিলে নিমজ্জিত হয়। নারী তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করে না। ক্ষুধার তাড়নায় বাঘিনী যেমন আপন সন্তান পর্যন্ত ভক্ষণ করে থাকে ,

দারিদ্র্যের পঙ্কিলে নিমজ্জিত মানুষ ন্যায়-অন্যায় ভুলে নিজের অজ্ঞতাসারেই আত্মধ্বংসী পথে অগ্রসর হয়।তাই রাসুল (সাঃ) বলেছেন, দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের পথে টেনে নিয়ে যায় ।[৩৫]

মানুষকে যা কুফরের দিকে ঠেলে দিতে পারে তা কখনও ইসলাম সম্মত হতে পারে না। তাই ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচন তথা সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করার জন্য অনেকগুলো নির্দেশ প্রদান করেছেন। সেগুলোর অন্যতম হলঃ

১.কাজের প্রতি গুরুত্বারোপঃ

দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম পন্থা হল সক্রিয় কর্ম। কর্মহীন অলস ব্যক্তিরা কখনো স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারে না। সাহাবাগণ মহানবী (সঃ)কে জিজ্ঞেস করলেনঃ

قال سئل النبى ﷺ عن افضل الكسب فقال بيع مبرور وعمل الرجل بيده

কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম? মহানবী (সঃ) বললেন, ব্যক্তির নিজ হাতের কাজের বিনিময় বা সুষ্ঠ ব্যবসায় লব্ধ মুনাফা ।"[৩৬]

শ্রম নিয়োগের উৎসাহ দিয়ে তিনি বলেন,

لأن يأخذ احدكم حبله فيحطب على ظهره خير له من أن يأتى رجلا فيسئله

اعطاه او منعه

৩৩.মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৫৫ইং)পৃঃ৩১৬

৩৪.আহমাদ শালাবী, আল-হুকমাতুল ইসলামিয়্যাহ (কায়রো: দারুল আরব, ১৯৯১ইং) পৃঃ ৫৩০।

৩৫.ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা :এ জেড.এম. শামসুল আলম:পৃঃ ১৯৩

৩৬.মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৫২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

"তোমাদের কেউ রশি নিয়ে গিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে স্বীয় পিঠের উপর বহন করে নিয়ে আসলে আল্লাহ তাকে সে ভিক্ষাবৃত্তি হতে রক্ষা করবেন যাতে কিছু পাওয়া না পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই।"[৩৭]

মহানবী (সঃ) সব সময় কাজ করাকে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেন,

طلب الرزق الحلال من افضل الفرائض

"হালাল রুজি উপার্জন করা সর্বাপেক্ষা প্রধান কর্তব্য।"[৩৮]

মহানবী (সঃ) নিজে ব্যবসা করতেন এবং বকরী চরাতেন। বস্তুত শুধু মহানবী (সঃ)-ই নন হযরত দাউদ (আঃ)হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ(আঃ), হযরত ইদ্রিস (আঃ) সহ সকল নবী-রাসুলই কাজ করতেন।[৩৯]
তিনি আরও বলেনঃ ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه

"নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য আর কিছু নেই।"[৪০]

এভাবে মহানবী(সঃ) কাজের করার প্রতি উৎসাহ দিতেন, তাগিদ দিতেন যাতে করে তারা নিজেরাই কাজ করে এবং দারিদ্র্য লাঘব করতে পারে।

২.সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করণঃ

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুষম বন্টন অপরিহার্য। ধন-সম্পদ যাতে একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত না থাকে সে জন্য ইসলাম বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ কুক্ষিগত করার ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী আরোপ করা হয়েছে। ইসলামের নির্দেশ হল; বৈধ পন্থায় উপার্জিত ধন সম্পদ যেন মওজুদ করে না রাখা হয়; কেননা মওজুদদারী কার্যক্রম দ্বারা সম্পদের ক্রমবিবর্তনের গতি বাধা প্রাপ্ত হয় এবং সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় থাকে না।

সম্পদ কুক্ষিগত করে আবদ্ধ করে রাখা তথা মওজুদদার কেবল নিজেই দুশ্চরিত্রের দুরারোগ্যের মধ্যে নিপতিত হয় না। বরং সে সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে একটি কঠোরতম অপরাধ জনিত কাজে নির্লিপ্ত থাকে।

৩৭.বুখারী শরীফ:কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৭৭

৩৮.আবুবকর আহমদ ইবন হুসাইন আল - বায়হাকী , আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত ঃ দারুল মাআরিফ , ১৪০৬ হি.) শুআবুল ঈমান।

৩৯.Moulana Fariduddin Masuod , Workers Right in Islam (Dhaka:Islamic Foundation Bangladesh 1987)Ist , Ed,p. 44

৪০.সুনানুন নাসাঈ, কিতাবুল বুয়ু; হাদীস নং ৪৩৭৫

Dhaka University Institutional Repository

আর শেষ পর্যন্ত এর প্রতিফল স্বয়ং তার নিজের জন্যও দুষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।[৪১]

এ কারণে আল কুরআনে কৃপণতা ও কারুণীবাদের কঠোর বিরোধীতা করে থাকে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেনঃ

ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله هو خيرا لهم- بل هو شر لهم

"যারা আল্লাহ প্রদত্ত ফজল ও নেয়ামতের বেলায় কৃপণতা প্রদর্শন করে তারা যেন এটা ধারনা না করে যে এ কাজ তাদের জন্যে খুবই ভাল কাজ। বরং আসলে এ কাজ তাদের জন্য খুবই খারাপ কাজ।"[৪২]

অন্যত্র মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل ويكتمون

ما اتهم الله من فضله و اعتدنا للكافرين عذابا مهينا

"যারা সম্পদ পুঁজি করে এবং অপরকে সম্পদ পুঁজি করতে উৎসাহ দেয় এবং আল্লাহ অনুগ্রহ বশত যা দান করেছেন, তা গোপন করে আমি (সেই সব) কাফিরদের জন্য গ্লানিকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।" [৪৩]

এ আয়াতটি কৃপণ ও পুঁজি সৃষ্টিকারীদের কাফির বলে গণ্য করা হয়েছে।কুফুরের চেয়ে অধিকতর পাপ ইসলামে নেই। যারা আল্লাহর দেয়া সম্পদে আল্লাহর বান্দার অধিকারকে অস্বীকার করেছে তাদের অপরাধ কাফিরদের থেকে কম নয়। সম্পদ পুঁজি করা এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে তা থেকে বঞ্চিত করা কুফর। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কুফরকে প্রশ্রয় দেয়া হয় না।

আল-কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم

. يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما

كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون-

"যারা স্বর্ণরৌপ্য অর্থাৎ বিত্তসম্পদ জমা করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দান করো। যে দিন দোযখের অগ্নিতে ঐসমস্ত উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট,

---

৪১.পুঁজিবাদ বনাম ইসলাম : মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী : আধুনিক প্রকাশনী। পৃঃ৭

৪২.আল-কুরআন: সুরা আল ইমরান ঃ আয়াত নং ১৮০

৪৩ .আল-কুরআন: সুরা নিসা: আয়াত নং ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

পার্শ্বদেশ এবং পৃষ্ঠ দাগানো হবে,সেদিন তাদেরকে বলা হবে, এসমস্তই তোমরা জমা করেছিলে এবং এখন তার স্বাদ গ্রহন করো।"[৪৪]

মহানবী(সঃ) সম্পদের সুষম আবর্তনের জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি এজন্য যাকাত , ফিতরা,উশর, মিরাসী আইন, দান, করজে হাসানা, হিবা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৩. কর্মসংস্থানের অধিকার ঃ

বেকারত্ব সমাজ জীবনের এক অভিশাপ।বেকারত্ব ব্যক্তিকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়।তাই মহানবী (সঃ) সকল মানুষের কর্মসংস্থানের অধিকারের কেবল স্বীকৃতিই দেননি বরং তা নিশ্চিত করেছেন।বস্তুত এ অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান অংশীদার এবং এটি একটি মানবাধিকারও বটে ।মদীনা রাষ্ট্রে মহানবী(সঃ) এ অধিকার লাভের সুযোগ সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত ছিল।এর ফলে সকল মানুষ নিজের দক্ষতায় অর্থ উপার্জন করে বিত্তবান হতে পারত।[৪৫]

৪.শ্রমিকদের মর্যাদা প্রদানঃ

শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন রাত পরিশ্রম করে। কিন্তু তাদের পারিশ্রমের বিনিময় যদি যথার্থ পারিশ্রমিক না দেয়া হয় তা হলে সেটা হবে অমানবিক ।ফলে তারা কর্মে নিরুৎসাহী হবে। ফলে দারিদ্র্য আরও প্রকট হবে ।

সাধারনত সমাজের দরিদ্র শ্রেণীই অর্থাভাবে শ্রমিকের কাজ করে থাকে । পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের দ্বারা তারা হয় শোষিত, নির্যাতিত। যথাযথ পারিশ্রমিকের অভাবে তারা দিনের পর দিন অতিবাহিত করে অনাহারে অর্ধাহারে। দারিদ্র্য হয়ে পড়ে তাদের আজীবনের সঙ্গী। শ্রমিক শ্রেণীকে এ অনিবার্য দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষার জন্য মহানবী (সঃ) শ্রমিক-মালিক সকলকেই ভাই ভাই বলে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করতেন।[৪৬]

অধীনস্থ শ্রমিক ও দাস-দাসীর প্রতি ভাল ও সমান ব্যবহারের তাকিদ দিয়ে মহানবী (সঃ) বলেন:

فليطعمه مما يأكل و يلبسه مما يلبس

---

৪৪ .আল-কুরআন: সুরা তওবা : আয়াত নং ৩৪

৪৫ .আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল হাদীসের অবদান ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ : ডঃ মোহাম্মাদ জাকির হুসাইন। পৃঃ ৭৫

৪৬ .অধ্যক্ষ হাওলাদার আব্দুর রাজ্জাক , মহানবী (সঃ) এর অর্থনৈতিক সাম্য ও বর্তমানবশ্ব, অগ্রপথিক (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন , ১৯৯৫ ইং) পৃঃ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা যা খাবে তোমাদের অধীনস্থদের তাই খেতে দিবে এবং তোমরা যা পরবে তাদেরকে তাই পরতে দেবে।"[৪৭]

শ্রমিকদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الكاسب حبيب الله

" উপার্জনকারী আল্লাহর বন্ধু।"[৪৮]

শ্রমিকদের পারিশ্রমিক প্রদান করার ব্যাপারে নবী করীম (সঃ) বলেন;

اعطوا الاجير أجره قبل ان يجف عرقه

অর্থাৎ 'শ্রমিকদের পারিশ্রমিক তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই দিয়ে দাও।'[৪৯] কাজেই পারিশ্রমিক দিতে দেরি করা উচিৎ নয়।

শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রশ্নে মহানবী (সঃ) বলেন,

لا يكلفه ما يغلبه

' তাদের উপর অতখানিই চাপ দেওয়া যেতে পারে যতখানি তাদের সামর্থ্যে কুলায়। সাধ্যাতীত কোন কাজের নির্দেশ কিছুতেই দেয়া যেতে পারেনা।'[৫০]

এভাবে ইসলামে আল্লাহ এবং তার রাসূল (সঃ) শ্রমিকদের মর্যাদা,অধিকার সম্পর্কে সচেতন করায়ে দিয়েছেন। যার ফলে শ্রমিকরা তাদের শ্রমের প্রতি উৎসাহী হবেন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

৫.মূলধন ব্যবস্থাঃ

মহানবী (সঃ) সুদসহ মূলধন লাভের অবৈধ পন্থাগুলো নিষিদ্ধ করে মূলধন লাভে ইচ্ছুকদেরকে অথৈ সমুদ্রে নিক্ষেপ করেননি বরং তিনি বৈধ পন্থায় তাদের মূলধন লাভের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যারা চাষাবাসে উৎসাহী তিনি তাদের মাঝে পতিত জমি বন্টন করেছিলেন। এর ফলে রাষ্ট্রাধীন অনাবাদী জমিসহ আবাদ হতে পেরেছিল , কৃষি কাজে উৎসাহী বহু বেকার শ্রম বিনিয়োগের সুযোগ পেয়েছিল।আর এর মাধ্যমে তাদের দারিদ্রের অবসান ঘটেছিল।[৫১]

৬.সুদ নিষিদ্ধ করণঃ

ধনী কর্তৃক দরিদ্রদের শোষণ করার প্রধান হাতিয়ার হল সুদ প্রথা। এটি ধনীকে যেমন ধনী করে দরিদ্রকে তেমনি নিঃস্ব করে দেয়। এ কারণে এ সুদ

৪৭.সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২৯

৪৮.কানযুল উম্মাল, আলাউদ্দীনস আল-মুত্তাকী ; (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫ ইং) খঃ ৪ পৃঃ১২৬

৪৯.সুনানু ইবনে মাজাহ , কিতাবুল আহকাম , হাদীস নং ২৪৩৪

৫০.সুনানুত তিরমিযি, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ , হাদীস নং ১৬৬৮

৫১.আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল হাদীসের অবদান ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ : প্রাগুক্ত: পৃঃ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথা ইসলামে নিষিদ্ধ। কিন্তু পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে সুদ। সুদের ক্ষতিকর প্রভাব আজ সারা বিশ্বের অর্থনীতিকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরেছে। পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাগণ তাদের স্বার্থেই সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ও প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে এবং এখনও করে চলেছে।[৫২]

সুদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অর্থ সঞ্চয়ের আকাংক্ষা থেকে শুরু করেন সুদী ব্যবসায়ের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যন্ত সমগ্র মানবিক কর্মকান্ড স্বার্থান্ধতা, কার্পণ্য, সংকীর্ণতা, মানসিক কাঠিণ্যও অর্থপূজার পারদর্শিতার প্রভাবধীনে পরিচালিত হয় এবং ব্যবসায়ে মানুষ যতই এগিয়ে যেতে থাকে এ পারদর্শিতা ততই তার মধ্যে বিকাশ লাভ করতে থাকে।[৫৩]

ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী সুদী ঋণের ক্ষতিকর প্রভাবের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন,

"এ ধরণের ঋণ সুদখোর সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থলিপ্সা, লোভ,স্বার্থপরতা ও সহানুভূতিহীন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়।"[৫৪]

সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভোগ বসায় সুদের সাহায্যেই। স্বল্প ঋণ গ্রহীতার যে কারণে টাকা ঋণ নেয় সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক তাকে সুদের অর্থ দিতেই হবে। এর ফলে বহু সময়ে ঋণ গ্রহীতাকে স্থাবর - অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হলে ও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। সুদ গ্রহীতারা হচ্ছে সমাজের পরগাছা। এরা অন্যের উপার্জন ও সম্পদে ভাগ বসিয়ে জীবন যাপন করে।

উপরন্ত বিনাশ্রমে অর্থলাভের ফলে সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এদের কোন অবদান থাকে না।[৫৫]

পবিত্র কুরআনের ৭ টি আয়াতে সুদ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সুদের সাথে সংশ্লিষ্টদের মন্দ পরিণতি, হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনা, ভ্রষ্টতা ও কঠোর শাস্তির বাণী শুনিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহর বাণীঃ

৫২.সুদ সমাজ অর্থনীতি :অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন ; পৃঃ ৮ : ঢাকা ঃ ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯২

৫৩.সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী,সুদ ওআধুনিক ব্যাংকিং,অনুবাদ: আব্বাস আলী খান ও আবদুল মন্নান তালিব। পৃঃ ৮২ (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯ ইং)

৫৪. Dr. Anwar Iqbal Quraishi, Islam and the Theory of Interest (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1987) P. 148

৫৫.আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল- হাদীসের অবদান ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ; প্রাগুক্ত : পৃঃ২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذين يتخبطه
الشيطن من المس. ذالك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا .واحل
الله البيع وحرم الربوا .فمن جاء ه موعظة من ربه فانتهى فله
ما سلف . وامره الى الله . ومن عاد فاؤلئك اصحب النار

"যারা সুদ খায়, তারা (কিয়ামতের দিন) সে ব্যক্তির ন্যায় দন্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলে, নিশ্চয় ব্যবসা তো সুদেরই অনুরূপ, অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে করেছেন হারাম। অতএব যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশ এসেছে, অনন্তর সে বিরত রয়েছে, তবে যা অতীত হয়েছে তা তারই এবং তার কৃতকর্ম আল্লাহর প্রতি নির্ভর। আর যারা পুনরায় সুদ গ্রহন করবে , তারা দোযখবাসী হবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।"[৫৬]

يايها الذين امنو ا لا تأكلون الربوا اضعافا مضعفة . واتقوا
الله لعلكم تفلحون

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ভক্ষণ করো না, আল্লাহকে ভয় করো, যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।"[৫৭]

يايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين

"হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহকে ভয় কর। আর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও,তাহলে সুদের মধ্যে যা অবশিষ্ট আছে তা পরিহার কর।"[৫৮]
হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে রাসুল (সঃ)বলেছেনঃ

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه
وسلم قال الربا ثلث وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "সুদের মধ্যে তিয়াত্তরটি গুনাহ রয়েছে। আর সর্বনিম্ন গুনাহটি হল নিজের মাতাকে বিবাহ করার সমতুল্য।"[৫৯]

---

[৫৬]. আল কুরআন:সুরা আল বাক্বারা : আয়াত নং ২৭৫।
[৫৭]. আল কুরআন:সুরা আল ইমরাণ : আয়াত নং ১৩০।
[৫৮]. আল কুরআন:সুরা আল বাক্বারা : আয়াত নং ২৭৮।
[৫৯]. মুসতাদরাকে হাকিম ।

Dhaka University Institutional Repository

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون بابا ادناها كالذى يقع على امه

অর্থাৎ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন,"সুদের ভিতর সত্তর প্রকার গুনাহ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহ হল নিজের মায়ের সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হবার সমতুল্য।"[৬০]

وعن عبد الله بن هنزلة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ستة و ثلثين زنية

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন,"জেনে শুনে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশ বার যিনা করা (ব্যাভিচার লিপ্ত হওয়া) অপেক্ষা মারাত্মক অপরাধ।"[৬১]

وعن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بقوم هلاكا فشى فيهم الربا

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,"আল্লাহ তায়ালা যখন কোন জাতিকে ধবংস করার ইচ্ছা পোষণ করেন তখন তাদের মধ্যে সুদী লেনদেন ব্যাপক আকার ধারণ করে।"[৬২]

এমনি ভাবে সুদ প্রথা রহিত করে মহানবী(সঃ) দারিদ্র্য প্রসারের পথ রুদ্ধ করে দেন।

৭.শোষণের পথ বন্ধঃ

দারিদ্র্যের বিকাশ ও প্রসারে শোষণ ও জুলুমের ভূমিকা অনন্য। মহানবী(সাঃ) শোষন বন্ধ করার জন্য সুদ ছড়াও শোষন অন্য সব পন্থা যেমন জুয়া,লটারি,ঘুষ রিশওয়াত, কেনা-বেচায় কম দেওয়া, মজুদদারী, অশ্লীল জিনিসের ব্যবসা, মনোপলি, কার্টেল ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছেন।

জুয়া, লটারী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ঘোষণাঃ[৬৩]

انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان

কেনা বেচায় কম দেয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:[৬৪]

اوفوا الكيل ولا تكون من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم

৬০.বায়হাকী , ইবনে মাজাহ :হাদীস নং২২৬৫

৬১.মুসনাদে আহমদ ও তাবারানী

৬২.কানযুল উম্মাল

৬৩.আল-কুরআন; সুরা মায়িদা: আয়াত নং ৯০

৬৪.আল-কুরআন; সুরা আশশুয়ারা : আয়াত নং ১৮১-১৮২

Dhaka University Institutional Repository

মজুদদারী সম্পর্কে হাদীস শরীফে আছে: [৬৫]

تحريم الاحتكار فى الاقوات

বস্তুত এগুলো প্রত্যেকটিই শোষণের একেকটি অতি বড় হাতিয়ার। মহানবী(সাঃ) স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন যে,সব উপায়ে আর্থিক লেন -দেনের ফলে সমজের একদল লোক অন্যায়ভাবে জাতীয় অর্থের বিরাট অংশ লুটে নিচ্ছে আর ব্যাপক জনগণ নির্মমভাবে শোষিত হচ্ছে। ফলে মহানবী (সাঃ) এসবের মাধ্যমে সৃষ্টি শোষণ ও দারিদ্র্যেতার নিরসনকল্পে জুলুমের এসব পন্থা বন্ধ করেছেন।

৮.সম্পদ অর্জনের বৈধতার তাগিদঃ

সম্পদ অর্জনের জন্য ইসলামে বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।হালাল হারামের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।বৈধ ভাবে সম্পদ অর্জনের জন্য বলেছেন।চুরি ,ডাকাতি,রাহাজানি, সুদ, ঘুষ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের জন্য নিষেধ করেছেন।আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেনঃ

كلوا من طيبات ما رزقناكم

অর্থাৎ তোমরা উত্তম ও পবিত্র বস্তু খাও, যা আমি তোমাদের জীবিকারূপে দিয়েছি। [৬৬]

মহানবী (সঃ) ইরশাদ করেনঃ

طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة

অর্থাৎ হালাল রুযী অন্বেষণ করা ফরজের পরেও একটি ফরজ। [৬৭]

ঘুষ সম্পর্কে মহানবী (সঃ) বলেনঃ

الراشى و المرتشى كلاهما فى النار

ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামী। [৬৮]

মহানবী (সঃ) বলেনঃ

كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به

হারাম খাদ্যে পরিপুষ্ট যে, মাংস , নরকাগ্নিই তার উত্তম স্থান। [৬৯]

৯.অপচয় রোধঃ

দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে অপচয় একটি অন্যতম বাধা। কারণ অনেকেই অঢেল সম্পত্তির মালিক হয়ে নানা অপচয়ের মধ্যে লিপ্ত হয়। অথচ অনেক লোক এমন আছে যারা একবেলা ঠিকভাবে খাবারও খেতে

---

[৬৫].মুসলিম শরীফ: কিতাবুল মুসাকাত

[৬৬].আল-কুরআন : সুরা বাকারাহ : আয়াত নং ১৮৮

[৬৭].বায়হাকী:

[৬৮].আহমাদ , তাবরানী

[৬৯].বায়হাকী:

Dhaka University Institutional Repository

পারছে না। অথচ অপচয়কৃত টাকার সমপরিমান টাকা দ্বারা অনেকের মাসিক খরচ ও চলে যেতে পারত।তাই ইসলাম অপচয়কারীর বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী আরোপ করেছে।

আল-কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين

অর্থাৎ কিন্তু এই ভোগে অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।[৭০]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

يبنى ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين

"হে আদম সন্তানগণ! প্রত্যেক সালাতের সময় উত্তম বস্ত্রগুলো পরিধান করো; আহার করো এবং পান করো, কিন্তু অপব্যায় করো না; নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীকে তিনি পছন্দ করেননা।"[৭১]

অন্যত্র তিনি বলেন ;

ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا

"নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান নিজ প্রভুর প্রতি কৃতঘ্ন।তাই ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অপচয় রোধের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।"[৭২]

১০. বৈধ ব্যবসায়ের অনুমতি দান এবং গুরুত্বারোপঃ

অর্থ উপার্জন এর একটি অন্যতম মাধ্যম হলো ব্যবসা। এর মাধ্যমে ব্যক্তি তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে।আর্থিক সমস্যার লাঘব করতে পারে।দারিদ্র্য নিরসন করতে পারে। তাইতো মহান আল্লাহ তায়ালা ব্যবসার প্রতি তাগিদ প্রদান করেছেন।আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেনঃ আলকুরআনে আছেঃ

احل الله البيع

"আল্লাহ কেনা বেচাকে হালাল করেছেন।"[৭৩]

আল্লাহ তায়ালা ব্যবসার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন ঃ ইরশাদ হচ্ছেঃ

فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

---

৭০. আল-কুরআন : সুরা আনআম : আয়াত নং ৪১

৭১. আল-কুরআন : সুরা আরাফ : আয়াত নং ৩১

৭২. আল-কুরআন: সুরা বনি ইসরাইল ;আয়াত নং২৯

৭৩. আল-কুরআন : সুরা বাকারা : আয়াত নং ২৫৭

Dhaka University Institutional Repository

"সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৭৪]

মহানবী (সঃ) নিজে ব্যবসা করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতার কথাও জানা যায়।

তিনি একবার খাদীজা (রাঃ) এর পণ্যসামগ্রী সমেত সিরিয়া যান এবং প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করেন।[৭৫]

ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকার্জনের জন্য তিনি প্রচুর উৎসাহব্যঞ্জক বাণী প্রদান করেছেন।তিনি বলেন,

التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء

"সত্যবাদী, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী আম্বিয়া , সিদ্দকীন ও শুহাদা প্রমুখ মহান ব্যক্তির সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।"[৭৬]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارت عن تراض منكم

" হে মুমিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না, কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।"[৭৭]

বস্তুত দারিদ্র্য নিরসনে ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী তাই বলেন- "ব্যবসা বানিজ্যেরএ ব্যবস্থা না হলে তোমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ত এবং অপরের জন্য বোঝা হয়ে যেত।"[৭৮]

১১.ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধঃ

ভিক্ষাবৃত্তিকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে।কারণ ভিক্ষাবৃত্তিই হল দারিদ্র্যতার প্রকাশ।ইহাতে আত্মসম্মান বোধের হানি হয়। রাসুল (সঃ) ভিক্ষাকে ঘৃণা করতেন। তিনি কখনোই তা পছন্দ করতেন না।

রাসুল(সাঃ) ভিক্ষায় অর্জিত সম্পদকে জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর বলেছেন। হাদীস শরীফে আছে ঃ রাসুল (সঃ) বলেন ,

من سال من غير فقر فكانما يأكل الجمر

৭৪.আল-কুরআন : সুরা জুমআ : আয়াত নং ১০

৭৫.মুহাম্মদ ইবনু সাদ : আত-তবাকাতুল কুবরা , (বৈরত ঃ দারুল ফিকর , ১৩২৬ হি)খ. ৩ পৃঃ ৮৩

৭৬.সুনানুত তিরমিযি , কিতাবুল বুয়ু : হাদীস নং ১১৩০

৭৭.আল-কুরআন : সুরা আননিসা : আয়াত নং ২৯

৭৮.আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল- হাদীসের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ: প্রাগুক্ত:পৃঃ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

" তারা জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর চিবাবে।"[৭৯]
হাদীসে আরও আছে:

ما يزال الرجل يسال الناس حتى ياتى يوم القيامة ليس فى وجهه مزعة لحم

তোমাদের মাঝে যে ভিক্ষা করে সে যখন আল্লাহর সামনে যাবে তখন তার চেহারায় এক টুকরা গোশত ও থাকবে না।[৮০]

একদিন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে কিছু সাহায্য চেয়েছিল। মহানবী (সঃ) তাকে প্রশ্ন করে জেনে নেন যে, তার কি সম্পদ আছে। রাসুল(সঃ) তার সম্পদ অর্থাৎ একটা পেয়ালা ও একটা কম্বল আনতে বললেন। ঐগুলো বিক্রি করে ২ দিরহাম সংগ্রহ করলেন।মহনবী (সঃ) তাকে ১ দেরহাম দিয়ে একটি কুঠার ক্রয় করে আনতে বললেন। কুঠার ক্রয় করে আনলে তিনি লোকটিকে বললেন যাও "যাও জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটো।"

এভাবে তিনি শ্রমের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে বলেছিলেন।তাই ইসলামে ভিক্ষা বৃত্তি অবসানের পা স্বনির্ভর হয়ে কাজ করে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতি উৎসাহিত এবং তাগিদ প্রদান করেছেন।

১২.করজে হাসানাহঃ

করজে হাসানাহ হল সুদ মুক্ত ঋণ প্রদান। দরিদ্র অসহায়, নিঃস্ব, অভাবী লোকদেরকে নিঃস্বার্থভাবে ঋণ দেয়া ওয়াজিব। যতে পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রীতি, ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং দায়িত্বানুভূতি বিকাশিত হয়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

واقرضوا الله قرضا حسنا

"তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে করজে হাসানাহ দাও।"[৮১]

অন্য আয়াতে অভাবী নিঃস্ব পীড়িতকে ঋণ দান প্রকারান্তরে আল্লাহকে ঋণ প্রদান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছেঃ

من ذاالذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة

"যে আল্লাহকে উত্তমরূপে ঋণ প্রদান করবে , আল্লাহ তার সে দানকে বহু গুণে বৃদ্ধি করে কিয়ামতের দিন পুরস্কার হিসেবে দিবেন।"[৮২]

তাই এভাবে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করলে দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা ঋণ গ্রহ করে তার দ্বারা চিন্তামুক্ত হয়ে ব্যবসায় মনোযোগী হতে পারবে। সুদের অভিশাপ পোহাতে হবে না। ধনীদের দ্বারা গরীবরা উপকৃত হবে। ফলে সমাজে দারিদ্র্য দূরীভূত হওয়ার এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখে হবে।

---

[৭৯].মুসনাদে আহমদ :হাদীস নং ১৬৮৫৫।

[৮০].আল-বুখারী শরীফ; কিতাবুয যাকাত , হাদীস নং ১৩৮১

[৮১].আল-কুরআন : সুরা মুযাম্মিল : আয়াত নং ২০

[৮২].আল-কুরআন : সুরা হাদিদ : আয়াত নং ২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

১৩.ফিতরার প্রবর্তনঃ

পবিত্র রমযান মাসের সিয়াম সাধনার শেষভাগে বিত্তশালীদের উপর গরীব দুঃখীদের জন্য নির্দিষ্ট হারে যে বিশেষ দানের নির্দেষ রয়েছে তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলা হয়। হাদীসে এসেছেঃ

فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من

شعير على كل عبد او حر صغير او كبير

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর হতে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসুল(সঃ) মুসলমানদের প্রত্যেক গোলাম, স্বাধীন ব্যক্তি, নারী, পুরুষ, ছোট-বড় সকলের উপর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন।"[৮৩]

যাকাতের তুলনায় ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত অনেকাংশে সহজ ও শিথিল। ফিতরা প্রবর্তনের মাধ্যমেও দারিদ্র্য বিমোচন অনেকটা অগ্রগতি সম্ভব।

১৪.বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠাঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বায়তুল মালও প্রতিষ্ঠা করেন।[৮৪] রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বায়তুল মাল জনকল্যাণ এবং মৌলিক চাহিদা পূরণ সংক্রান্ত কাজ করত।[৮৫]

দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে ও বায়তুল মাল ব্যাপক ভূমিকা পালন করত। বায়তুল মাল থেকে যে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যয় করা হত ঃ

*সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন *বন্দী ও কয়েদীদের ভরণ-পোষণ *ইয়াতীম ও লা-ওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন * অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান* জনসাধারণের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ *করযে হাসানাহ * সমাজ কল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয়েছে।

১৪.বিলাসিতা হারামঃ

বিলাসী জীবন যাপন আল-কুরআনে বর্ণিত জীবন-দর্শনের পরিপন্থী। ইহা সমাজে দারিদ্র্যতা বিস্তার করে।বিলাসিতা নিষিদ্ধ হওয়ার একটি প্রধান কারণ এই যে, তা ন্যায়সংগত এবং সুষম ভোগব্যবস্থা প্রবর্তন ব্যাহত করে ।

৮৩.মুসলিম শরীফঃ কিতাবুয যাকাত , হাদীস নং ১৬৩৬

৮৪.শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান : ইসলামী অর্থনীতি ঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ

৮৫.সাইয়্যেদ হাসান মুসাম্মা নদভী, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)পৃঃ৩০

Dhaka University Institutional Repository

যদি সমাজের এক অংশ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ভোগ করে অথবা বিলাসী জীবন যাপন করে , তবে অন্য অংশ দারিদ্র্যে নিক্ষিপ্ত হতে পারে । সামাজিক সম্পদ অপ্রতুল হলে এটি অবশ্যাম্ভাবী। আল্লাহর নবী (সঃ) সন্ন্যাসব্রত এবং বিলাসিতাকে সমভাবে ঘৃণা করেছেন।[৮৬]

যারা স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত পাত্র ব্যবহার করে , তাদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, তাদের শরীরে দোযখের আগুণ প্রবেশ করবে। বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূল(সঃ) এক হাতে রেশম অপর হাতে স্বর্ণ নিয়ে এসে বললেন, এ দুটির ব্যবহার আমার উম্মতের জন্য হারাম।[৮৭]

১৫.যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন ঃ

ইসলাম যে পাঁচটি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলোর মধ্যেযাকাত একটি অন্যতম । যাকাত একটি আর্থিক ইবাদত। যাকাত দেবার মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং পবিত্র হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ, দারিদ্র্য নিরসনে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। যাকাত দারিদ্র্য নিরসন করে, অর্থনৈতিক বৈষম্যদূর করে , ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করে। যাকাতের মাল কারা ভক্ষণ করতে পারবে সে সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।সুরা তওবার ৬০ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ[৮৮]

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

والغرمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে যাকাতের ৮ টি খাত হলঃ

১ .ফকীর ঃ ফকীর বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার সামান্য সম্পদ থাকে তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।

২.মিসকীনঃ মিসকীন হলো এমন ব্যক্তি যার কোনো সম্পদ নেই, একেবারে নিঃস্ব।

৩.যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী ঃ যারা যাকাত আদায় করার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিয়োজিত আছেন তাদেরকে ও যাকাত প্রদান করা যাবে।

৪.যাদের মন জয় করা আবশ্যক ঃ এ ধরণের লোকদের মধ্যে নও মুসলিম অন্যতম ।তাদের মন জয় করার জন্য যাকাত প্রদান করা যাবে।

৫. দাস মুক্তির জন্য ঃ কোনো ক্রীতদাসকে মুক্ত করার জন্য যাকাত দেয়া যাবে।

৬.ঋণ মুক্তির জন্যঃ ঋণী ব্যক্তিকে তার ঋণ পরিশোধেরজন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে।

৮৬.হেদায়া, পৃঃ ৫৯৫

৮৭.হেদায়া পৃঃ ৫৯৭

৮৮.আল-কুরআন: সুরা তওবা: আয়াত নং৬০

Dhaka University Institutional Repository

৭. **আল্লাহর রাস্তায়ঃ** অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য মুজাহিদদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য যাকাত প্রদান করা যাবে।

৮. **নিঃস্ব মুসাফিরঃ** সফরে এসে কোনো মুসাফির নিঃস্ব হলে তাকেও যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে।

বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের ব্যবহারঃ

আল-কুরআনে উল্লেখিত যাকাতের হকদার ৮ শ্রেণীর লোকের মধ্যে ৬ শ্রেণীর লোকই দারিদ্র্যের সাথে সম্পৃক্ত। তাই দরিদ্র, অভাবী ও ঋণগ্রস্থ লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা, পূনর্বাসন ও স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য যে কাজ করা যেতে পারে, তা হলোঃ

১.যাকাত ফান্ড বা তহবিল থেকে দরিদ্র-অভাবী , দুঃস্থ নর-নারী , রুগ্ন, অক্ষম, পঙ্গু বৃদ্ধ, ইয়াতীম এবং অনুরূপ অসহায় লোকের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা যাতে তারা জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়।

২.দরিদ্র ও অভাবী জনগোষ্ঠীর সক্ষম অংশকে এমনভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা স্বাবলম্বী হয়ে মানবিক মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে।

৩.মুসাফির যাতে যাতায়াতের পথে কোন প্রকারে কষ্ট করতে না হয়, সে জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা ।

৪.সঙ্গত কারণে যারা ঋণগ্রস্থ তাদের ঋণমুক্তির জন্য সাহায্য করা এবং তাদের উন্নয়নের জন্য এসব ব্যবস্থা করে দেয়া যাতে তাদের ঋণ মুক্তি হয় বা ঋণ গ্রস্থ হতে না হয়।

৫. ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য এমন স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে সমাজে ইসলামের ভিত মজবুত হয়। এজন্য গবেষণা প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৬.দরিদ্র ও অভাবী লোকদের সন্তান-সন্ততির উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল , কলেজ, মাদ্রাসা ও পাঠাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা।

৭.দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসার লক্ষ্যে দেশের সকল এলাকায় বিনামূল্যে চিকৎসা সুবিধা দানের জন্য হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডিসপেন্সারী প্রভৃতি নির্মাণ করা।

৮.বেকার লোকদের নিয়মিত ভাতা এবং তাদের কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি করা ।

৯.দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের জন্য নিয়মিত স্টাইপেন্ড, স্কলারশীপ এবং অনুরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করা। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন -বন্যা, ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছাস ভূমিকম্প ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের সাহায্য ও

Dhaka University Institutional Repository

পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও যাকাত তহবিল বিরাট অবদান রাখতে পারে।[৮৯]

যাকাত আদায়ের খাত ও নিসাব

বিভিন্ন খাত থেকে যাকাত কত পরিমান আদায় হবে তার একটি ছক নিম্নে দেয়া হলঃ[৯০]

		নিসাব(সর্বনিম্ন পরিমান	যাকাতের হার
১	নগদ অর্থ , ব্যাংক জমা এবং ব্যবসায়িক পণ্য	৫২½ তোলা রুপার মুল্যমান	সম্পুর্ণ মুল্যের ২½ %
২.	স্বর্ণ ,রৌপ্য বা সোনা রুপার অলংকার	সোনা ৭½ তোলা এবং রুপা ৫২½ তোলা	ঐ
৩.	কৃষিজাত দ্রব্য	আবু হানিফা-যে কোন পরিমাণ,অন্যান্য ৫ ওয়াছাক বা ২৬মণ ১০সের ইস. ইকো.রিসা.ব্যাঙ্কো ১৫৬৮কেজি	ক. বৃষ্টিতে উৎপাদিত দ্রব্যের ১০%
৪.	খনিজ দ্রব্য	যে কোন পরিমাণ	দ্রব্যের ২০%
৫.	ভেড়া-ছাগল	৪০	
		৪০ থেকে ১২০	১টি ভেড়া বা ছাগল
		১২১ থেকে২০০	২টি ভেড়া বা ছাগল
		২০১থেকে৮০০	৩টি ভেড়া বা ছাগল
		৪০০ থেকে ৪৯৯	৪টি ভেড়া বা ছাগল
		৫০০ থেকে এর উপরে	৫টি বা প্রতি শ'তে ১টি
৬.	গরু-মহিষ	৩০	
		৩০ থেকে ৩৯ পর্যন্ত	১টি ১ বছরের বাছুর
		৪০ থেকে ৪৯ পর্যন্ত	১টি ২ বছরের বাছুর
		৫০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত	১টি ২বছরের বাছুর
		৬০থেকে ৬৯ প্রর্যন্ত	১টি ৩বছরের বাছুর এবং ১টি ২বছরের বাছুর
		৭০থেকে৭৯ প্রর্যন্ত	২টি ৩বছরের বাছুর
		৮০থেকে ৮৯ প্রর্যন্ত	৩টি ২বছরের বাছুর
		৯০থেকে ৯৯ প্রর্যন্ত	১টি ৩বছরের বাছুর এবং ২টি

৮৯.আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ : পৃঃ ১০৫-১০৬

৯০.মোঃ আবু সিনা ও খন্দকার জিয়াউল হক, যাকাত ঃ ভারসাম্যপুর্ণ জীবন গঠনের অন্যতম উপাদান ,দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ , (কুষ্টিয়া ঃ ১৯৯৭ ইং) ডিসেম্বর , খ,৬ পৃঃ ১৩৪-১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

			২বছরের বাড়ুর
		১০০থেকে ১১৯প্রর্যন্ত	২বছরের বাড়ুর এভাবে উর্ধ্বে হিসাব হবে
৭	উট	৫	
		৫ থেকে ৯ প্রর্যন্ত	১টি ৩ বছরের খাশী অথবা ১টি ১বছরের বকরী
		১০ থেকে ১৪ প্রর্যন্ত	২টি ১বছরের বকরী
		১৫ থেকে ১৯ প্রর্যন্ত	৩ টি১ বছরের বকরী
		২০ থেকে ২৪ প্রর্যন্ত	৪টি ১বছরের বকরী
		২৫ থেকে ৩৫ প্রর্যন্ত	৪টি ১বছরের মাদী উট
		৩৬ থেকে ৪৫ প্রর্যন্ত	২টি ৩বছরের মাদী উট
		৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত	২টি ৪বছরের মাদী উট
		৬১থেকে ৭৫ পর্যন্ত	১টি ৫বছরের মাদী উট
		৭৬ থেকে ৯০পর্যন্ত	২টি ৩বছরের মাদী উট
		৯১ থেকে ১২০ পর্যন্ত	২টি ৪বছরের মাদী উট
		১২১ থেকে ১২৯ পর্যন্ত	২টি ৪বছরের মাদী উট
		১৩০ থেকে ১৩৪ পর্যন্ত	২টি ৪বছরের মাদী উট এবং ২ টি ছাগল
		১৩৫থেকে ১৩৯ পর্যন্ত	২টি৪ বছরের মাদী উট এবং ৩ টি ছাগল
		১৪০ থেকে ১৪৪ পর্যন্ত	২টি ৪ বছরের মাদী উট এবং ৪ টি ছাগল
		১৪৫ থেকে১৪৯ পর্যন্ত	২টি ৪বছরের মাদী উট এবং ১টি ২বছরের উট
		১৫০থেকে উপরে	৩টি ৪ বছরের উট এবং প্রতি ৫টি-তে ১টি ছাগল
৮.	ঘোড়া	তিনটি মত	যকাত নেই বা সম্পুর্ণ মুল্যের ২½ % বা প্রতিটি ঘোড়ার জন্য ১ দিনার
৯.	মধু		যকাত নেই
১০.	শেয়ার ব্যাংক /নোট /স্টক		সম্পুর্ণ মুল্যের ২½ % তবে কোম্পানী যাকত দিলে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দিতে হবে না।
১১.	অংশীদার কারবার ও মুদারাবা	৫২½ তোলা রুপার মুল্যমান	প্রথম সম্পত্তির যাকাত দিতে হবে,মুলধনের নয়, এরপর লাভ বন্টিত হবে । যাকাত ব্যক্তিগতভাবে লাভের উপর হবে ।একভাগ দিবে মুলধন সরবারহকারী ২½ % এবং একভাগ দিবে শ্রমদানকরী

Dhaka University Institutional Repository

যে সব সম্পদে যাকাত নেই ঃ

যাকাত মুক্ত সম্পদ সম্পর্কে মহানবী (সঃ) বলেছেন, "বাসস্থানের জন্য নির্মিত ঘরসমূহ , ঘরে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, আরোহনের জন্য পশু, চাষাবাদ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্যে ব্যবহৃত পশু ও দাস-দাসী, কাঁচা তরি-তরকারীসমূহ এবং মৌসুমী ফলসমূহ যা বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না,অল্প দিনে বিনষ্ট হয়ে যায়ঃ যথা-আম, পেঁপে শস্য, তরমুজ,বাঙ্গী ও লাউ ইত্যাদিতে যাকাত নেই ।"[৯১]

যাহোক , হাদীস শরীফের আলোকে যে সকল সম্পদকে যাকাত থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে, সেগুলোর একটি তালিকা দেয়া হলোঃ

*জমি *মিল ,ফ্যক্টরী, ওয়্যার হাউজ, গুদাম ইত্যাদি* দোকান * বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি *এক বছরের কম বয়সের গবাদি পশু * ব্যাবহারের যাবতীয় পোশাক *বই,খাতা, কাগজ ও মুদ্রিত সামগ্রী * গৃহের যাবতীয় আসবাবপত্র, বাসন-কোসন ও সরঞ্জামাদি, তৈলচিত্র ও স্টাম্প।

*অফিসের যাবতীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার ইত্যাদি সরঞ্জাম।

* গৃহপালিত সকল প্রকার মুরগী ও পাখি।

*কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ইত্যাদি যাবতীয় মূলধন সামগ্রী।

*চলাচলের জন্তু ও গাড়ি ।

*যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম *বপন করার জন্য সংরক্ষিত বীজ ।

*যাকাত বছরের মধ্যে পেয়ে সে বছরের মধ্যেই ব্যয় হয়েছে এমন যাবতীয় সম্পদ *দাতব্য বা সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ যা জনগণের উপকার ও কল্যাণে নিয়োজিত।

* সরকারী মালিকানাধীন নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং অন্যান্য সম্পদ।[৯২]

উপরন্ত , মূল্যবান সুগন্ধি , মণিমুক্তা,লোহিতবর্ণ প্রস্তর, শ্বেত পাথর এবং সমুদ্র হতে আহরিত দ্রব্য-সামগ্রীর উপর যাকাত নেই। যে সমস্ত পশু বহন ও বাহন ভাড়ায় খাটানো হয় তারও যাকাত দিতে হয় না ।

যাকাতের মালামাল হিসেব করার একটি নমুনা ঃ

যাকাত দাতারা যাতে সহজেই তাদের যাবতীয় সম্পদ ও মালামালের হিসেব করে যাকাত দিতে পারে সে জন্য নিম্নে একটি নমুনা দেওয়া হলঃ

৯১.আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল হাদীসের অবদান ঃ প্রাগুক্ত : পৃ ৯৮

৯২.অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন , যাকাত কি ও কেন (ঢাকা ঃ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫ ইং)পৃঃ ১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ সংঃ	সম্পদ	সর্বমোট মূল্য(টাকায়)	যাকাত বহির্ভূত মূল্য (টাকায়)	যাকাত বহির্ভূত মূল্য(টাকায়)
১.	বাড়ি	৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	.....
২.	আসবাবপত্র(বাড়ি ওঅফিস)	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	.....
৩.	মুলধন সামগ্রী (জমি,দালান,মেশিন)	১০০,০০,০০০,.০০	১০০,০০,০০০.০০	.....
৪.	ব্যবহার গাড়ি ও যানবাহন	৩,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০	.....
৫.	সোনা	২০,০০০.০০	.....	২০,০০০.০০
৬.	রুপা	১০,০০০.০০	.....	১০,০০০.০০
৭.	অলংকার (সোনা,রুপা,পাথর)	১০০,০০০.০০	.....	১,০০,০০০.০০
৮.	নগদ অর্থ (ব্যাংকে ও হাতে)	৭০,০০০.০০	.....	৭০,০০০.০০
৯.	পাওনা অর্থ	৪০,০০০.০০	.....	৪০,০০০.০০
১০.	প্রদত্ত ঋণ (পাওনা)	৩০,০০০.০০	.....	৩০,০০০.০০
১১.	বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার(বাজার মূল্যহিসাব)	৫০,০০০.০০	.....	৫০,০০০.০০
১২.	ব্যবসায়ে জন্য ক্রীত মালের মওজুদ ওকাঁচামাল	১,৩০,০০০.০০	.....	১,৩০,০০০.০০
১৩.	ব্যবসায়ের জন্য ক্রীত মলের স্টক (ক্রয়মুল্য)	৩,০০,০০০.০০	.....	৩,০০,০০০.০০
১৪.	ব্যবসায়ের জন্য তৈরি মওজুদ মাল (বাজার দামে)	৫,০০,০০০.০০	.....	৫,০০,০০০.০০
	মোট	১২,১০০,০০০.০০	১০৮,৫০,০০০.০০	১২,৫০,০০০.০০

ক্রমিক সংখ্যা	দায়- দেনা	সর্বমোট	যাকাত বহির্ভূত দায়- দেনা	যাকাত দায়- দেনা
১.	মর্টহেজ ওবন্ড	১,০০,০০০.০০	.....	১,০০,০০০.০০
২.	ব্যাংক ঋণ ওব্যবসায়ের মলামাল ক্রয় বাবদ ঋন	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	.....
৩.	ব্যবসায়ের দায়	১,০০,০০০.০০	১.০০,০০০.০০	.....
৪.	কিস্তিতে কেনার জন্য দেনা	২,০০,০০০.০০	.....	২,০০,০০০.০০
৫.	অন্যান্য দেয়	১,০০,০০০.০০	.....	১,০০,০০০.০০
	মোট	৭,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০	৪,০০,০০০.০০

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত নিরুপণ ঃ

১. যাকাত প্রদানযোগ্য সম্পদ = ১২,৫০,০০০.০০

২. যাকাত প্রদেয় দায়-দেনা = ৪,০০,০০০.০০

মোট যাকাত প্রদান যোগ্য সম্পদ = ১৬,৫০,০০০.০০

* যদি চান্দ্র বছরে যাকাত দেয়া হয় তা হলে ২০৫% হারে যাকাতে হবে= ৪১,২৫০.০০ টাকা।

এ টাকা রমযানে মাসে পরিশোধ করা উত্তম।

*যদি চান্দ্রমাসে যাকাত দেয়া হয় তা হলে কারো কারো মতে ,উক্ত ৪১,২৫০.০০টাকার সাথে এর আরো ৩% বাড়িয়ে দিতে হবে।কারণ চান্দ্র বছর হয় ৩৫২/৪৫ দিনে আর সৌর বছর হয় ৩৬৫ দিনে। এ ১৩ দিনে ৩% বেশি হবে।

৪১.২৫০+১,২৩৭.৫০ টাকা=২,৪৮৭.৫০ টাকা। এই যাকাত বর্ষ শেষে হিসেব করার পরপরই দিতে হবে।[৯৩]

বাংলাদেশে যাকাত (সম্ভাব্য)পরিমাণ নির্ধারণ ঃ

যে সকল খাত হতে যাকাত আদায় করা যায় তার একটি ধারণা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এ সকল খাত হতে (সম্ভাব্য) কি পরিমাণ যাকাত আদায় করা যেতে পারে এ সম্পর্কে প্রথমেই দেখা যাক , কৃষি শস্য হতে (সম্ভাব্য) কি পরিমাণ যাকাত (উশর) আসতে পারে।

১.কৃষি শস্যের মোট মূল্য নির্ধারণঃ

নিম্নোক্ত চিত্রে বাংলাদেশের ১৯৯০-১৯৯১ সালের চলতি হিসাব অনুযায়ী কৃষি শস্য , গৃহপালিত পশু খামার, মৎস ও বনজ সম্পদের মোট মূল্য নির্ধারণ করা যায়।

Table-1

Total value -added of Agricultural crops of Bangladesh
(At current price of 1990-91 in Taka)[৯৪]

Division	Agri	Livestock and poultry	Fisheries	Forestry	Total
Chittagong	5028.4	636.3	695.9	1517.9	7878.7
Dhaka	5635.4	687.8	538.9	1679.3	7031.7
khulna	4382.1	532.0	1157.9	627.7	6699.7
Barisal					
Rajshai	6542.5	815.4	278.2	75.3	7711.4
Bangladesh	21,588.4	2,671.7	2,670.9	3,900.2	29321.5

[৯৩].অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন , প্রাগুক্ত : পৃঃ ২২-২৩

[৯৪].BBS. Bangladesh Statistical Year Book .1992,P.114

Dhaka University Institutional Repository

২.সেচের আওতাভুক্ত ও আওতা-বহির্ভূত ভূমির পরিমাণ

বাংলাদেশে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৩,৪৭,৮৬,০০০ একর এবং এতে সেচের আওতাভূক্ত ও বহির্ভূত জমির শতকরা যথাক্রমে ২০.৮% এবং ৭৯.২% ভাগ। চিত্রের সাহায্যে তা দেখানো হলো ঃ

Table-2
Percentage distribution of Irrigated and non-irrigated Land
In Bangladesh as of 1990-91[৯৫]

	Total Cropped Area		3,47,8400 acres
A.	Single cropped Area Double cropped Area Triple cropped Area	81,40,000 acres 96,34,000 acres 24,24,000 acres	
B.	Irrigated Land Area(% of total Irrigated Land)		72, 55,170, acres (20.8%)
C.	Non-Irrigated Land(A-b)(% of total Irrigated Land)		2, 75, 28,830acres (79.2%)

৩.সেচ ভুক্ত ও সেচ বহির্ভূত জমির একর প্রতি উৎপাদন (হিসাব ১৯৯০-৯১)

বাংলাদেশের সেচভূক্ত জমির একর প্রতি উৎপাদন ২৩.৫ মন এবং সেচ বহির্ভূত জমিতে একর প্রতি উৎপাদন ১৩.০৩ মন চিত্রের সাহায্যে তা দেখানো হলঃ[৯৬]

Table-3

		Local	HYV	Total
A.	Area in '000' acres	14.420	11,358	25,778
B.	Production in '000' M. tons	6.957	9,888	16,845
C.	Per acre Production (Maund) [(B*27)#A]	13.03	23.5	17.6

[৯৫].Table developed from BBS Statistical Year Book : 1992. P.148

[৯৬].Statistical Year Book -1992.P. 168

Dhaka University Institutional Repository

৪.উশরের নিসাব নির্ধারণঃ

ইসলামের বিধান অনুসারে উৎপাদিত ফসলে ৫ ওয়াসক বা ২৬.৫ মণ হলে তার উশর প্রদান করতে হবে। ফসল যদি বছরে একাধিকবার হয় তবে প্রতিবারই উশর প্রদান করতে হবে। ফসল যদি বছরে একাধিকবার হয় তবে প্রতিবারই উশর দিতে হবে।উশরযোগ্য জমির (সেচাধীন ও বহির্ভূত ফসলের) সর্বনিম্ন পরিমাণ নিম্নে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল ঃ

Table-4

Determination of Nisab Level Farm Size [৯৭]

		Irrigated	Non-Irrigated
A.	Per acre Production(Maunds)	13.03	23.5
B.	Nisab level farm size (in acres) [5wasac or 26.5 maund #A]	1.13	2.03

The Statistical Year Book 1992 of Bangladesh provides three categories of land holding by farm sizes. They are

Small	0.05-2.49 acres
Medium	2.5-7.49 acres
Large	7.5and above

এ সম্পর্কে এম. জহুরুল ইসলাম বলেন ,

"The size of small farm ranges from 0.5 acre to 2.49 acres .this means that the higher limit of the small farm size range is still above the nisab level land being 2.03 acres for non-irrigated and 10.13 acres far irrigated land . Thus all the Medium and Large farm holding are subject to ushr. Table 5 depicts that 71.02% of cultivable land comprising Medium and large Farm holding are subject to usher payment"[৯৮]

Table-5

Percentage of total cultivable land subject to Ushr payment.[৯৯]

Small farm [0.05-2.49 acres]	70,66,000	65,73,000	28.98%
Medium farm [2.5-7.49 acres]	2483.00	1,02,26,000	
Large Farm[7.5and avobe]	4,97,000	58,79,000	71.02%
Total	100,45,000	2,26,78,000	100%

---

[৯৭].Statistical Year Book -1992.P. 168

[৯৮].A Board of Editors , Thoughts on Economics, The Quarterly journal of Islamic Economics Research Bureau ,(Dhaka : December, 1994),vol. 4, No. 3&4, P.77

[৯৯].Source: Statistical Year Book, 1992.

Dhaka University Institutional Repository

৬.কৃষি ক্ষেত্রে কি পরিমাণ ফসল এবং তা থেকে কি পরিমাণ উশর আদায় করা যেতে পারে , এ সম্পর্কিত একটি চিত্র এখানে উল্লেখ করা হল -

Table-6

Calculation 0f Ushr on Agricultural Crop (at 1990-91 current price)[১০০]

A.	Value of Agri-crops subject Ushr (71.02% of total value Agri-crops TK. 21588.9 crores)3/	TK.15,332.44crores
B.	Value of Agri-crops subject to Non-Irrigated Land(79.2% of TK. 15,332.44 crores)	TK.3.189.14 crores
C.	Value of Agri-crops subject Non-Irrigated Land (79.2% of TK.15.332.44crores)	TK.12,143.29 crores
D.	Ushr to be collected from irragted land (5%of TK.3,189.14 crores)	TK. 159.46 crores
E.	Ushr to be collected from non- irragted land (10%of TK. 12,143.29crores)	TK. I,214.33crores
F.	Total Ushr to be collected from agri crops (D+F)	TK. 1373:79 crores

৭নগদ অর্থ ব্যাংকসহঃ

এ ক্ষেত্রে যে পরিমাণ যাকাত আসতে পারে নিম্নে চিত্রের সাহায্যে তার একটি হিসাব দেয়া হলোঃ

Table-7

Deposits of Scheduled Bank by tupe and the Amount Zakat to be collected on them (1990-91 current price)[১০১]

Typs of Deposits		Amount	Rate of Zakat	(Taka in croes) Amount of Zakat
A.	Time deposits	21,472.6	2.5%	536
B.	Total outstansding balance of post office savings Bank dposits (A 89-90)	268.4	2.5%	7.5
Total (A+B)		21,741.0	2.5%	543.5

১০০.Source : Table 1 to 5 above

১০১.Based on data show in Bangladesh Statistical Year Book 1992 BBS, P.414.

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে আদায় করা যেতে পারে ৫৪৩কোটি টাকা । আর কৃষিজ সম্পদ থেকে আদায় করা যায় ১৩৭৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা । উভয় ক্ষেত্রে মোট যাকাত আদায় করা যায় ৫৪৩.৫ কোটি + ১৩৭৩.৭৯কোটি =১৯১৭.২৯ কোটি টাকা।

খাদ্যশস্য ছাড়াও অন্যান্য ফসল যেমন- পাট , চা, তামাক, রবিশস্য ও অন্যান্য ফসল (যার যাকাতযোগ্য পরিমাণ হবে অন্তত ৫০০ কোটি টাকা) হতে অর্ধ উশর(৫%) আদায় করা হলে ২৫কোটি টাকার উশর আদায় হতে পারে।

দেশে ব্যবসায়ী শিল্প পণ্যের মূল্যের যাকাতযোগ্য পরিমাণ আনুমানিক ৪০০০ কোটি টাকা ধরা হলে যাকাতের পরিমাণ আসবে ১০০ কোটি টাকা। স্বর্ণ-রৌপ্য /অলংকারের মূল্য আনুমানিক ১০০০ কোটি টাকা হলে যাকাত আসবে ২৫ কোট টাকা। যাকাতের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক খাতকে হিসেবে না আনলে ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে যাকাত পাওয়া যেতে পারে । মোট -

১. খাদ্য শস্য থেকে	=	১৩৭৩.৭৯ কোটি টাকা
২.নগদ অর্থ থেকে	=	৫৪৩.০৫ কোটি টাকা
৩.অন্যান্য শস্য থেকে	=	২৫.০০ কোটি টাকা
৪.ব্যসসায়ী /শিল্প পণ্য থেকে	=	১০০.০০ কোটি টাকা
৫. স্বর্ণ /স্বর্ণালংকার থেকে	=	২৫.০০কোটি টাকা
মোট	=	২০৬৬.৮৪কোটি টাকা

যাকাতের এ পরিমাণ হিসাব করতে গিয়ে অমুসলিমদের ভূমি ও সম্পদকে আলাদা করে দেখানো হয়নি। যদি সংখ্যানুপাতে (১৩%) তাদের সম্পদের হিসেব আলাদা করা হয় তবে যাকাতের পরিমাণ হবে ১৭৯৮০১৪ কোটি টাকা।

যাকাতের মাধ্যমে আদায়কৃত এ পরিমাণ অর্থ যদি প্রতি বছর কেবল দরিদ্রদেরকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান, কর্মে নিয়োগ ও পুর্ণবাসনে ব্যয় করা হয় তবে কয়েক বৎসরেই বাংলাদেশের ছিন্নমূল মানুষ বলে কিছু থাকবে না। অবশ্য যাকাতের অর্থ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা যায় না। সে জন্য কর ও শুল্ক আদায় করতে হবে।[১০২]

---

১০২. আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল- হাদীসের অবদান ঃ প্রাগুক্ত: পৃঃ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

৫. সার্বজনীন নীতি ঃ

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য একটি ব্যাপক এবং মারাত্মক সমস্যা। দারিদ্র্যের এ অভিশাপ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও এনজিও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে থেকে প্রতিটি বাজেটে সরকার একটি উল্লেখযোগ্য পরিমান অর্থ বরাদ্দ করছে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে। বর্তমান সরকার ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর লক্ষ্যে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যা উপরে "বাংলাদেশে দারিদ্র্যের বর্তমান পরিস্থিতি ও বিমোচন কর্মসূচী" শিরোনামের অধীন বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এখন ইসলামের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী সর্বজনীন কিনা তা প্রমান করার জন্য উপরে *দারিদ্র্য কি/সংজ্ঞা*দারিদ্র্য বিমোচন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ*বাংলাদেশে দারিদ্র্যের বর্তমান পরিস্থিতি ও বিমোচন কর্মসূচী*ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত নীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।এখন সার্বজনীনতা প্রমানের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।তা হলঃ

*এ বিধানের কোন ক্ষতিকর প্রভাব আছে কি?
*এ আইন সকলের জন্য মঙ্গলজনক কিনা ?
*এ বিধান প্রযোজ্য হলে কি প্রভাব পড়বে?
*জাগতিক সমস্যার কোন সমাধান হবে কিনা।
*অন্যান্য ধর্মে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে কিনাঃ

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলাম প্রণীত পদক্ষেপগুলো অবশ্যই সকলের জন্য মঙ্গলজনক ।এতে ক্ষতিকর কোন প্রভাব নেই। বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র অথচ জনবহুল দেশ।যা আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলে কিভাবে দারিদ্র্য পরিস্থিতি মোকাবেলা করব। তবে ইসলাম প্রণীত বিধানগুলো যদি আমাদের সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা সুফল ভোগ করতে পারব।আর এ দারিদ্র্য বিমোচন সকল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য।তাই অন্যান্য ধর্মে বিরূপ প্রভাবের কোন প্রশ্নই আসে না।এ ছাড়াও সরকার গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী ইসলামী দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল অবলম্বনে প্রণীত হলে আমাদের এ দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে যাকাত ভিত্তিক ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল প্রণয়ন করলে অবশ্যই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। তাই বলব যে , দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী নীতি অবশ্যই সার্বজনীন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটঃ

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ সংখ্যালঘুদের অধিকার
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ পররাষ্ট্রনীতি
তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ মানবাধিকার

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটঃ

অনাচার, অবিচার,শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ণের বিরুদ্ধে ইসলামী আদর্শ সোচ্চার, অবিচল। ইসলামে এ সব অপরাধের সামান্য নিশানা খুজে পাওয়া দুষ্কর। ইসলামী আদর্শ ও মূল্যোবোধ সর্বকালে, সর্বযুগে, সবর্ত্র গ্রহণীয় ও অনুকরণীয়। মানবতার মুক্তির কান্ডারী, দিশারী নবী মক্কায় নির্যাতন-নিপীড়ণের স্বীকার হয়ে মদীনার বুকে পাড়ি জমিয়েছিলেন। সেখানে তিনি রাজ সিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন । প্রতিষ্ঠা করলেন এক আদর্শ , অনুকরণীয় রাষ্ট্র । তিনি নিজে হলেন সেখানের শাসক । রাজনৈতিক অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন নিজেকে। মহানবীর অদুরদর্শিতা, প্রজ্ঞাচিত মনোভাব সকল সম্প্রদায়ের মনে নব অনুভূতির সৃষ্টি করল।

ইসলামের সুমহান বার্তা ছড়িয়ে দিলেন সবর্ত্র। দিকে দিকে সম্প্রসারিত হল এ আদর্শময়ী গ্রহণীয় বার্তা । দলে দলে জনগণ ইসলামের সুমহান পতাকা তলে ভীড় জমালেন। পারিবারিক, সামাজিক অনাচার, অবিচার রোধে আবশ্যক নীতি মালা পেশ করলেন। আদর্শ রাষ্ট্রনায়কের আদর্শ শাসন ব্যবস্থা পেশ করলেন। দেশের শাসন ব্যবস্থা কিরূপ হবে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার কি হবে, পরিপূর্ণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করলেন সেখানে। ইসলামের সুমহান রাজনৈতিক নির্দেশনা আজও সারা বিশ্ব-রাষ্ট্রনায়কদের নিকট অনুকরণীয় গ্রহণীয়। ইসলামের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার জন্যে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করব।

১)সংখ্যালঘুদের অধিকার

*১.বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থান ও মর্যাদা :

*২.ইসলামে সংখ্যালঘুদের অধিকার :

*৩.সার্বজনীন নীতি :

২)পররাষ্ট্রনীতি

*১.বাংলাদেশে পররাষ্ট্রনীতি :

*২.ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি :

*৩. সার্বজনীন আদর্শ:

৩.মানবাধিকার

*১.মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার কিঃ

*২.মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার এর মধ্যে পাথর্ক্য ঃ

*৩.বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক মানবাধিকারঃ

*৪.বাংলাদেশে মানবাধিকারের সমীক্ষাঃ

*৫.ইসলামে মানবাধিকারঃ

*৬.সার্বজনীনতাঃ

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছদ

সংখ্যালঘুদের অধিকার

দীর্ঘস্থায়ী এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত এ স্বাধীন বাংলাদেশ। আমাদের এ স্বাধীন ভূমি দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান আর ভারত বিভক্ত পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর আচারণ ছিল শোষণমূলক, নিপীড়ণমূলক। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচীতে অনষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দ্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী করাচীতে পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বাংলার গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর সাথে বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব দেন।

তাই দেখা যাচ্ছে, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বচন, ১৯৬২ সালের স্বাধীকার আন্দোলন ১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সরাসরি অবদান কম নয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীদের অন্যতম টার্গেট ছিল হিন্দু সম্প্রদায়।সেটা ছিল রাজনৈতিক কারণ।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রা দেশ ও জাতীয় উন্নতিতে সম্ভবপর অবদান রাখার চেষ্টা করছে। স্বাধীনতার ৩৪ বছরের মধ্যে সামান্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। আধুনিক বিশ্বে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি মডেল দেশ বললেও অত্যুক্তি হবে না। ইসলাম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মর্যাদা,অধিকার এবং নিরাপত্তা প্রদান করেছে। তাদের উপর নির্যাতন চালানোর কোন নির্দেশ প্রদান করে নি। ইসলামে 'সংখ্যালঘুদের অধিকার' বিশ্বমানবতার জন্য এক আদর্শের নমুনা। এ সর্ম্পকিত বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত ধারা বজায় রাখব।

১.বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থান ও মর্যাদা :
২.বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের মর্যাদা
৩.বাংলাদেশে সংবিধানে অধিকার ;
৪. ইসলামে সংখ্যালঘুদের অধিকার:
৫.সার্বজনীন নীতি;

Dhaka University Institutional Repository

১.বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থান ঃ

***সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিসংখ্যানঃ**

বাংলাদেশে যে সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক বাস করে তাদের মধ্যে অন্যতম হল হিন্দু , বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং অন্যন্য উপজাতি যেমন চাকমা, খুমি, গারো, সাওতাল, লুসাই, মগ,রাজবংশী প্রভৃতি। আদমশুমারী ২০০১[১] ইংরেজী এর তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার হিন্দু ৯.২%,বৌদ্ধ০.৭% খ্রিস্টান ০.৩% এবং অন্যান্য ০.১% বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা ৩১ টি এবং সংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ ৫ হাজার ৯শত।

উপজাতিদের মধ্যে শতকরা ৫০ এর অধিক হলো চাকমা। এখানে তাদের সংখ্যা হলো প্রায় ২,২৪,২৭৯জন এবং তাদের অন্যতম শাখা তন্চঙ্গদের জনসংখ্যা হল ১৮,৪৪০জন। এ হিসেবে এ অঞ্চলে চাকমাদের জনসংখ্যা দাড়াচ্ছে ২,৬০৭১৯ জন।[২]

চাকমারা বাস করে খাগড়াছড়িতে, মনিপুরী ও খাসিয়া বাস করে সিলেটে, সাওতাল ও ওরাল বাস করে বগুড়ায়, গারো জাতি বাস করে ময়মনসিংহে, হদি ও দালুই বাস করে নেত্রকোনায়।

২. বাংলাদেশের সংবিধানে অধিকার ঃ

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর ড.কামাল হোসেনের নেতৃত্বে রচিত বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রে বসবাসকারীদের মৌলিক অধিকার রক্ষা সম্বলিত যে অনুচ্ছেদগুলো রয়েছে তা হলঃ

শুধু বাংলাদেশের নাগরিকরা ভোগ করতে পারে এমন মৌলিক অধিকার ১২টিঃ

১.আইনের দৃষ্টিতে সমতাঃ

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী ।[৩]

অর্থাৎ ধনী-দরিদ্র, বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিক আইনের দ্বারা সমানভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে।

২. ধর্ম,বর্ণ,নারী-পুরুষ বৈষম্য করা যাবে না ঃ

ধর্ম,বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না এবং উক্ত কারণে নাগরিককে

১.আদম শুমারী ২০০১ ইং রিপোর্ট:

২.সুগত চাকমা; বাংলাদেশের উপজাতি: পৃঃ ৯ ; প্রকাশকাল ঃ ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫।

৩.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ; অনুচ্ছেদ ২৭

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ বিনোদন ও বিশ্রাম কেন্দ্রে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ বা ভর্তি হতে বঞ্চিত করা যাবে না । রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। তবে নারী, শিশু ও অনগ্রসর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারবে।[৪]

৩. চাকরির সমান সুযোগ:

প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ থাকবে । আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্রের চাকরিতে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা যাবে না।[৫]

৪.বিদেশী রাষ্ট্রের খেতাব প্রভৃতি গ্রহনঃ

রাষ্ট্রের পূর্বানুমতি ব্যতিত কোন নাগরিক বিদেশী কোন উপাধী, সম্মান , পুরস্কার বা খেতাব গ্রহন করতে পারবে না ।[৬]

৫. আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারঃ

বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল ব্যক্তি কেবল আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং আইনের বিধি ছাড়া কারো জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি করা যাবে না ।[৭]

৬. চলাফেরার স্বাধীনতাঃ

জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, এর যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে ।[৮]

৭.সমাবেশের স্বাধীনতাঃ

আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমাবেশ-শোভাযাত্রা ইত্যাদি করার অধিকার সকল নাগরিকের থাকবে।[৯]

৮.সংগঠনের স্বাধীনতা ঃ

জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সংগঠন করার অধিকার সকল নাগরিকের থাকবে।[১০]

৯.বাক স্বাধীনতাঃ

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা,

---

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান : অনুচ্ছেদ ২৮

৫. প্রাগুক্ত ; অনুচ্ছেদ ২৯

৬. প্রাগুক্ত ; অনুচ্ছেদ ৩০

৭. প্রাগুক্ত ; অনুচ্ছেদ ৩১

৮. প্রাগুক্ত ; অনুচ্ছেদ ৩৬

৯. প্রাগুক্ত ; অনুচ্ছেদ ৩৭

১০. প্রাগুক্ত ; অনুচ্ছেদ ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাঁধা-নিষেধ প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।[১১]

১০.পেশা ও বৃত্তির অধিকার ঃ

আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।[১২]

১১.ধর্মীয় স্বাধীনতা ঃ

আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।[১৩]

১২.গৃহ ও যোগাযোগের অধিকারঃ

আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের স্বীয় গৃহ নিরাপত্তা লাভের ও চিঠিপত্র ও যোগাযোগের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকবে।[১৪]

খ.বাংলাদেশে বসবাস কারী নাগরিক ও বিদেশীরা ভোগ করতে পারে এমন মৌলিক অধিকার ৬টি। যথা :

১.জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা অধিকার ঃ

আইনের বিধান ছাড়া কোন ব্যক্তিকে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।[১৫]

২.গ্রেপ্তার ওআটক সর্ম্পকে রক্ষাকবচ :

গ্রেফতারকৃত সকল ব্যক্তি তার মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শ ও তার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।[১৬]

৩.জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ:

সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ এবং এর লংঘন আইনগত দন্ডনী অপরাধ। তবে ফৌজদারী দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই বিধান কার্যকর হবে না।তবে জনগণের উদ্দেশ্যে সাধনকল্পে রাষ্ট্র আইনের দ্বারা বাধ্যতামুলক শ্রমের বিধান করতে পারবে।[১৭]

---

[১১]. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ; অনুচ্ছেদ ৩৯

[১২]. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ৪০

[১৩]. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ৪১

[১৪].প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ৪৩

[১৫].প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ৩২

[১৬].প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ৩৩

[১৭]. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

৪.বিচার ও দন্ড সর্ম্পকে বিধান :

অপরাধ সংঘটনকালে বলবৎ আইনে বর্ণিত দন্ডের বেশি দন্ড দেয়া হবে না। এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার দন্ডিত করা যাবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বাধীন ওনিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকার হবেন। কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না এবং কাউকে যন্ত্রণা দেওয়া বা নিষ্ঠুর, অমানুষিক ও লাঞ্ছনাকর দন্ড দেয়া যাবে না।[১৮]

৫.ধর্মীয় স্বাধীনতা :

আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।[১৯]

৬.সাংবিধানিক প্রতিকার পাওয়ার অধিকার ঃ

মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য যে কোন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে মামলা রুজু করতে পারে।[২০]

সুপ্রিমকোর্ট কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে কোনো মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ বা নির্দেশ দান করতে পারবে।[২১]

রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারসমূহ লঙ্ঘন করে আইন প্রণয়ন করবে না।[২২]

১৯৭২ সালের প্রবর্তিত সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ছিল ৪টি। যথা ঃ ১) জাতীয়তাবাদ[২৩] ২)সমাজতন্ত্র[২৪] ৩)গণতন্ত্র[২৫] ৪)ধর্মনিরপেক্ষতা।[২৬]

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার অবসান, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা না দেয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার না করা এবং ধর্মের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচারন বা নিপীড়নের অবসান। (বর্তমানে বিলুপ্ত)

---

১৮. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ৩৫
১৯. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ৪১
২০. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ৪৪
২১. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ১০২
২২. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ২৬
২৩ প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ৯
২৪. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ১০
২৫. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ১১
২৬. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ১২

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মনিরেপক্ষতাবাদ ইংরেজী সেকিউলারিজম শব্দের বাংলা অনুবাদ। গত আড়াই শত বছর থেকে এটা দুনিয়ার সর্বত্র একটি আদর্শের মর্যাদা লাভ করেছে।মুসলিম প্রধান দেশগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম কামাল পাশাই তুরস্কে এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। [২৭]

ধর্মীয় প্রবণতাকে মানুষের ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহর ও রাসুলের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নামই ধর্মনিরপেক্ষতা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই এর লক্ষ্য। সে হিসেবে ও মতবাদকে ধর্মহীনতা বলাই সমীচীন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের বিধান মেনে চলার বিরুদ্ধে এর কোন বিশেষ আপত্তি নেই বলে এ মহান উদারতার স্বীকৃতি স্বরুপ এর নাম ধর্মনিরপেক্ষতা রাখা হয়েছে।[২৮]

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী দ্বারা এ অনুচ্ছেদ(১২) বিলুপ্ত করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এ শব্দগুলো সংযোজন করা হয়েছে।

৩.বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের মর্যাদা :

বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৮৯.৭%হল মুসলমান ।[২৯] বাকী সব অন্যন্য জাতি, গোষ্ঠী। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে অনেক লোকই বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ছিলেন। প্রত্যেক সরকারের শাসনামলেই এমপি, মন্ত্রী ছিলেন।

বর্তমানে ২০০১ অক্টোবর নির্বচনের পর বর্তমান মন্ত্রীসভায় দুইজন সদস্য রয়েছেন। তারা হলেন ঃ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে আছেন এডভোকেট গৌতম চক্রবর্তী (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়) এবং অপর জন হলেন ঃ উপমন্ত্রী মনি স্বপন দেওয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়)। এছাড়া অনেক আমলা, সচিব রয়েছে যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছে।

তবে একথা সত্য যে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রত্যেক নির্বচনের পর পরই সাধারনত কিছু দিন সহিংস মনোভাব বিরাজ করে অনেকের মনে। ফলে নির্বাচনোত্তর কিছু সহিংসতা দেখা দেয়। পক্ষ বিপক্ষ দল পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়। তবে এটা হয় সাধারণত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে। কোন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নয়। রাজনৈতিক প্রতিহিংসাই

---

২৭. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ:অধ্যাপক গোলাম আযম ;আধুনিক প্রকাশনী :পৃঃ ৫

২৮. প্রাগুক্ত;পৃঃ৫

২৯. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫ইং :আদমশুমারী ২০০১ হিসেব অনুযায়ী ।

Dhaka University Institutional Repository

সহিংসতার রূপ নেয়। অনেক সময় দেখা যায় যে সহিংসতার কোন সম্ভাবনা নেই তারপরও সমূহ সহিংসতার আশংকায় অনেক হিন্দু সম্প্রদায় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে অবস্থান করে। আসলে তারা সেখানে সুযোগ সুবিধা বেশি পায় বিধায় তারা সেখানে যায়। বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তেমন কোন দাঙ্গার নজীর এ বাংলাদেশে নেই। যেমন ভারতে আছে।

১৯৯২সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের হিন্দু মৌলবাদীরা ১৬শ শতাব্দীর সম্রাট বাবরের নির্মিত উত্তর প্রদেশে অযোধ্যার বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে। তাদের যুক্তি ছিল খোড়াযুক্তি, অনুমানভিত্তিক। তারা যুক্তি দেখালো যে, সেখানে রাম মন্দির ছিল। সম্রাট বাবর সেটাকে ভেঙ্গে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। জাতিগত দাঙ্গায় সেখানে অসংখ্য মুসলমান শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল।

কিন্তু বাংলাদেশে যে রকম হওয়ার কথা ছিল অথবা আশংকা করা হয়েছিল তা হয়নি। বর্তমানে অর্থাৎ ২০০৩,২০০৪,২০০৫সালে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান পরিষদ, পূজা কমিটির আহবায়ক এ কথা স্বীকার করেছেন যে, তারা নির্বিঘ্নে পূজা উৎসব সহ অন্যান্য উৎসব পালন করেছেন। কোথাও কোন সহিংসতা দেখা যায়নি।

এ থেকে বুঝা যায় যে বর্তমানে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুন্দর ভাবে বজায় আছে।

৪.ইসলামে সংখ্যালঘুদের অধিকার :

ইসলাম শান্তির ধর্ম। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার সুমহান আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতে পারবে নিশ্চিন্তে নির্দিধায়।ঐতিহাসিক মদীনার সনদে স্ব স্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতার কথা নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের জানমাল হিফাজতের অধিকার এবং ধর্মীয় সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও নাগরিক অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। ইসলাম অমুসলিমদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছে। অধিকারগুলো হল ঃ

ঃ জীবন রক্ষার অধিকার ঃ

অমুসলিম নাগরিকের রক্তের মূল্য মুসলমানদের রক্তের মূল্যের সমান।কোন মুসলমান যদি অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, তাহলে একজন মুসলমান নাগরিককে হত্যা করলে যেমন তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হতো ঠিক তেমনি তাকেও মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর আমলে জনৈক মুসলমান অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি খুনীকে মৃত্যুদন্ড দেন।[৩০]

---

[৩০].ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী। আহসান পাবলিকেশন : পৃঃ ১২

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেনঃ

যে নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই।[৩১]

হযরত ওমর (রাঃ)এর আমলে বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তি জনৈক হীরাবাসী অমুসলিম যিম্মীকে হত্যা করে। তিনি খুনীকে নিহত ব্যক্তির উত্তারাধিকারীদের হাতে সমর্পণের আদেশ দেন। অতঃপর তাকে উত্তারাধিকারীদের হাতে সমর্পণ করা হলে তারা তাকে হত্যা করে।[৩২]

হযরত উসমান (রাঃ) এর আমলে হযরত ওমরের ছেলে উবায়দুল্লাহকে হত্যার পক্ষে ফতোয়া দেয়া হয়। কেননা তিনি হযরত ওমর (রাঃ) এর হত্যার সাথে জড়িত থকার সন্দেহে হরমুযান ও আবু লুলুর মেয়েকে হত্যা করেন।[৩৩]

হযরত আলী (রাঃ) এর আমলে জনৈক অমুসলমান এর হত্যার দায়ে গ্রেফতার হয়। যথারীতি দোষী সাব্যাস্ত হওয়ার পর তিনি মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেন । এসময় নিহত ব্যক্তির ভাই এসে বলল, আমি মাফ করে দিয়েছি। কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন, ওরা বোধ হয় তোমাকে ভয় দেখিয়েছে। সে বললো, না আমি রক্তপণ পেয়েছি এবং আমি বুঝতে পারছি যে, ওকে হত্যা করলে আমার ভাই ফিরে আসবে না। তখন তিনি খুনীকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন ঃ

আমাদের অধীনস্থ অমুসলিম নাগরিকদের রক্ত আমাদের মতোই এবং তাদের রক্তপণ আমাদের রক্তপণের মতোই ।[৩৪]

অপর এক বর্ণনা মুতাবিক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছিলেন ঃ

তারা আমাদের নাগরিক হতে রাযী হয়েছেই এ শর্তে যে, তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো এবং তাদের রক্ত আমাদের মতো মর্যাদাসম্পন্ন হবে।

এ কারনেই ফকীহগণ এ বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, কোনো অমুসলিম নাগরিক কোনো মুসলমানের হাতে ভুলক্রমে নিহত হলে তাকেও অবিকল সেই রক্তপণ দিতে হবে, যা কোনো মুসলমানের নিহত হবার ক্ষেত্রে দিতে হয়।[৩৫]

৩১.ইনায়া শরহে হিদায়া , ৮ম খন্ড পৃঃ ২৫৬

৩২.বুরহান : শরহে মাওদযাহিবুর রহমান, ৩য় খন্ড , পৃঃ ২৮৭ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার : প্রাগুক্ত পৃঃ১২

৩৩.ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার : প্রাগুক্ত পৃঃ ১২

৩৪.বুরহান , ২য় খন্ড ,পৃঃ ২৮২ পৃঃ

৩৫.দররুল মুখতার , ৩য় খন্ড , পৃঃ ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

জীবন রক্ষার অধিকার সম্পর্কে রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها توجد من

مسيرة اربعين خريفا

"যদি কোন ব্যক্তি কোন মু'আহিদ (যিম্মী)কে হত্যা করে তবে জান্নাতের ঘ্রান ও তার নসীব হবে না। অথচ চল্লিশ বছরের দূরত্বে থেকে ও জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে।"[৩৬]

এমন কি যিম্মীদের প্রতি জুলুম করা যাবে না। জুলুম করা থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেনঃ

الا من ظلم معاهدا او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه

شيئا بغير طيب نفسه فانا حجيجه يوم القيامة

"সাবধান! কেউ যদি কোন মু'আহিদের প্রতি জুলুম করে অথবা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা ক্ষমতা বহির্ভূত কোন কাজ তার উপর চাপিয়ে দেয় বা জোরপূর্বক তার থেকে কোন মালামাল নিয়ে যায় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ অবলম্বন করবো।"[৩৭]

যিম্মি হত্যা করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি কোন যিম্মীকে হত্যা করে তবে বিনিময় তাকেও হত্যা করা হবে।[৩৮]

এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে একজন অমুসলমান মুসলিমের সমান। এ কারণেই একজন অমুসলিম নাগরিকের রক্তপণ একজন মুসলিম নাগরিকের রক্তপণের সমান ধার্য করা হয়েছে।[৩৯]

নবী করীম (সঃ) এর জীবদ্দশায় আমর ইবন উমায়্যা নামক এক ব্যাক্তি 'আমির' গোত্রীয় দুইজন মু'আহিদকে অনিচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করলে রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাদের দিয়াত (রক্তপণ) মুসলামানদের সমান প্রদান করতে আদেশ দেন।[৪০]

ফৌজদারী আইনঃ

ফৌজদারী আইনে মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য সমান ঃ

৩৬.বুখারী শরীফ : সুত্র : মিশকাত শরীফ: পৃঃ ২৯৯

৩৭.আবু দাউদ শরীফ : সুত্র: মিশকাত শরীফ :পৃঃ ৩৫৪

৩৮.হিদায়া ৪র্থ খন্ড , পৃঃ ৫৪৬

৩৯.হিদায়া ৪র্থ খন্ড , পৃঃ ৫৭০

৪০.নায়লুল আওতার , ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৪৮ সুত্র : দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধের যে সাজা মুসলমানকে দেয়া হয়, অমুসলিম নাগরিককে ও তা দেয়া হবে। অমুসলিমের জিনিস যদি মুসলমান চুরি করে, কিংবা মুসলমানের জিনিস যদি অমুসলিম চুরি করে, তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই চোরের হাত কেটে ফেলা হবে । কারো উপর ব্যাভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে অপবাদ আরোপকারী মুসলমানই হোক আর অমুসলমানই হোক উভয়কে একই শাস্তি দেয়া হবে । অনুরূপ ভাবে ব্যাভিচারের শাস্তি ও মুসলিম ও অমুসলিমের জন্য একই রকম। তবে মদের বেলায় অমুসলিমদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।[৪১]

(ইমাম মালেকের মতে অমুসলিমকে মদের ন্যায় ব্যভিচারের শাস্তি থেকে ও অব্যাহতি দেয়া হয়েছে । ইমাম মালেকের অভিমতের উৎস হলো হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) এর এ সিদ্ধান্ত যে, অমুসলিম নাগরিক ব্যাভিচার করলে তার ব্যাপারটা তাদের সম্প্রদায়ের উপর ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ তাদের ধর্মীয় বা পারিবারিক আইন অনুসারে কাজ করতে হবে।)[৪২]

* দেওয়ানী আইন

দেওয়ানী আইনেও মুসলমান ও অমুসলমান সমান। তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, মুসলমানের সম্পত্তি যেভাবে হিফাযত করা হয় অমুসলিমের সম্পত্তির হিফাযতও তদ্রূপ করা হয়। সাম্যের অনিবার্য দাবী অনুসারে দেওয়ানী আইনের আলোকে মুসলমানের ওপর যেসব দায় দায়িত্ব অর্পিত হয় অমুসলিমের উপর তাই অর্পিত হয়।

ব্যবসায়ের যে সব পন্থা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তাদের জন্য ও নিষিদ্ধ। তবে অমুসলিমরা শুধুমাত্র শূকরের বেচাকেনা, খাওয়া এবং মদ বানানে , পান ও কেনাবেচা করতে পারবে।[৪৩]

কোন মুসলমান কোনো অমুসলিমের মদ বা শূকরের ক্ষতি সাধন করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।[৪৪]

দুররে মুখতারে আছে :

মুসলমান যদি মদ ও শূকরের ক্ষতি করে তবে তার মূল্য দিতে বাধ্য থাকবে।[৪৫]

---

৪১. কিতাবুল খারাজ , পৃঃ ২০৮,২০৯; আল -মাসবুত ,৯ম খন্ড পৃঃ ৫৭-৫৮

৪২.ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার । প্রাগুক্ত: পৃঃ ১৩

৪৩.আল-মাবসুত , ১৩শ খন্ড , পৃদঃ ৩৭-৩৮

৪৪.ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার । প্রাগুক্ত: পৃঃ ১৪

৪৫.দুররে মুখতার , ৩য় খন্ড , পৃষ্ঠা ২৭৩

Dhaka University Institutional Repository

সম্মানের হিফাজত ঃ

কোন মুসলমানকে জিহবা বা হাত পা দিয়ে কষ্ট দেয়া, গালি দেয়া, মারপিট করা বা গীবত করা যেমন অবৈধ, তেমনি এসব কাজ অমুসলিমের বেলায় ও অবৈধ।

দুররুল মুখতারে আছে :

তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং তার গীবত করা মুসলমানের গীবত করার মতোই হারাম।[৪৬]

অমুসলিমদের চিরস্থায়ী নিরাপত্তা ঃ

অমুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চুক্তি মুসলমানদের জন্য চিরস্থায়ী ভাবে বাধ্যতামূলক অর্থাৎ এ চুক্তি করার পর তারা তা ভাংতে পারেনা। অপরদিকে অমুসলিমদের এখতিয়ার আছে যে, তারা যতোদিন খুশী তা বহাল রাখতে পারে এবং যখন ইচ্ছা ভেঙ্গে দিতে পারে।

বাদায়ে নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

অমুসলিমদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দানের চুক্তি আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। মুসলমানরা কোন অবস্থাতেই তা ভাংতে পারে না। পক্ষান্তরে অমুসলিমদের পক্ষে তা বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ তারা যদি আমাদের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে চায় তবে তা করতে পারে।[৪৭]

অমুসলিম নাগরিক যতো বড় অপরাধই করুক, তাদের রাষ্ট্রীয় রক্ষাকবচ সম্বলিত নাগরিকত্ব বাতিল হয় না। এমনকি জিযিয়া বন্ধ করে দিলে, কোনো মুসলমানকে হত্যা করলে রাসূল (সঃ) এর সাথে বেয়াদবী করলে অথবা কোন মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করলেও তার নিরাপত্তার গ্যারান্টিযুক্ত নাগরিকত্ব বাতিল হয় না। এসব কাজের জন্য তাকে অপরাধী হিসেবে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু বিদ্রোহী আখ্যায়িত করে নাগরিকত্বহীন করা হবে না। তবে শুধু দুই অবস্থায় একজন অমুসলিম নাগরিকত্বহীন হয়ে যায়।

*এক যদি সে মুসলমানদের দেশ ছেড়ে গিয়ে শত্রুদের সাথে মিলিত হয়।

* দুই যদি সে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহে লিপ্ত হয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করে।[৪৮]

সম্পদের অধিকার ঃ

ইসলামে অমুসলিম যিম্মীদের সম্পদের অধিকার স্বীকৃত। এ কারনেই যিম্মীদের সম্পদ আত্মসাতকারীর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কঠোর হুশিয়ারী

---

৪৬. দুররুল মুখতার :৩য় খন্ড, পৃঃ ২৭৩-২৭৪

৪৭. দুররুল মুখতার :৭ম খন্ড, পৃঃ ১১২

৪৮. বাদায়ে ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৩; ফাতহুল কাদীর ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৮১-৩৮২

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চারণ করেছেন । হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফত কালে সেনাপতি খালিদ (রাঃ) হিরপার অধিবাসীদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন ;
তাতে ছিল ঃ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বৃদ্ধ হয়ে কর্মে অক্ষম হয়ে যাবে অথবা অন্য কোন কারনে বিপদ গ্রস্থ হবে, অথবা দরিদ্র হয়ে যাবে তাদের জিযিয়া মওকুফ করে দেয়া হবে। অধিকন্তু বায়তুল মাল হতে তাদেরকে এবং তাদের পরিবার বর্গকে ভাতা প্রদান করা হবে।[৪৯]

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাঃ) একদা এক বৃদ্ধ ইয়াহুদীকে ভিক্ষা করতে দেখে তাকে বায়তুল মালের খাযাঞ্চির নিকট পাঠিয়ে আদেশ দিলেন তাকে এবং তার মত অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য বায়তুলমাল থেকে ভাতার ব্যবস্থা করে দাও।যৌবনে তাদের থেকে জিযিয়া উসূল করে বার্ধক্যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেয়া ন্যায় বিচার নয়।[৫০]

খলীফা হযরত উমর (রাঃ) এর আমলের ঘটনা ঃ

কিছু সংখ্যক মুসলমান একজন ইয়াহুদীর জমিতে একটি মসজিদ নির্মান করেন। খলীফা হযরত উমর (রাঃ) এর কাছে এ সংবাদ পৌছে। তখন তিনি তখন মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার এবং উক্ত জমি খন্ড ইহুদীর মালিকে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। ১৯৩৩ খৃষ্টব্দে লেবাননের খৃষ্টান শিক্ষাবিদ অধ্যাপক কারদাহি লিখেছেন ঃ

বায়তুল ইহুদির সে বাড়িটি এখনো বিদ্যমান রয়েছে ।[৫১]

পারিবারিক বিষয়াদিঃ-

অমুসলিম পারিবারিক কর্মকান্ড তাদের নিজস্ব পারিবারিক আইন (Personal Low) অনুসারে স্থির করা হবে । এক্ষেত্রে তাদের ওপর ইসলামী আইন কার্যকার হবে না । আমাদের ঘরোয়া জীবনে যেসব জিনিস অবৈধ, তা যদি তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় আইনে বৈধ হয়, তাহলে ইসলামী আদালত তাদের আইন অনুসারেই ফায়সালা করবে ।

উদাহরণ স্বরূপ সাক্ষী ছাড়া বিয়ে, মুহর ছাড়া বিয়ে অথবা ইসলামে যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ তাদের সাথে বিয়ে যদি তাদের আইনের বৈধ থেকে থাকে, তাহলে তাদের জন্য এসব কাজ বৈধ বলে মেনে নেয়া হবে।খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাদের পরবর্তী সকল যুগে ইসলামী

৪৯.কিতাবুল আমওয়াল পৃঃ ৩৬

৫০.কিতাবুল খারাজ পৃঃ ৮৫

৫১.প্রাইভেট ইন্টারন্যাশনাল অফ ইসলাম লেকচার সিরিজ ;দি হেগ: ১৯৩৩ সুত্র : ইসলাম পরিচয়: ডঃ মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ : পৃঃ ২০৭ : ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারগুলো এ নীতিই অনুসরণ করেছে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয এ ব্যাপারে হযরত হাসান বসরীর কাছে নিম্নরূপ প্রশ্ন করেছিলেন :

খোলাফায়ে রাশেদীন অমুসলিম নাগরিকদেরকে নিষিদ্ধ মেয়েদের সাথে বিয়ে, মদ ও শুকরের ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দিলেন কিভাবে ?[৫২]

হযরত হাসান (রাঃ) লিখেছেন :

তারা জিযিয়া দিতে তো এজন্যই সম্মত হয়েছে যে,তাদেরকে তাদের আকীদা- বিশ্বাস অনুসারে জীবন যাপন করার স্বাধীনতা দিতে হবে। আপনার কর্তব্য পূর্ববর্তীদের পদ্ধতি অনুসরন করা, নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা নয়।[৫৩]

তবে কোনো ক্ষেত্রে যদি বিবদমান উভয় পক্ষে স্বয়ং ইসলামী আদালতে আবেদন জানায় যে, ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক তাদের বিবাদের ফয়সলা করা হোক, তবে আদালত তাদের ওপর ইসলামী শরীয়তের বিধান কার্যকর করবে। তাছাড়া পারিবারিক আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিবেদ যদি একপক্ষ মুসলমানের স্ত্রী ছিলো এবং তার স্বামী মারা গেলো। এমতবস্থায় এই মাহিলাকে শরীয়ত মুতাবিক স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত পুরোপুরি পালন করতে হবে।ইদ্দতের ভিতরে সে বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল হবে।[৫৪]

ধর্মীয় অনুষ্টানঃ-

অমুসলিমদের ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদি প্রকাশ্যভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে উদযাপন করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান এই যে, অমুসলিমরা তাদের নিজস্ব জনপদ এটা অবাদে করতে পারবে। তবে নির্ভেজাল ইসলামী জনপদগুলোতে ইসলামী রাষ্টের সরকার ইচ্ছা করলে তাদেরকে এ ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা ও দিতে পরবে, আবার কোনো ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করতে চাইলে তাও করতে পারবে।

বাদায়ে গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

যেসব জনপদ বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ নয়, সেখানে অমুসলিমদেরকে মদ ও শূকর বিক্রি, ক্রুশ বহন করা ও শঙ্খ ধ্বনি বাজানোতে বাধা দেয়া হবে না। চাই সেখানে মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা যতোই বেশী হোক না কেন। তবে বিধিবদ্ধ ইসলামী অঞ্চলে এসব কাজ পছন্দনীয় নয়। অর্থাৎ যেসব জনপদকে জুমুয়া, ঈদ ও ফৌজদারী দন্ডবিধি প্রচলনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তবে যে সমস্ত পাপ কাজকে তারাও

৫২.ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার । প্রাগুক্ত: পৃঃ ১৫

৫৩.ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার । প্রাগুক্ত: পৃঃ ১৫

৫৪.আল-মাবসূত . ৫ম খন্ড. পৃঃ ৩৮-৪১

Dhaka University Institutional Repository

নিষিদ্ধ মনে করে, যেমন ব্যাভিচার ও অন্যান্য অশ্লীল কাজ, যা তাদের ধর্মে ও নিষিদ্ধ সেসব কাজ প্রকাশ্যে করতে তাদেরকে সর্বাবস্থায় বাঁধা দেয়া হবে। চাই সেটা মুসলমানদের জনপদে হোক কিংবা তাদের জনপদে হোক।[৫৫]

কিন্তু বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদগুলোতে ও তাদেরকে শুধু মাত্র ক্রুশ ও প্রতিমাবাহী শোভাযাত্রা বের করতে এবং প্রকাশ্যে ঢাকঢোল বাজাতে বাজাতে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে প্রাচীন উপসনাগুলোর অভ্যন্তরে তারা সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে । ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করবে না।[৫৬]

*উপসনালয়

নির্ভেজাল মুসলিম জনপদগুলোতে অমুসলিমদের যেসব প্রাচীন উপসনালয় থাকবে, তাতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। উপসনালয় যদি ভেঙ্গে যায়, তবে একই জায়গায় পুনর্নির্মানের অধিকার ও তাদের আছে। তবে নতুন উপসনালয় বানানোর অধিকার নেই।[৫৭]

তবে যেগুলো নির্ভেজাল মুসলিম জনপদ নয়, তাতে অমুসলিমদের নতুন উপাসনালয় নির্মাণের অবাধ অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে যেসব এলাকা এখন আর বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ নেই, সরকার সেখানে জুময়া ঈদ ও ফৌজদারী দন্ডবিধির প্রচলন বন্ধ করে দিয়েছে, সেখানেও অমুসলিমদের নতুন উপাসনালয় নির্মান নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অধিকার রয়েছে।[৫৮]

অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে জনাব নঈম সিদ্দিকীর মতামতঃ

জনাব নঈম সিদ্দিকী ইসলামী সংবিধানের রূপরেখা নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তার গ্রন্থে যে সব ধারা উল্লেখ করেছেন তার কয়েকটি এখানে দেয়া হল ঃ

ধারা-১৫

যে ব্যক্তি এই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব , রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাথে পূর্ণ একমত পোষণ করবে না, এ রাষ্ট্রের সীমানায় সে অমুসলিম বলে গণ্য হবে। সে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের আইন কানুন মেনে নিয়ে অমুসলিম নাগরিক হিসেবে এ রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারবে।

---

৫৫. বাদায়া , ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৩

৫৬. শরহু সিয়ারিল কবীর , ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৫১

৫৭. বাদায়া , ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৪; শরহু সিয়ারিল কবীর ,৩য় খন্ড, পৃঃ ২৫১

৫৮. বাদায়া , ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৪ ; শরহু সিয়ারিল কবীর , ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৫৭

Dhaka University Institutional Repository

ধারা - ১৬

ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদেরকে মৌলিক মানবাধিকার এবং সাধারণ অধিকার ছাড়াও সেই সব অধিকার প্রদান করবে যা ইসলামী শরীয়া তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। শরীয়াত প্রদত্ত এসব অধিকার হরণ করার কিংবা কম বেশী করার ক্ষমতা কারো নেই। তবে সরকার সংগত মনে করলে নির্দিষ্ট অধিকারের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু অধিকার তাদের দিতে পারে, যদি তা ইসলামী শরীয়ার সাথে সাংঘার্ষিক না হয়।

ধারা- ১৭

যখন কোন অমুসলিম সাংবিধানিকভাবে অমুসলিমের অধিকার লাভ করবে অথবা অমুসলিমের অধিকার তাকে দেয়া হবে তখন এ অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে সে নিজেই যদি নিজেকে সে অধিকার থেকে মুক্ত ঘোষণা করে কিংবা সুস্পষ্ট গাদ্দারির মাধ্যমে রাষ্ট্রের আনুগত্য পরিহার করে, সেটা ভিন্ন কথা ।

ধারা-১৮

ক. মৌলিক মানবাধিকার ও সাধারণ অধিকারের ক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিমদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা হবে।

খ.ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনের ক্ষেত্রে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা হবে।

গ. মুসলমানদের যেসব আবাসিক এলাকায় নিজেদের ধর্মীয় নিদর্শনাবলী সংরক্ষিত আছে সেসব এলাকা ছাড়া দেশের সর্বত্র অমুসলিমরা তাদের ধর্মীয় ইমারত নির্মান এবং অনুষ্ঠান পালনের অধিকার লাভ করবে।

ঘ. অমুসলিমরা তাদের স্বধর্মের লোকদেরকে এবং শিশুদেরকে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করার অধিকার লাভ করবে এবং অমুসলিম আবাসিক এলাকায় নিজেদের ধর্ম প্রচার করতে পারবে। তাছাড়া আইনের সীমার মধ্যে থেকে নিজেদের ধর্মের সৌন্দর্য প্রকাশ এবং ইসলামের সমালোচনা করতে পারবে ।

ঙ. অমুসলিমদের পার্সোনাল বিষয়াদি তাদের পার্সোনাল 'ল' অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। ইসলামী আইন তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না। তবে তারাই যদি তা দাবি করে সেটা ভিন্ন কথা। অবশ্য কোনো বিষয়ে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সেটা সমাধান হবে রাষ্ট্রীয় আইনে ।

চ. নীতিগতভাবে অমুসলিমদের উপর রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব চাপানো হবে না, তবে তাদের উপর কেউ যদি স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব পালনের জন্যে নিজেকে পেশ করে তবে সেটা ভিন্ন কথা। তবে এই ট্যাক্স শুধু যুদ্ধ করার যোগ্য পুরুষদের উপরই আরোপ করা হবে । নারী, শিশু,বৃদ্ধ, বৈরাগী ও পঙ্গুদের উপর এ ট্যাক্স আরোপ করা হবে না। এ ছাড়া যারা রাষ্ট্রীয় কোনো সেবায় নিযুক্ত থাকবে তাদের উপরও আরোপ করা হবে না ।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-১৯

সংবিধানের আওতায় অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা লাভ করবে। এ উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক এ্যাসেম্বলী গঠন করবে যার দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে:

ক. অমুসলিমদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বধান।

খ. অমুসলিমদের দাবি-দাওয়াএবং অভিযোগ ও সমস্যাসমূহ সরকারের কাছে উপস্থাপন করা।

গ. সরকারে ত্রুটি বিচ্যুতি সমালোচনা করা এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যাবলীর ব্যাপারে নিজেদের মতামত প্রকাশ করা ।

ঘ. অমুসলিমদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী এবং তাদের পার্সোনাল ল সম্পর্কে আইনগত সুপারিশ তৈরি করা এবং পার্লামেন্টে পেশ করা। পার্লামেন্টে অনুমোদনের পরই তা আইন হিসেবে পরিগণিত হবে।[৫৯]

৫.সার্বজনীন নীতি

জাতিগত বিভেদ,সংঘাত, হত্যা, রাহাজানি, হিংসা-হানাহানি, বর্ণবাদী অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ-কৃষাঙ্গ লড়াই, হিংসা-প্রতিহিংসার সংবাদ আমরা প্রায়ই সংবাদ মিডিয়াগুলোতে দেখতে পাই,শুনতে পাই। জাতিগত সংঘাত নিরসনের জাতিসংঘের ব্যর্থ চেষ্টা ভূলিলুণ্ঠিত। ভারতে জাতিগত রক্ত,কাশ্মীরে স্বাধীনতার জন্য মুজাহিদদের লড়াই, আর হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্মম নিপীড়ণ, হত্যা যজ্ঞ, নিধন প্রায়ই সংবাদ মিডিয়াগুলোতে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। হিন্দুরা তাদের চরম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে ।

সে তুলনায় বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবস্থা অনেক উন্নত। যদিও বাংলাদেশে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত পরিষ্কার। ইসলামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার,কর্তব্য উপরে আলোচিত হয়েছে। সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতি মালা রয়েছে। যেমন ঃ

***জীবন রক্ষার অধিকার ঃ**

রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর আমলে জনৈক মুসলমান অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি খুনীকে মৃত্যুদন্ড দেন।[৬০]

৫৯.ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার । প্রাগুক্ত: পৃঃ ৩২

৬০.ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী ; আহসান পাবলিকেশন ; পৃঃ ১২

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেনঃ

যে নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই।[৬১]

জীবন রক্ষার অধিকার সম্পর্কে রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها توجد من

مسيرة اربعين خريفا

"যদি কোন ব্যক্তি কোন মু'আহিদ (যিম্মী)কে হত্যা করে তবে জান্নাতের ঘ্রান ও তার নসীব হবে না। অথচ চল্লিশ বছরের দূরত্বে থেকে ও জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে।" [৬২]

এমন কি যিম্মীদের প্রতি জুলুম করা যাবে না।

জুলুম করা থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেনঃ

الا من ظلم معاهدا او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه

شيئا بغير طيب نفسه فانا حجيجه يوم القيامة

"সাবধান! কেউ যদি কোন মু'আহিদের প্রতি জুলুম করে অথবা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা ক্ষমতা বহির্ভূত কো কাজ তার উপর চাপিয়ে দেয় বা জোরপূর্বক তার থেকে কোন মালামাল নিয়ে যায় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ অবলম্বন করবো।"[৬৩]

*ফৌজদারী আইনঃ

ফৌজদারী আইনে মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য সমান। অপরাধের যে সাজা মুসলমানকে দেয়া হয়, অমুসলিম নাগরিককে ও তা দেয়া হবে। অমুসলিমের জিনিস যদি মুসলমান চুরি করে, কিংবা মুসলমানের জিনিস যদি অমুসলিম চুরি করে, তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই চোরের হাত কেটে ফেলা হবে।

* দেওয়ানী আইন

দেওয়ানী আইনেও মুসলমান ও অমুসলমান সমান। তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো।

ব্যবসায়ের যে সব পন্থা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তাদের জন্য ও নিষিদ্ধ। তবে অমুসলিমরা শুধুমাত্র শূকুরের বেচাকেনা, খাওয়া এবং মদ বানানো, পান ও কেনাবেচা করতে পারবে।[৬৪]

কোন মুসলমান কোনো অমুসলিমের মদ বা শূকরের ক্ষতি সাধন করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।[৬৫]

---

৬১. ইনায়া শরহে হিদায়া, ৮ম খন্ড পৃঃ ২৫৬

৬২. বুখারী শরীফ : সুত্র : মিশকাত শরীফ পৃঃ ২৯৯

৬৩. আবু দাউদ শরীফ : সুত্র: মিশকাত শরীফ পৃঃ ৩৫৪

৬৪. আল-মাবসুত, ১৩শ খন্ড, পৃঃ ৩৭-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

***সম্মানের হিফাজত ঃ**

কোন মুসলমানকে জিহবা বা হাত পা দিয়ে কষ্ট দেয়া, গালি দেয়, মারপিট করা বা গীবত করা যেমন অবৈধ, তেমনি এসব কাজ অমুসলিমের বেলায় ও অবৈধ। দুররুল মুখতারে আছে :

তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং তার গীবত করা মুসলমানের গীবত করার মতোই হারাম।[৬৬]

***অমুসলিমদের চিরস্থায়ী নিরাপত্তা ঃ**

অমুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চুক্তি মুসলমানদের জন্য চিরস্থায়ী ভাবে বাধ্যতামূলক অর্থাৎ এ চুক্তি করার পর তারা তা ভাংতে পারেনা। অপরদিকে অমুসলিমদের এখতিয়ার আছে যে, তারা যতোদিন খুশী তা বহাল রাখতে পারে এবং যখন ইচ্ছা ভেঙ্গে দিতে পারে।

***সম্পদের অধিকার ঃ**

ইসলামে অমুসলিম যিম্মীদের সম্পদের অধিকার স্বীকৃত। এ কারনেই যিম্মীদের সম্পদ আত্মসাতকারীর প্রতি রাসুলুল্লাহ (সঃ) কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছন।

পারিবারিক বিষয়াদিঃ-

অমুসলিম পারিবারিক কর্মকান্ড তাদের নিজস্ব পারিবারিক আইন (Personal Low) অনুসারে স্থির করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের ওপর ইসলামী আইন কার্যকার হবে না। আমাদের ঘরোয়া জীবনে যেসব জিনিস অবৈধ, তা যদি তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় আইনে বৈধ হয়, তাহলে ইসলামী আদালত তাদের আইন অনুসারেই ফায়সালা করবে

ধর্মীয় অনুষ্ঠানঃ-

অমুসলিমদের ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদি প্রকাশ্যভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে উদযাপন করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান এই যে, অমুসলিমরা তাদের নিজস্ব জনপদ এটা অবাদে করতে পারবে। তবে নির্ভেজাল ইসলামী জনপদগুলোতে ইসলামী রাষ্টের সরকার ইচ্ছা করলে তাদেরকে এ ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা ও দিতে পরবে, আবার কোনো ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করতে চাইলে তাও করতে পারবে।

উপসনালয়

নির্ভেজাল মুসলিম জনপদগুলোতে অমুসলিমদের যেসব প্রাচীন উপসনালয় থাকবে , তাতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। উপসনালয় যদি ভেঙ্গে যায়, তবে একই জায়গায় পুননির্মানের অধিকার ও তাদের আছে। তবে নতুন উপসনালয় বানানোর অধিকার নেই।[৬৭]

---

৬৫. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার। প্রাগুক্ত: পৃঃ ১৪

৬৬. দুররুল মুখতার :৩য় খন্ড , পৃঃ ২৭৩-২৭৪

৬৭. বাদায়া , ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৪;শরহু সিয়ারিল কবীর ,৩য় খন্ড, পৃঃ ২৫১

Dhaka University Institutional Repository

কোন বিষয় সার্বজনীন হতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর বিশ্লেষণ করতে হয়। তা হল ঃ

*এ বিধানের কোন ক্ষতিকর প্রভাব আছে কি?
*এ আইন সকলের জন্য মঙ্গলজনক কিনা ?
*এ বিধান প্রযোজ্য হলে কি প্রভাব পড়বে?
*জাগতিক সমস্যার কোন সমাধান হবে কি ?
*অন্যান্য ধর্মে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে কিনা।

এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যদি আমরা ইসলামে সংখ্যালঘুদের প্রদত্ত অধিকারকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে, এ বিধান সকল জাতি, গোষ্ঠীর জন্য মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসবে। উপরে 'ইসলামে সংখ্যালঘুদের অধিকার' শিরোনামের অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ নীতিমালা আমাদেরকে স্পষ্ট ধারণা দেয় যে, বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার অধিকাংশ দিকই ইসলামী বিধিমালার অনুরূপ।

এ ছাড়াও সংখ্যালঘুদের অধিকারের ব্যাপারে ইসলামী বিধিমালা অত্যন্ত স্পষ্ট। ইসলামী আইন কখনো সংখ্যালঘুদের হত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ন করতে বলে না বা তাদেরকে দেশান্তরের হুমকি প্রদান করে না অথবা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে না বরং ইসলামই তাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে।

তাদের জীবন, সম্পদ, সম্মান, মর্যাদা প্রদান করাকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবেই বিধিবদ্ধ করে থাকে। তাদের সকল মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে ইসলামী নীতি অত্যন্ত পরিষ্কার। তাইতো এ আদর্শ সর্বজনীন। বিশ্ব ভুবন যদি এ আদর্শ অনুসরণ করে তাহলেই জাতিগত সংঘাত, হত্যা, নির্যাতন বন্ধ হবে। বিশ্ব সুন্দর এক পৃথিবী দেখবে। শান্তি ফিরে আসবে।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছদ
পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্রনীতি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রই কোনো না কোনো ভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তাই প্রতিটি রাষ্ট্রকেই অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ তাদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্বার্থ অর্জন ও সংরক্ষণ করতে চায়। একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির উপরই নির্ভর করছে প্রতিরক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পারস্পরিক, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং শত্রুতার অবসান। তাই পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি সফল ও আদর্শ রাষ্ট্রের এক অবয়ব বা প্রতিমূর্ত। এ পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক ইসলামী গ্রহণযোগ্য মতামত তুলে ধরার জন্য এভাবে পর্যায়ক্রমিক ধারায় আলোকপাত করা হল।

১.বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ঃ
২. ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি ঃ
৩. সার্বজনীন আদর্শ ঃ

১.বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিঃ

স্নায়ুযুদ্ধোত্তর নতুন বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিটি দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। ইতোপূর্বে স্নায়ুযুদ্ধের কারণে বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে সামরিক বিষয়াদি গুরুত্ব পেত। এখন তার অবসান হয়েছে। বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তন এবং শক্তিবলয়ে রূপান্তরের প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রনীতির বির্বতন অনিবার্য হয়ে উঠে। স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ও একটি বৈদেশিক নীতি রয়েছে, যা সার্বিক পরিচয় ও অবস্থানের আলোকে নির্মান, বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটেছে।

১.১বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্যঃ

প্রত্যেক দেশের পররাষ্ট্রনীতির মত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ও কতগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হল ঃ

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ঃ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগলিক অখন্ডতা বজায় রাখা। বাংলাদেশ শান্তিকামী দেশ। এটা কোন দেশের প্রতি আগ্রাসী ভূমিকা পালনে অগ্রহী নয় এবং অন্য কোন দেশ তার প্রতি আগ্রাসী ভূমিকা পালন করুক তাও তার কাম্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

*অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ

অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত ভূখন্ডগত স্বাধীনতা অর্থহীন। মূলত বাহ্যিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পরই অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রশ্নটি আসে। একটি আত্মমর্যাশীল জাতি হিসেবে টিকে থাকার জন্যে ও চাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অথচ বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ। তাই আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

* আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ঃ

স্নায়ুদ্ধোত্তর বর্তমান বিশ্ব হচ্ছে সহযোগিতার বিশ্ব। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া কোন রাষ্ট্রই উন্নতি লাভ করতে পারে না। শান্তি, সমৃদ্ধি, স্থিতিবস্থা ও নিরাপত্তার জন্যেও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশ পররাষ্ট্রনীতির এটিও একটি উদ্দেশ্য।

*অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী। তবে কারো অভ্যন্তরীণ কাজে হস্তক্ষেপ করা বাংলাদেশের কাম্য নয়।

*সকল প্রকার বর্ণবাদ, ইহুদীবাদ, উপনিবেশবাদ ও সম্প্রসারণবাদ দূরীকরণ এবং এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এর অপর একটি উদ্দেশ্য।

*নৈতিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও তার প্রয়োগ।

*বিদেশে বাংলাদেশের জাতীয় সম্মান ও মর্যাদা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করা এবং

*একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা হিসেবে টিকে থাকা।

১.২ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নীতিমালা(Principles of Bangladesh Foreign Policy)

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য। এছাড়া বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ও সদস্য। স্বাভাবিক কারণে জাতিসংঘ ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতিমালাও মেনে চলবে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মুসলিম ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করে এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন ও.আই.সি-এর সদস্য। তাছাড়া আঞ্চলিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সার্কের উদ্যোক্তা এবং অন্যতম সদস্য। তাই বাংলাশের পররাষ্ট্রনীতিতে এসব সংগঠনের নীতিমালারই প্রতিফলন পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল নীতিমালাগুলো নিম্নরূপঃ

১)'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়' এটাই হল অন্যতম মূলনীতি। বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য। এখানে উদ্দেশ্য যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়" কথাটি বহুল ব্যবহৃত হলেও বাংলাদেশের সংবিধানে কোথাও এটি উল্লেখ করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

২) অন্যান্য দেশের সার্বভৌমত্ব, ভৌগলিক অখন্ডতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা ;
৩) জাতিসংঘের গৃহীত নীতিমালা মেনে চলা;
৪) আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান এবং কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা;
৫) সব দেশের সাথে শান্তি পূর্ণ সহাবস্থান ;
৬) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হওয়া থেকে বিরত থাকা।
৭) জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতিমালা অনুযায়ী কোন দেশের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ইত্যাদি ।

১.৩ পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহঃ (Determinants of Foreign Policy)

কোন দেশ খেয়াল খুশিমত পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে পারে না। কতকগুলো বিষয় রয়েছে যা পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে থাকে ।এসব বিষয়কে নির্ধারক বা Determinants বলা হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহ হলো ঃ

১.ভৌগলিক অবস্থান

যে কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সে দেশের ভৌগলিক অবস্থান, আয়তন, সীমান্ত প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় আনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় দেখা যায় ঃ-

প্রথমতঃ ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশ তিন দিক থেকে ভারতীয় ভূখন্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং আমাদের একমাত্র Gateway হলো বঙ্গোপসাগর। তাছাড়া মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের যে ২২০ কিমি.সীমান্ত রয়েছে তা-ও নিরাপদ নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ ভারতের সাথে ৫৪ টি অভিন্ন নদীর পানি প্রবাহ এবং ভাটির দেশ হিসেবে ভারতের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া ছিটমহল, সীমান্ত নির্ধারণ ও পুশইন-পুশব্যাকের বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

২.অর্থনৈতিক অবস্থাঃ

কোন রাষ্ট্রের অর্থনীতি সে দেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম নির্ধারক। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যে দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থানে রয়েছে তা তার পররাষ্ট্রনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। একটি বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে সবসময়ই দাতা দেশ ও সংস্থার মর্জির প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। এমনকি রপ্তানি বাণিজ্যের দুর্বল অবস্থানহেতু প্রধান আমদানিকারক দেশগুলোর অবস্থানকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। তাই দেখা যায়, বাংলাদেশ পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডাসহ ঋণদানকারী দেশ এবং বিশ্বব্যাংক,

Dhaka University Institutional Repository

আই. এম.এফ. এশিয়া উন্নয়নে ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রেসক্রিপশন অনুসরণ করে থাকে।[১]

৩.সামরিক শক্তি ঃ

সামরিক শক্তির মাত্রা ও ধরণ একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতির চরিত্র নির্ধারণে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের সামরিক শক্তির বর্তমান যে অবস্থা তাতে বাংলাদেশ কখনোই কোনো আগ্রাসী নীতির আশ্রয় নেয়াকে যৌক্তিক মনে করে না। এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সামরিক শক্তির সাথে যে ভারসাম্যহীনতা তা বাংলাদেশকে অনেক ক্ষেত্রে নতজানু নীতি গ্রহণে বাধ্য করে।

৪.জনসংখ্যা ঃ

৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট বাংলাদেশে প্রায় ১৪ কোটি লোকের বাস। যে কোনো বিচারেই এ জনগোষ্ঠীর আয়তন বিশাল। জনসংখ্যার এ আধিক্য আমাদের পররাষ্ট্রনীতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। যেমন ঃ

প্রথমত ঃ এ বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ নানাবিধ প্রয়োজন মেটাতে আমাদের সরকারকে প্রতিনিয়ত বৈদেশিক সাহায্যের জন্য ধারণা দিতে হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ দেশের অভ্যন্তরে এ বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় বাংলাদেশকে মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানির বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় আনতে হয়।

৫.রাজনৈতিক দল ঃ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের নিজস্ব অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি ও অনেকটা প্রভাব ফেলে। প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গিই এ ক্ষেত্রে প্রধান হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। তবে ক্ষমতাসীন দলকে তাদের নিজস্ব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকেও আমলে আনতে হয়।

৬. মতাদর্শ ঃ

কোন একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে জনগণের বিশ্বাস, সামাজিক মূল্যবোধ নানাভাবে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই এ দেশের যে কোনো সরকারকেই মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোসহ মুসলিম বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হয় এবং এ নীতির যে কোন পরিবর্তন জনগণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। তাছাড়া বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়তা করে থাকে।

---

[১] .প্রফেসরস বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী : পৃঃ ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

৭.আঞ্চলিক অবস্থানঃ

দক্ষিন এশিয়ার একটি দেশ হিসেবে এ অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান আমাদের পররাষ্ট্রনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যেমনঃ

প্রথমত ঃ পাকিস্তান ও ভারতের মতো দুই বৈরী প্রতিবেশীর পাশে বাংলাদেশের অবস্থান তাকে শান্তি প্রয়াসে অগ্রণী ভূমিকা পালনের সুযোগ এনে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে তার সর্বোচ্চ প্রয়াস চালিয়ে এসেছে।

দ্বিতীয়ত ঃ সামরিক শাসন ও উপজাতীয় দ্বন্দে জর্জরিত মিয়ানমার, উপজাতীয় সংকটে নিপতিত শ্রীলংকা, সার্বক্ষণিক দ্বন্দে লিপ্ত ভারত-পাকিস্তান এবং অদূরে ভারতের বৈরী প্রতিবেশী চীনের অবস্থান হওয়ায় বাংলাদেশের কূটনৈতিক গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের এ অবস্থান আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় অঙ্গনে বাংলাদেশের অনেক গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। কেননা পাকিস্তান, মিয়ানমার, শ্রীলংকা কিংবা নেপালেনর তুলনায় এখানে বিনিয়োগের পরিবেশ অনেক ভালো।

৭.আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদ ঃ

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য এবং একটি সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে তাকে জাতিসংঘের চুক্তি-সনদ ওনিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হয়। সুতরাং বাংলাদেশকে তার পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। তাছাড়া বাংলাদেশকে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হিসেবে এর নীতিকে ও শ্রদ্ধ দেখাতে হয়। এমনকি বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

২.ইসলামে পররাষ্ট্রনীতিঃ

ইসলামে পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা মানবিক ভ্রাতৃত্ব, শান্তিও সন্ধি। সব মানুষ আদম সন্তান, অতএব সবদেশের সব মানুষের সহিত ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আচারণ পাওয়ার অধিকার সব মানুষের। কখনও কোন জাতি বা রাষ্ট্রের সাথে কোনরূপ বিবাদ হলে তা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে মীমাংসা করে লওয়া এবং সন্ধি ও মৈত্রীর চুক্তি করা অবশ্যই কাম্য।[২]

---

[২].ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম: শায়রুন প্রকাশনী :১৩ কারকুন বাড়ী লেন, প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ১৯৮৭ : পৃঃ ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ মানবতার জন্য এক শান্তি ও সম্প্রীতির প্রতীক বা নিশানা । যা গোটা জাতি বা উম্মাহ থেকে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নিরসন ঘটায়, শান্তি স্থাপন করে, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলে। মানুষ দুনিয়ায় আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। আল -কুরআনে বলা হয়েছেঃ

واذ قال ربك للملئكة انى جاعل فى الارض خليفة .قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك .قال انى اعلم ما لا تعلمون

"আর স্মরণ কর, তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদের বললেন ঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, তখন তারা বলল ঃ আপনি কি সেথায় এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে সেখানে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? আর আমরাতো সদা আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন ;অবশ্যই আমি জানি যা তোমরা তা জাননা ।"[৩]

সুতরাং পৃথিবীতে মানুষ রক্তপাত আর অশান্তি ঘটাবে এজন্য আল্লাহ তায়ালা মানুষ জাতিকে পৃথিবীতে পাঠাননি বরং তারা হল আল্লাহর প্রতিনিধি।আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তাকে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।সকল প্রতিনিধি প্রতিবেশীর সাথে সুসামঞ্জস্য রাখতে হবে। দেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি উপরে আলোচিত হয়েছে। ইসলামের সুমহান পররাষ্ট্রনীতি যে সকলের জন্য কল্যাণময়ী তার যুক্তিসংগত ও তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনার জন্য ইসলামের পররাষ্ট্রনীতির স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হল ঃ

২.১ সন্ধি করাঃ

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে তথা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক সৌহার্দ্য,সম্প্রীতির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় সন্ধি চুক্তি স্থাপন করতে হবে।এর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে বিবাদ, হিংসা -হানাহানি,সমস্যার সব কিছুর নিরসন সম্ভব।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেনঃ

وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله.انه هو السميع العليم.

"কাফির যদি সন্ধি করার জন্য নতি স্বীকার করে তবে তাদের এ নীতি স্বীকারকে তুমি গ্রহণ কর এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভর কর। নিশ্চয়ই তিনি সব শুনেন এবং সব জানেন।" [৪]

অতএব বিবাদমান দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে এক পক্ষ হতে যখনই সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত হবে অন্য পক্ষকে সে প্রস্তাবে অবশ্যই রাযী হতে হবে।

৩.আল-কুরআন : সুরা আল-বাকারা:আয়াত নং ৩০

৪.আল-কুরআন : সুরা আল-আনফাল :আয়াত নং ৬১

Dhaka University Institutional Repository

উপযুক্ত শর্তে সন্ধি ও চুক্তি করে বিবাদ বিসম্বাদের দুয়ার বন্ধ করে দিতে হবে এবং যতদিন পর্যন্ত এ সন্ধি বর্তমান থাকবে ততদিনের মধ্যে এর একটি ধারার ও বিরোধীতা করা কোন ক্রমেই জায়েয হবে না।

২.২ সন্ধি রক্ষা করাঃ

ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ঃ সন্ধি করলে তা রক্ষা করতে হবে।কোন প্রকারেই তা ভঙ্গ করা যাবে না। এটাই হল ইসলামের সুমহান নীতি । অন্য কোন জাতি বা রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি করলে তা যথাসম্ভব রক্ষা করতেই হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا

فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين.

" কিন্তু যে সব মুশরিকের সাথে তোমরা সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছ, তার পর তারা তোমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করে নি, সন্ধির শর্তাবলী ভঙ্গ করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে (তোমাদের কোন শত্রুকে) সাহায্য ও করেনি (তাদের সাথে যুদ্ধ করো না)। তাদের সন্ধি শেষ মেয়াদ পর্যন্ত কায়েম রাখ। কারণ , সন্ধি ভঙ্গ করার পাপ যারা ভয় করে চলে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন।" [৫]

বিশ্বের আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক মহানবী(সঃ) এর জীবনেও সন্ধি রক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে।হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় এ সন্ধি রক্ষায় যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা ইতিহাসের সোনালী পাতায় চির অমর হয়ে থাকবে। হোদায়বিয়ার সন্ধিতে [৬] একটি চুক্তি ছিল ঃ

من جاء المسلمين من قريش يردونه ومن جاء قريشا من

المسلمين لا يلزمون برده

মক্কার লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় চলে আসলে তাকে কাফিরদের হাতে প্রত্যার্পণ করতে হবে, কিন্তু কোন মুসলমান কুরাইশদের নিকট ফিরিয়ে গেলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া বাধ্যতামূলক হবে না।

যখন এ চুক্তি হয়েছিল ঠিক সে মুহূর্তে আবু জানদাল নামক মক্কার এক নওমুসলিম কাফির কর্তৃক বন্দী অবস্থায় নির্যাতিত ও আহত হয়ে সন্ধিস্থলে উপস্থিত হলেন এবং মুসলমানদের নিকট সাহায্য ও আশ্রয় চাইলেন। তার মর্মান্তিক দুরাবস্থা দেখিয়ে চৌদ্দশত অসি নিমিষে নিষ্কোষিত হয়ে ঝন ঝন করে উঠতে পারত। আসহাবগণ একে সন্ধির এ ধারা অন্তর্ভুক্ত গণ্য না করতে এবং কাফিরদের হাতে তাকে সোপার্দ না করতে হযরতের

---

[৫].আল-কুরআন : সুরা আত তওবা : আয়াত নং ৪

[৬].হুদায়বিয়ার সন্ধির উপরে উল্লেখিত চুক্তিটি দেয়া আছে 'মহানবী (সঃ) এর জীবন চরিত গ্রন্থে'। মূল ঃ ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল ঃ অনুবাদক : মাওলানা আব্দুল আউয়াল : ই.ফা.বা. পৃষ্ঠা : ৪০০

Dhaka University Institutional Repository

নিকট অনুরোধ করলেন। বিজয় ওয়াদা পূর্ণ করা এবং সন্ধির প্রত্যেকটি ধারা রক্ষা করার পবিত্র শিক্ষা দান করার জন্য এসেছিলেন যে মহামানুষ , তিনি তা করতে মাত্র রাযী হলেন না। এই মাত্র যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার একটি ধারার ও বিরোধিতা করা তিনি মারাত্মক অপরাধ বলে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেনঃ

اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فربجا ومخرجا

انا قد عقدنا بين القوم صلحا واعطينا هم واعطينا على ذالك عهدا فلا نغدربهم

هذا

"হে আবু জানদাল ! ধৈর্য ধারণ কর, সংযম ওসতর্কতার সাথে কাজ কর , আল্লাহ নিশ্চয় তোমার ও তোমারই মত অন্যান্য দুর্বল মজবুর সঙ্গীদের জন্য মুক্তির কোন পথ ও পন্থা করে দিবেন। আমরা এ লোকদের সাথে সন্ধি করেছি। তারা আমাদের নিকট তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আর আমরা ও দিয়েছি। অতএব এখন আমরা সন্ধি ভঙ্গ করতে পারি না। "[৭]

২.৩ অন্যায়ের মূলোৎপাটনঃ

ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো অন্যায়ের মূলোৎপাটন। কারন অন্যায়, অপরাধ, বিশৃঙ্খলা ইসলামে এর কোন স্থান নেই।ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। আল্লাহর দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে কায়েম করা, শিরক, বিদায়াত ও ইসলাম বিরোধী সমস্ত কার্যক্রম,আইন-কানুন ও রসম-রেওয়াজকে নিস্ত-নাবুদ করে দেয়া এবং মানুষের উপর হতে মানুষের জুলুম নিস্পেষণ সম্পূর্ণরূপে খতম করে করে দেয়া ।

এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আইন বিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন করে অনাবিল শান্তি ও স্বাচ্ছন্দের নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশের সৃষ্টি করা। কারন মানুষের অশান্তি ও দুঃখ-দুর্ভোগ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত ব্যাপার। তা দূর করবার জন্য যুদ্ধ-সংগ্রাম এবং রক্তপাত করতে হলেও তাতে কিছুমাত্র আপত্তি থাকতে পারে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

والفتنة اشد من القتل

"ফিতনা-ফাসাদ হল হত্যার চেয়েও গুরুতর ।" [৮]

বস্তুতঃ ফিতনা-ফাসাদ, অশান্তি ও জুলুম নিস্পেষণ সাময়িক যুদ্ধ সংগ্রাম ও রক্তপাত অপেক্ষা অনেক কঠিন এবং দুঃসহ।

তাই আল্লাহর বাণী ঃ

قاتلوا هم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله

---

[৭].ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা : মাওঃ আব্দুর রহীম: প্রাগুপ্ত : পৃঃ ১৫২

[৮].আল-কুরআন : সুরা আল-বাকারা:আয়াত নং ৩০

Dhaka University Institutional Repository

"ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সাথে যুদ্ধ কর, যেন ফিতনা-ফাসাদ চিরতরে মিটিয়ে যায় এবং যেন নিরংকুশভাবে এক মাত্র আল্লাহর দীন ও রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব কায়েম হয়।" [৯]

মনে রাখতে হবে যে, ফিতনা দূর হওয়া এবং আল্লাহর দ্বীনের রাষ্ট্র কায়েম হওয়াই ইসলামী জিহাদের শেষ লক্ষ্য। এ ফিতনা ও অশান্তি দূর করবার জন্য যদি ফিতনাকারীদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত ও পরাভূত না করা হয়, তবে সে অশান্তি এবং ফিতনা সমগ্র মানবতার পক্ষে মারাত্মক হয়ে দেখা দিবে। তাইতো মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

الا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد كبير.

"(ফিতনা দূর করবার জন্য) যদি যুদ্ধ না কর তা হলে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী অশান্তির আগুন জ্বলে উঠবে এবং বিরাট বিপর্যয় ও মহাভাঙ্গণের সৃষ্টি হবে।"[১০]

২.৪ ন্যায় পরায়নতা ও সততাঃ

ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি হবে ন্যায়পরায়নতার ভিত্তিতে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

ان الله يأمر بالعدل والاحسان

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচার ও সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছেন।"

অন্যত্র বলেনঃ

اعدلوا هو اقراب للتقوى

অর্থাৎ "তোমরা ন্যায়বিচার কর, ন্যায়বিচার হলো তাকওয়ার খুবই নিকটবর্তী।"

একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে যদি ন্যায়পরায়নতা না থাকে,ধোকাবাজি আর প্রতারণা যদি মূল বিষয় হয় তাহলে অধপতন আবশ্যাম্ভাবী। ন্যায়পরায়নতাহীন আর সততাহীন পররাষ্ট্রনীতি দেশের কখনোই মঙ্গল নিয়ে আসতে পারে না।

এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বের একক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে ন্যায়পরায়নতা ও সততার পূর্ণাঙ্গতা নেই। মিথ্যা অভিযোগে ইরাকের উপর হামলা ক্ষতিগ্রস্থ করেছে বিশ্ব মানবতাকে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে ও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ফিলিস্তিনী আর ইসরাইলদের প্রতি

[৯]. আল-কুরআন : সুরা আল আনফাল :আয়াত নং ৩৯

[১০]. আল-কুরআন : সুরা আল আনফাল :আয়াত নং ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায়পরায়নতাহীন নীতির কারনে ইসরাইল শতশত যুবকদের হত্যা করছে। পাঠার বলী হচ্ছে নিরীহ অগণিত নারী, শিশু পুরুষ।

তাই ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে ঈমানদারী, সততা, ন্যায়পরায়নতা, সত্যবাদিতা এবং ইনসাফের উপর। আর বর্তমান দুনিয়ার বস্তুবাদী রাষ্ট্রসমুহের নীতি চলতেছে ধোকা প্রতারণা ও ফেরেববাজির উপর। ইসলাম তা চিরতরে খতম করে দিয়ে সততা, ন্যায়পরায়নতা, বন্ধুত্ব ও সত্যাদর্শের ভিত্তিতে নূতন পররাষ্ট্র নীতি রচনা করতে চায়।

২.৫ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অবস্থানঃ

ইসলাম সন্ত্রাসীদেরকে কখনোই প্রশয় দেয় না। ইসলামে পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বিষয় হল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান। মহানবী (সঃ) মদীনায় গিয়ে সর্বপ্রথম সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আল-কুরআনের ঘোষণা

والفتنة اشد من القتل

"ফিতনা-ফাসাদ হল হত্যার চেয়েও গুরুতর।"[১১]

এ আয়াতের আলোকে রাসুল (সঃ) মদিনায় সন্ত্রাসমুক্ত ঐক্যবদ্ধ সুশৃঙ্খল একটি সমাজ গড়ার প্রত্যয় গ্রহণ করলেন। মহানবী (সঃ) সেখানে গিয়ে প্রথমে মদীনার সনদ নামে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। সনদের শর্তাবলীর মধ্যে অন্যতম হল ঃ

*মদিনা শহরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হল। এখানে রক্ত ক্ষয় এবং অন্যায়-অনাচার নিষিদ্ধ করা হলো।

*কোন সম্প্রদায়ই কুরাইশদের কিংবা বাইরের অন্য শত্রুর সাথে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না।

*অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং সর্বপ্রকার অপরাধকে ঘৃণার চোখে দেখতে হবে।

*মুহাম্মদ (সঃ) এর পূর্ব অনুমতি ছাড়া কেউ কারো বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না। মুসলমান এবং অমুসলমান বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেনঃ

"It reveals the man (the Prophet) in his real greatness a master mind, not only of his own age but of all ages."

মদিনার সনদ শুধু সে যুগের নয় বরং সর্বযুগে মুহাম্মদ (সঃ) এর বিরাট মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে।

---

[১১] .আল-কুরআন : সুরা আল-বাকারা:আয়াত নং ৩০

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সঃ) বিশেষ এক যুগের বর্বরোচিত সমাজে আবির্ভূত হয়ে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সামাজিক সংস্কার সাধন করে গেছেন, তাঁর সেই সংস্কার স্বরূপ আজও সারাবিশ্ব শ্রদ্ধাবনত মস্তকে স্মরণ করে।
W.Muir বলেনঃ
"There is probably in the world no other book which has remained twelve Centuries with so pure a text".[১২]

এভাবে ইসলাম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাই ইসলামী পররাষ্ট্রনীতিতে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবস্থান একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

২.৬ ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে অবস্থানঃ

ইসলামী নীতিমালা কখনোই ব্যক্তি স্বার্থকে প্রধান্য দেয় না। বরং সামগ্রীক দৃষ্টিভঙ্গিকে বেশি প্রধান্য দিয়ে থাকে।যা কিছু করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে করে। লড়াইয়ের ময়দানে এক কাফির শত্রুকে পরাজিত করে হযরত আলী (রাঃ) তার বুকের উপর উঠে বসেছিলেন। তাকে হত্যা করার জন্য তরবারী নিষ্কোষিত করেছিলেন, ঠিক এ মুহূর্তে সে সৈনিকটি হযরত আলী (রাঃ) মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছিলেন। অমনি হযরত আলী (রাঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন :

"আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই লড়াই করতেছি। তোমাকে ঠিক সে জন্যেই হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলাম ; কিন্তু তুমি আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করেছ, তাতে আমার ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে। এ ক্ষণে আমি যদি তোমাকে হত্যা করি তবে তা খালেছভাবে আল্লাহর ওয়াস্তে হবে না , তা নিছক ক্রোধ এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনা বশতঃই করা হবে। কাজেই আমি তোমাকে হত্যা না করে মুক্ত করে দিলাম।"[১৩]

কোন ব্যক্তি স্বার্থে কোন কিছুই করা ইসলামে প্রকৃত নীতি নয়।

২.৭ যুদ্ধ করার প্রকৃত সময়ঃ

ইসলামে বিনা কারণে যুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেননি। নিম্নলিখিত কারনগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন ঃ

ক)সন্ধিভঙ্গঃ সন্ধি ভঙ্গ করাএকটি মারাত্মক অপরাধ।এটা একটা বিশ্বাসঘাতকতা। বিশ্বাসঘাতকতার পাপে দুনিয়ায় চরম অশান্তি ঘটতে থাকে।এ জন্য আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্বাসঘাতকতা ও বিশ্বাসঘাতকদিগকে মাত্রই পছন্দ করেন না। এরশাদ হচ্ছেঃ

ان الله لا يحب الخائنين

---

[১২].দৈনিক ইনকিলাব : ১জানুয়ারী, ২০০৫;পৃঃ ১৫

[১৩] ইসলামে রাজনীতির ভূমিকা:প্রাগুক্ত: পৃঃ ১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালা বিশ্বাসঘাতকদের ভালবাসেন না।[১৪]

ফলতঃ বিশ্বাস ভংগকারীদের ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করণ এবং তাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করাকে অপরাধ বলে ঘোষণা করেছেন।

الاتقاتلون قوما نكثوا ايمانهم

যে জাতি নিজেদের সন্ধি-চুক্তি এবং শপথ ভংগ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ ঘোষণা কর না কোন কারণে?[১৫]

খ. জুলুম নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধিঃ

মানুষের উপর যখন পাইকারীভাবে জুলুম নিষ্পেষণ শুরু হয়, মানুষ যখন চরম দুঃখে আর্তনাদ করে উঠে এবং জন্মভূমি পরিত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় দানের জন্যও যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ

لم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔

"তোমরা কেন জিহাদ কর না আল্লাহ তায়ালার পথে এবং দুর্বল মানুষদের (ঈমান ও জীবন রক্ষার)জন্য ; তাদের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রীএবং ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রয়েছে। তারা (অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে)বলে উঠেছে ঃ হে আমাদের রব!আমাদিগকে এ স্থান হতে বের করে এ দেশের অত্যাচারী শাসকদের জুলুম হতে রক্ষা কর।"[১৬]

২.৮ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঃ

অত্যাচারী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যায়। তবে যদি কোন কাফির জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় তা হল প্রধানত দুটি কারনে সে যুদ্ধ ত্যাগ করতে ইসলামী মুজাহিদগণ বাধ্য। প্রথমতঃ কাফিরগণ যদি খালেছভাবে তওবা করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে সর্বপ্রকার অন্যায় জুলুম ও নিষ্পেষণ ত্যাগ করে , তা হলে তারা আর কাফির থাকে না । বরং তখন তারা মুসলমানদের ভাই হয়ে যায় । তখন ইসলামের স্বাধীনতা ও যাবতীয় সুযোগ সুবিধা তারা সমানভাবে ভোগ করতে পারবে।

কুরআনে আছেঃ

فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فاخوانكم فى الدين۔

"কিন্তু তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে

---

১৪. আল-কুরআন : সুরা আল আনফাল :আয়াত নং ৫৭

১৫. আল-কুরআন : সুরা তওবা:আয়াত নং ১৩

১৬. আল-কুরআন : সুরা নিসা:আয়াত নং ৭০

Dhaka University Institutional Repository

তবে তারা তোমাদের দ্বীনের ভাই।"[১৭]

অন্যত্র বলেনঃ

"ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা হতে যদি তারা বিরত হয়, তবে কেবল অত্যাচারীদের ব্যতীত অন্য কারও উপর কোন আক্রমন করা যেতে পারে না।"

কিন্তু তারা যদি তওবা না করে, তবে তারা ইসলামী হুকুমতের অধীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

২.৯ বিজিত দেশে ধ্বংস যজ্ঞ না চালানোঃ

ইসলাম বিজিত দেশে ধ্বংস ,লুণ্ঠন,হত্যা, ধর্ষণ না করার জন্য তাগীদ প্রদান করেছে। আধুনিক কালের সৈন্যগণ আক্রান্ত দেশে প্রবেশ করে রক্ষক হয়ে নয় বরং সব কিছুর ভক্ষক হয়ে প্রবেশ করে।নির্মমভাবে হত্যা চালায় সকল দেশ বাসীর প্রাণ হরণ করে, ধনমাল লুণ্ঠন করে। পাশবিক বৃত্তির শিলাপেষণে নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধন সতীত্ব নষ্ট করে। সৈনিকদের পাশবিক লালসা চরিতার্থ করবার জন্য বেতন করা বেশ্যাদের আমদানী করা হয়।

আল্লাহ তায়ালা এ শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে বলেনঃ

ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها واجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذالك يفعلون

"ধর্মহীন রাষ্ট্রের কর্তা ও সৈন্যগণ যে রাজ্যে প্রবেশ করে, সে রাজ্যটিকে তারা একেবারে ধ্বংস করে দেয় এবং তথাকার সম্মানিত বাসিন্দাদিগকে (নানাভাবে)অপমানিত করে । তারা (নৈতিকতাবিবর্জিত প্রত্যেক রাজা-বাদশাহ ও সৈন্যরাই) চিরদিন এ রূপই করে থাকে।"[১৮]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেনঃ

واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد

"এ শ্রেণীর লোক যখন কোন রাষ্ট্র অধিকার করে লয় তখন তারা সে দেশে চরম অশান্তির সৃষ্টি করে , শস্য ও মানব-বংশ ধ্বংস করে , এ সবই অন্যায় ধ্বংসলীলা , আল্লাহ তা পছন্দ করেন না।"[১৯]

কিন্তু ইসলামী সৈনিকদের মধ্যে এর বিপরীত আদর্শ ও আচারণের প্রমাণ পাওয়া যায় । দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) খিলাফতের সময় ইসলামী ফৌজের মন, ঈমান ওচরিত্র নষ্ট করবার জন্য বিজিত রাজ্যের অমুসলিম নারীরা বিশেষভাবে সজ্জিতা ও মন বিমোহিনী হয়ে সৈনিকদের সামনে এসে হাযির হয়েছিল; কিন্তু ইসলামী ফৌজের প্রত্যেকটি সৈনিকের দৃষ্টি তখন অবনমিত ছিল। এটাই হল ইসলামী আদর্শ।

---

[১৭]. আল-কুরআন : সুরা তওবা:আয়াত নং ১১

[১৮]. আল-কুরআন : সুরা নমল:আয়াত নং ৩৪

[১৯]. আল-কুরআন : সুরা বাকারা:আয়াত নং ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

৩.সার্বজনীন আদর্শ ঃ

ইসলামী আদর্শ ও নির্দেশনা শুধু মসজিদের গন্ডির ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর ব্যাপকতা রয়েছে গোটা জীবন ব্যবস্থায়।সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এক কথায় সর্বক্ষেত্রে । ইসলাম বিশ্বব্যাপী শান্তির বাণী নিয়েই এসেছে। সন্ত্রাস,নৈরাজ্যবাদ, হত্যা, নির্যাতন, ইসলামের আদর্শ নয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। চৌদ্দশত বছর পূর্বে মহানবী (সঃ) মদীনার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়ে যে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিলেন তা আজও অমর। আজও সর্বজনের নিকট গ্রহণীয়,অনুকরণীয়। মহানবী(সঃ)মদীনায় আগমন করে এক সন্ধি চুক্তি করেছিলেন। এতে তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমান মেলে। এখানে তিনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।হুদায়বিয়ায় সন্ধি স্থাপন করেছিলেন এতে তাঁর বিজ্ঞতার প্রমান মিলে। ইসলামী পররাষ্ট্রনীতিমালা উপরে আলোচিত হয়েছে। নীতিমালার মধ্যে অন্যতমগুলো ছিল ঃ

সন্ধি চুক্তি করা ও রক্ষা করাঃ

বর্তমান বিশ্ব একে অপরের নির্ভরশীল।একলা চলার নীতির সময় শেষ হয়ে গেছে।বিভিন্ন কারণে একে অপরের উপর নির্ভরশীল হতে হয়।তাই চুক্তি প্রয়োজন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন চুক্তি করে থাকে। মহানবী (সঃ) মদীনায় গিয়ে প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছিলেন। তবে ইসলামের নিয়ম হল চুক্তি করলে তা ভঙ্গ না করা । ইসলামের এ নীতি অত্যন্ত সুমহান। চুক্তি করলে তা অবশ্যই পালনে দৃঢ় থাকতে হবে। নতুবা অশান্তি আর মনোমালিন্য দেখা দিবে। তাইতো এ নীতি গ্রহণীয়।

***অন্যায়ের মূলোৎপাটন ঃ**

ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য হল অন্যায়ের মূলোৎপাটন।অন্যায় দেখলে সেখানে তা দূর করার জন্য সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করা।আজ জাতি সংঘ হল বিশ্ব সংস্থা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের একমাত্র সংস্থা। কোন দেশে অন্যায় অপরাধ করে থাকলে তার প্রতিকারের জন্য জাতিসংঘের কাছে প্রতিকার চাওয়া হয়। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য। এ হিসেবে অন্যায়ের মূলোৎপাটনে বাংলাদেশ ও সাহায্য করে । তাই বলব ইসলামের এ সুমহান নীতি আজও বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

***ন্যায়পরায়নতা ও সততাঃ**

একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে অবশ্যই ন্যায় পরায়নতা ও সততা থাকতে হবে। স্বীয় শক্তির ঔদ্যত প্রকাশ কখনো দুর্বল রাষ্ট্রের উপর করা

Dhaka University Institutional Repository

ঠিক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে তুচ্ছ অজুহাতে ইরাকীদের উপর নগ্ন হামলা তারপর ইরাক দখল করেছিল কিন্তু এর চেয়েও বেশি অপরাধী ইসরাইলের উপর কোন হামলা হুমকি প্রদান করেনি বরং নিরীহ ফিলিস্তিনীদের উপর নগ্ন হামলা করতে পরোক্ষভাবে তাকে উচকিয়ে দিয়েছিল। অথচ ইসলামী শিক্ষা হল ন্যায়পরায়নতার ও সাম্যের শিক্ষা।সততার বিপরীতে মিথ্যাচার, ধোকাবাজি , প্রতারণা কোন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি থাকা উচিৎ নয়।

***সন্ত্রাসবাদ ঃ**

ইসলামে সন্ত্রাস বাদের কোন স্থান নেই। বরং একে জঘন্য অপরাধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। হত্যা, ছিনতাই, রাহাজানির বিরুদ্ধে ইসলামের শাস্তি অবধারিত।আল কুরআনে এর জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে।অথচ বিশ্বব্যাপি আজ মুসলিমদের সন্ত্রাসের হোতা বলে প্রচার প্রপাগান্ডা চালানো হচেছ। আসলে এটা কাল্পনিক সন্ত্রাসবাদ। ফিলিস্তিনীরা স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছে, ইরাকীরা দেশ মুক্তির জন্য জীবন দিচ্ছে, কাশ্মিরী মুজাহিদরা তাদের ন্যায্য দাবীর জন্যশাহাদাত বরণ করছে । অথচ এর বিরোধীরা তাদেরকে সন্ত্রাসবাদের নামে ভুয়া মিথ্যা অভিযোগ করছে।অথচ সন্ত্রাসী বললে একমাত্র প্রেসিডেন্ট বুশকেই বলা যায় কেননা সে স্বাধীন রাষ্ট্রের উপর হামলা করে নীরিহ জনগণকে পাইকারীভাবে হত্যা করছে। এখানে সবাই নীরব।যাক ইসলাম যে সন্ত্রাসবাদের প্রশ্রয় দেয় না তা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামের এ বিধানের সাথে সাথে আজ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ঐকমত্য প্রকাশ করছে।

***বিজিত দেশের উপর ধ্বংস যজ্ঞ না চালানোঃ**

ইসলাম হল শান্তির প্রতীক। সকল হত্যা, নির্যাতন -নিপীড়ণের বিরুদ্ধে। কোন দেশ দখল করলে সেখানে অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাতে হবে এমন ইসলামের কোন বিধান নেই। অথচ আজ দেখা যায় যে কোন দেশ জয় করলে সেখানে নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেন বিজয়ী দেশটি। অথচ তারা মানবাধিকারের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ প্রদান করে না। যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান এবং ইরাক দখল করে সেখানের জনগণের উপর যে অত্যাচারের ব্যাপক সীমা লংঘন করছে তা আজ বিশ্ববাসীর সামনে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।কিভাবে নিপীড়ন চালানো হয়েছে ইরাকের আবুগারীব কারাগারে , কিউবার গুয়ানতানামো বেতে। পত্রিকার পাতায় নির্যাতনের ছবি দেখলে শরীর শিহরীয় উঠে ।

তাইতো দরকার ইসলামী আদর্শের অনুসরন করা। ইসলামী সুমহান সার্বজনীন নীতিমালা আজ সকল বিবেকমান মানুষের নিকট অনুধাবিত হচ্ছে। তারা এ নীতিমালা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদঃ

মানবাধিকার

মানুষ জন্মগত ভাবে স্বাধীন। অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা তার মৌলিক অধিকার। বাক স্বাধীনতা তার প্রাপ্য। তবে তা বিধির উপর নির্ভরশীল। সুন্দর এ পৃথিবীতে সুন্দর ভাবে বাচাঁর অধিকার তার আছে। কিন্তু বিশ্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। রুক্ষ হায়েনা রুপী মানবদের অত্যাচারে, বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের এ যুগে আধুনিক মারণাস্ত্রের আঘাতে, পারমানবিক বোমার আঘাতে অত্যাচারিত হচ্ছে স্বাধীন এ মানবজাতি। ভূলিন্ঠিত আজ মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার। নিপীড়ণের অসহ্য জ্বালা বুকে ধারণ করে মৃত্যুর কোলে শায়িত হচ্ছে অসংখ্য তাজা মানব প্রাণ।

অত্যাচারীর নিক্ষিপ্ত গোলা বারুদের লেলিহান শিখা প্রজ্বলিত করছে শহর, নগর, বন্দর। বুলেটের আঘাতে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধা-বণিতাদের তাজা লাল রক্তে রক্তিম হচ্ছে পিচ ঢালা রাজপথ। ইরাক, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, ফিলিস্তিন, ফিলিপাইন এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বিশ্বগুরুর আসনে আসীন যুক্তরাষ্ট্রের মুখে গণতন্ত্র আর মানবাধিকার। কিন্তু কর্মে তার বিপরীত। তাদের পেশী শক্তির প্রদর্শণীতে আজ পাঠার বলী হচ্ছে ইরাক, আফগানের নীরিহ জনতা। লংঘিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার। বিশ্ব সংস্থার মানবাধিকার সংগঠনটি নীরব দর্শক আর মাটির পুতুলের ন্যায় তাদের ভূমিকা। সাম্যের বাণী আজ নিভৃতে কাঁদে।

জা জ্যাঁক রুশো বলেছেনঃ

"মানুষ স্বাধীন স্বত্তা হিসেবে জন্ম গ্রহণ করলেও সে আজ সর্বত্র শৃংখলাবদ্ধ।"[১]

আমেরিকার হার্বার্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাকলোয়ন চার্লস স্বাধীনতা ও অধিকার হরণের করুণ চিত্র পরিবেশন করে বলেছেন ঃ

"আমার মনে হয় ইতিহাসের কোন স্তরেই মানুষ এত কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়নি, প্রশাসন ও বিচার বিভাগ এতটা অসহায়ত্ব বোধ ও বিপদ অনুভব করেনি, প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করার এতটা তীব্র প্রয়োজনও দেখা দেয়নি, যতটা আজ দেখা দিয়েছে।"[২]

মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার প্রসংগে পাশ্চাত্য পন্ডিত রবার্ট ডেবী বলেছেনঃ

---

১. ইসলামে মানবাধিকার ;অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ : আর আই এস পাবলিকেশন্স : ঢাকা: পৃঃ ৬

২ .Constitutionalism পৃঃ ১৪০ Mcliwanchareles

Dhaka University Institutional Repository

'প্রায় দু'শত বছর পূর্বের দ্বন্দ সংঘাত আজকের সংঘাতের চেয়ে ভিন্নতর ছিল না।'[৩]

১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে রুশো আক্ষেপ করে বলেছিলেন, মানুষ স্বাধীন সত্তা হিসেবে জন্মগ্রহন করলেও সে তার সর্বত্র শৃংখলে বন্দী। এর প্রায় দুশত বছর পর ১৯৪৭ সালে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চার্লস সমসাময়িক কালের মানুষের দুর্দশার চিত্র আঁকতে গিয়ে বলেন ঃ আমার মতে ইতিহাসের কোন যুগেই কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এতটা অসহায়ত্ব বোধ করেনি, এ বিপদ অনুভব করা এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বে কখনো চিন্তা করার এতটা তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়নি-যতটা আজ দেখা দিয়েছে।[৪]

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। অর্ধ শতাব্দী হতে চলেছে এর বয়স। এর মধ্যে পৃথিবীর রূপ অনেক বদলে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দূরের মানুষকে কাছে এনে দিয়েছে। বন্যা, খরা, মহামারী, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় মানুষ পাচ্ছে অপর মানুষের সহযোগিতা দৃশ্যপটে চোখ বুলালে মনে হয় আমাদের জীবন অনেক সুখময় হয়েছে।

টিভি, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, ফ্যাক্স, কম্পিউটার ভূ-উপগ্রহ ইত্যাদি দেখলে মনে হয় অনেক উজ্জ্বল হয়েছে দিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দ্রুত আন্তর্জাতিক সাহায্য আসার ধরণ দেখে বোমা মেরে অসহায় নারী-পুরুষ-শিশু হত্যার দৃশ্য, যখন শুনি খাদ্য ও ওষুধের অভাবে মানুষ মরার খবর, যখন পড়ি কারাগারে পুলিশি নির্যাতনে আসামী মৃত্যুর খবর তখন মন মানতে রাজী হয় না আমরা ভাল আছি।[৫]

টমাস পেইন মানবাধিকার আর স্বাধীনতার স্বঘোষিত ধবজাধারীদের অন্ধ চোখগুলোকে একটি তিক্ত সত্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন, স্বাধীনতা পৃথিবীর আনচে-কানাচে থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, এ পলাতককে ধরো এবং মানবতার জন্য সময়মত একটি আশ্রয়স্থল নির্মান কর। আজ হাজারো বেদনাপূর্ণ কথা, হাজারো প্রচার ও ঘোষণাপত্রের পরও স্বাধীনতা এখনো রূপকথার পাখি।

আমেরিকাই হোক অথবা রাশিয়া, পর্তুগাল, এঙ্গোলা, ইংল্যান্ড, রোডিশিয়া বা বোস্টনই হোক কোথাও তার নাম নিশানাও নেই।[৬]

---

৩. ইসলামে মানবাধিকার :অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ ; প্রাগুক্ত পৃঃ ৬

৪. Mcllwain Chareles. Howard. Constitutionalism.Great Seal Books, New York, B,১৯৪৭,P-১৪০.

৫.মানবাধিকার ভাষ্য, গাজী শামছুর রহমান , পৃঃ ৬১২

৬ .Dewey , Robert E. Freedom ,The Macmillan Company, ১৯৭০, P-৩৪৭.

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার বিষয়টিকে নিম্ন পর্যায়ক্রমিক অনুসারে আলোচনার প্রয়াস পাবো ঃ

*১.মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার কিঃ
*২.মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার এর মধ্যে পার্থক্য ঃ
*৩.বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক মানবাধিকারঃ
*৪.বাংলাদেশে মানবাধিকারের সমীক্ষাঃ
*৫.ইসলামে মানবাধিকারঃ
*৬.সার্বজনীনতাঃ

*১.মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার কিঃ

মৌলিক অধিকার ঃ

মৌলিক অধিকার' মৌলিক মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার শব্দগুলো প্রকৃত পক্ষে মানবাধিকার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অধিকার অর্থ হচ্ছে, সচেতন, নৈতিক ও সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে, উন্নত জীবন যাপনের জন্যে যে সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগের দাবী রাখে; যা ছাড়া সে মানুষ হিসেবে জীবন ধারণ, জীবনের প্রয়োজন মিটাতে পারে না, তার প্রতিভা বিকাশে ও উন্মেষ সম্ভব নয় সে সকল প্রয়োজন পূরণের নিশ্চিত ব্যবস্থার নামই হচ্ছে অধিকার।

মানুষ পৃথিবীতে সন্তান হিসেবে, পিতা হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, সরকার হিসেবে, নাগরিক হিসেবে, স্বামী হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, সৈনিক হিসেবে, সেনাপতি হিসেবে, ক্রেতা হিসেবে, বিক্রেতা হিসেবে, ছাত্র হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে, মালিক হিসেবে, শ্রমিক হিসেবে, যে সকল সুযোগ সুবিধা অপরিহার্যভাবে পাবার দাবী রাখে সেগুলোই হচ্ছে মানুষের অধিকার ।

মানুষ তার জীবন, সম্পদ, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও বাসস্থানের নি-চয়তা লাভের ব্যবস্থার নামই মানুষের অধিকার। মানুষের মতামত প্রকাশ, ধর্মীয় নৈতিক জীবন ধারা গড়ে তোলার, সংগঠন ও সংস্থা গঠনের অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষের মৌলিক অধিকার আর এ সামষ্টিক সুযোগ প্রাপ্তির সুনিশ্চিত ব্যবস্থা ও বিধানের নামই হচ্ছে মূলতঃ মানবাধিকার।[৭]

*বিচারপতি জ্যাকশন বলেনঃ কোন ব্যক্তির জীবন, মালিকানার স্বাধীনতা, বক্তৃতা, বিবৃতি, লেখনীর, ধর্মীয় অধিকার, ইবাদত

৭.ইসলামে মানবাধিকার ;অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ;প্রাগুপ্ত পৃঃ ৭

Dhaka University Institutional Repository

বন্দেগী, সমাবেশের স্বাধীনতা এবং অনুরূপ অপর সকল সুযোগ সুবিধাই হচ্ছে স্বাধীনতা ও অধিকার।[৮]

*গায়েয ইজিওফোর বলেনঃ মানবীয় অধিকার বা মৌলিক অধিকার হচ্ছে সে সকল স্থায়ী অধিকার সমূহের আধুনিক নাম যাকে ঐতিহ্য ও প্রথাগত ভাবে অধিকার বলা হয়। যার ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যেতে পারে যে সকল নৈতিক অধিকার যা প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক স্থানে সার্বক্ষনিকভাবে এ কারণে পেয়ে থাকে যে, অপর সকল সৃষ্টি হতে সে সচেতন, বোধ সম্পন্ন ও নৈতিক গুনাবলীর অধিকারী হওয়ার কারণে উত্তম ও উন্নত। একমাত্র ন্যায় বিচারকে পদদলিত করা ছাড়া কেউ মানুষকে এ অধিকার হতে বঞ্চিত করতে পারে না।[৯]

*রাষ্ট্র বিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার বলেনঃ অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে ব্যক্তি ইচ্ছা মাফিক কাজ করার সুযোগ সুবিধার নামই হচ্ছে অধিকার ও স্বাধীনতা।[১০]

*মানবাধিকারঃ

মানবাধিকার বলতে সে অধিকারকে বুঝায় যা নিয়ে মানুষ জন্মায় এবং যাতাকে বিশিষ্টতা দেয় এবয় যা হরণ করলে সে আর মানুষ থাকে না। মানুষ জন্মসূত্রেই চিন্তা শক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং কথা বলার যোগ্যতা নিয়ে আসে। কোন রাষ্ট্র, সরকার বা সার্বভৌম শক্তি তাকে এসব প্রদান করে না। মানুষের জীবনটাও কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দান নয়। অতএব রাষ্ট্র, সরকার বা অন্য কোন শক্তি মানুষের এসব অধিকার কেড়ে নেয় তাহলে প্রকারন্তরে সে তার মনুষ্যত্বই কেড়ে নিল, হরণ করল তার মানবিক বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির সেরা মানুষ আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে উঠতে দরকার মানবাধিকার। মানবাধিকার ছাড়া মানুষের পূর্ণতা আসে না, মানুষ পরিপূর্ণরূপে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।[১১]

*১.২ মানবাধিকার দিবসঃ

প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর পালন করা হয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। এ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো মানষের সমান মর্যাদা অধিকার নিশ্চিত করা এবং সে সঙ্গে সকল স্তরের মানুষের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন বন্ধ করাও মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা বিধান করা। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর প্যারিসে এ লক্ষ্যে ৩০টি ধারা সম্বলিত যে

---

৮. ইউনাইটেড নেশনস এন্ড হিউম্যান রাইটস :এ কে ব্রোহী ; পৃঃ ৩১৩

৯. প্রটেরশন অফ হিউমেন রাইটস আন্ডার ইজি গিওকোর ;পৃঃ ৩ সুত্র: ইসলামে মানবাধিকার;প্রাগুপ্ত;পৃঃ ৮

১০. ইসলামে মানবাধিকার ;প্রাগুপ্ত;পৃঃ ৮

১১. মানবাধিকার ভাষ্য, গাজী শামছুর রহমান , পৃঃ ১১

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার সনদ রচনা করা হয়েছিল, তাতে এসব বিষয়েরই কথা বলা হয়েছে। এতে স্বীকার করা হয়েছে প্রতিটি মানুষের জন্মই সমান অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে। যেমনটি বলেছেন রুশো,

' Man is born free' এ সনদে মানষে মানুষে বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক মর্যাদা, সম্পত্তি ও জন্মগত সকল বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে উক্ত সনদে মানুষের ব্যক্তিগত ও বাক-স্বাধীনতার নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গিকার ও রয়েছে। সুস্থ, সুন্দর ও নিবির্ঘ্নে বসবাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সনদটি যে মানবতার সভ্যতার দলীল এতে কোন সন্দেহ নেই ।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস:

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। বিশ্ববাসী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে সপ্তম শতাব্দীতে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মক্কার আরাফাতের ময়দানে লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতে প্রথম মানবাধিকারের একটি চুড়ান্ত ঘোষণা দেন, যা ইতিহাসে 'বিদায় হজ্জের ভাষণ' নামে পরিচিত। মহানবী (সঃ) ঘোষণা করেন;

'আজকের এ দিন,এমাস, এবং এ পবিত্র মক্কা নগরী তোমাদের কাছে যেমন পবিত্র , তোমাদের সকল জীবন, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের মান-মর্যাদা তোমাদের পরস্পরের কাছে।তোমরা যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন অন্যের ওপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করবে না ।

তাছাড়া মহানবী (সঃ) জুলুম-নির্যাতন বন্ধ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবতার সেবা, অধীনস্থদের সাথে সুআচারণ ও ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার আহবান জানান। এটিই ছিল মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠার প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ সনদ ।

পরবর্তীতে ১২১২ সালে রাজা জনের স্বাক্ষরিত 'The petion of Rights' ১৭৭৬ সালের ১২ই জুন স্বাক্ষরিত 'The Virjina Declaration.' ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই স্বাক্ষরিত The Declaration of independent' ১৮৬৯ সালে 'The English Bill of Rights' বিশ্বজনীনভাবে মানবাধিকারের চেতনা বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সর্বশেষ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় 'The Universal Declaration of Human Rights' বা সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা।[১২]

---

[১২] .প্রফেসর'স মাসিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ঃ জানুয়ারী ; ২০০৩ পৃঃ ২২

Dhaka University Institutional Repository

*২. মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার এর মধ্যে পার্থক্য ঃ

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার প্রায় এক হলেও এর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছেঃ

☞*সংবিধানে লিপিবদ্ধ ও নিশ্চয়তা অর্থেঃ

সকল মৌলিক অধিকারই মানবাধিকার। কিন্তু সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয় । মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে এবং কোন কোন মৌলিক অধিকারকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়। কিন্তু মানবাধিকার সংবিধানে ভিন্নভাবে লিখা থাকে । মানবাধিকারের ক্ষেত্র ব্যাপক কিন্তু মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্র সংকীর্ণ।

☞*উৎসগত পার্থক্য:

মৌলিক অধিকারের উৎস মূলত কোন দেশের সংবিধান। অর্থাৎ কোন মানবাধিকার যখন সংবিধানে স্থান পায় তখন তাকে মৌলিক অধিকার বলে। অন্যদিকে মানবাধিকারের উৎস হলো আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন বিষয়।

☞*অবস্থানগত পার্থক্য :

মৌলিক অধিকারগুলো দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এক দেশের মৌলিক অধিকারের সাথে অন্য দেশের মৌলিক অধিকারের পার্থক্য থাকতে পারে। মানবাধিকারগুলো কোন দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে আন্তর্জাতিকতা লাভ করে অর্থাৎ মানবাধিকারকে ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।

☞*সাংবিধানিক নিশ্চয়তা অর্থেঃ

মৌলিক অধিকারকে সাংবিধানিক নিশ্চয়ত দেয়া হয়। অর্থাৎ কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আদালত তার মৌলিক অধিকার বলবৎ করতে পারে। পক্ষান্তরে মানবাধিকারগুলো কোন সাংবিধানিক নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ এগুলো আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্য নয়।

☞*প্রযোজ্য ক্ষেত্রে :

মৌলিক অধিকারগুলো একটি নির্দিষ্ট দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে মানবাধিকারগুলো সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

*৩. বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক মানবাধিকার সমূহঃ

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাগণ সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেনা। ১৭৮৯ সালে মার্কিন সংবিধান এবং ১৯৪৯ সালের ভারত সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাগণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। ফলে এসব দেশের সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারের

Dhaka University Institutional Repository

আলোকে সংবিধান প্রণেতাগণ বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংযুক্ত করেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে ২৭ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। সংবিধান প্রণেতাগণ শুধু বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্যই মৌলিক অধিকার প্রণয়ন করেননি, বরং বাংলাদেশে বিদেশী নাগরিকদের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংযোজন করেছেন।মৌলিক অধিকার মোট ১৮টি।

৩.ক) শুধু বাংলাদেশের নাগরিকরা ভোগ করতে পারে এমন মৌলিক অধিকার ১২টিঃ

১.আইনের দৃষ্টিতে সমতাঃ

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী ।[১৩]

অর্থাৎ ধনী-দরিদ্র, বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিক আইনের দ্বারা সমানভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে।

২. ধর্ম,বর্ণ,নারী-পুরুষ বৈষম্য করা যাবে না ঃ

ধর্ম,বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না এবং উক্ত কারণে নাগরিককে সাধারণ বিনোদন ও বিশ্রাম কেন্দ্রে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ বা ভর্তি হতে বঞ্চিত করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। তবে নারী, শিশু ও অনগ্রসর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। [১৪]

৩. চাকরির সমান সুযোগ:

প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ থাকবে। আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্রের চাকরিতে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা যাবে না।[১৫]

৪.বিদেশী রাষ্ট্রের খেতাব প্রভৃতি গ্রহনঃ

রাষ্ট্রের পূর্বানুমতি ব্যতিত কোন নাগরিক বিদেশী কোন উপাধী, সম্মান, পুরস্কার বা খেতাব গ্রহণ করতে পারবে না । [১৬]

১৩.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ; অনুচ্ছেদ ২৭

১৪. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ২৮

১৫. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ২৯

১৬. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ৩০

Dhaka University Institutional Repository

৫. আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারঃ

বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল ব্যক্তি কেবল আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং আইনের বিধি ছাড়া কারো জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি করা যাবে না।[১৭]

৬. চলাফেরার স্বাধীনতাঃ

জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, এর যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।[১৮]

৭.সমাবেশের স্বাধীনতাঃ

আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমাবেশ - শোভাযাত্রা ইত্যাদি করার অধিকার সকল নাগরিকের থাকবে।[১৯]

৮.সংগঠনের স্বাধীনতা ঃ

জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সংগঠন করার অধিকার সকল নাগরিকের থাকবে।[২০]

৯.বাক স্বাধীনতাঃ

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।[২১]

১০.পেশা ও বৃত্তির অধিকার ঃ

আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।[২২]

১১.ধর্মীয় স্বাধীনতা ঃ

আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।[২৩]

---

১৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ; অনুচ্ছেদ ৩১
১৮. প্রাগুক্ত ; অনুচ্ছেদ ৩৬
১৯. প্রাগুক্ত ; অনুচ্ছেদ ৩৭
২০. প্রাগুক্ত ; অনুচ্ছেদ ৩৮
২১. প্রাগুক্ত ; অনুচ্ছেদ ৩৯
২২. প্রাগুক্ত ; অনুচ্ছেদ ৪০

Dhaka University Institutional Repository

১২.গৃহ ও যোগাযোগের অধিকারঃ

আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের স্বীয় গৃহ নিরাপত্তা লাভের ও চিঠিপত্র ও যোগাযোগের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকবে।[২৪]

খ.বাংলাদেশে বসবাস কারী নাগরিক ও বিদেশীরা ভোগ করতে পারে এমন মৌলিক অধিকার ৬টি। যথা :

১.জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা অধিকার ঃ

আইনের বিধান ছাড়া কোন ব্যক্তিকে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।[২৫]

২.গ্রেপ্তার ওআটক সর্ম্পকে রক্ষাকবচ :

গ্রেফতারকৃত সকল ব্যক্তি তার মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শ ও তার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।[২৬]

৩.জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ:

সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ এবং এর লংঘন আইনগত দন্ডনী অপরাধ। তবে ফৌজদারী দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই বিধান কার্যকর হবে না। তবে জনগণের উদ্দেশে সাধনকল্পে রাষ্ট্র আইনের দ্বারা বাধ্যতামুলক শ্রমের বিধান করতে পারবে।[২৭]

৪.বিচার ও দন্ড সর্ম্পকে বিধান :

অপরাধ সংঘটনকালে বলবৎ আইনে বর্ণিত দন্ডের বেশি দন্ড দেয়া হবে না। এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার দন্ডিত করা যাবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকশ্য বিচার লাভের অধিকার হবেন। কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না এবং কাউকে যন্ত্রণা দেওয়া বা নিষ্ঠুর, অমানুষিক ও লাঞ্ছনাকর দন্ড দেয়া যাবে না।[২৮]

৫.ধর্মীয় স্বাধীনতা :

আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।[২৯]

---

২৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ; অনুচ্ছেদ ৪১

২৪ .প্রাগুপ্ত; অনুচ্ছেদ ৪৩

২৫ .প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ৩২

২৬ .প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ৩৩

২৭. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ৩৪

২৮. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ৩৫

২৯. প্রাগুপ্ত ; অনুচ্ছেদ ৪১

Dhaka University Institutional Repository

৬.সাংবিধানিক প্রতিকার পাওয়ার অধিকার ঃ

মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য যে কোন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে মামলা রুজু করতে পারে।[৩০]

সুপ্রিমকোর্ট কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে কোনো মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ বা নির্দেশ দান করতে পারবে।[৩১]

রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারসমূহ লঙ্ঘন করে আইন প্রণয়ন করবে না।[৩২]

*৪.বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘনের সমীক্ষাঃ

২০০৩ সালে বাংলাদেশে মানবাধিকারের লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে মোট ১৩৯৪৩টি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ৬টি পত্রিকার তথ্য বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানা যায়। এর মধ্যে ঃ

হত্যার ঘটনা:২৮৩৭ আত্মহত্যা:৯৭১টি অপহরণ:৮৭০টি
সন্ত্রাস ও সংঘর্ষ :৪১৮০ টি ডাকাতি :১৫৭৬টি ছিনতাই:৮৯৯টি
পুলিশি নির্যাতন : ৪৭৪ টি ধর্ষণ: ৯৮২টি ধর্ষণ জনিত হত্যা : ১৩৬
নারীও শিশু পাচার :১০৩টি যৌতুক ওতালাক : ৩৯৬ এসিড নিক্ষেপ: ২৪১
ফতোয়া :৩৪টি এবং সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা:২৪৪টি[৩৩]

উপরোক্ত ঘটনাসমূহের মধ্যে সন্ত্রাস ও সংঘর্ষের ঘটনা সর্বাধিক ; এ সংখ্যা ৪ হাজারের উপর।

২০০২ সালে মানবাধিকারের লংঘনের ঘটনা ছিল১২৭০২টি; ২০০৩ সালে তাবেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৯৪৩ টিতে।

২০০৩ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সেপ্টেম্বর মাসে সর্বাধিক ১৫৭০টি মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটেছে। বিপরীতে জানুয়ারী মাসে এ সংখ্যা সবচেয়ে কম ৭২৩ জন।

---

৩০. প্রাগুক্ত ; অনুচ্ছেদ ৪৪
৩১. প্রাগুক্ত ; অনুচ্ছেদ ১০২
৩২.প্রাগুক্ত ; অনুচ্ছেদ ২৬
৩৩.সংবাদপত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চালচিত্র ২০০৩:ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার। পৃঃ ৭

Dhaka University Institutional Repository

মাসভিত্তিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্রঃ
জানুয়ারী -ডিসেম্বর (২০০৩)[৩৪]

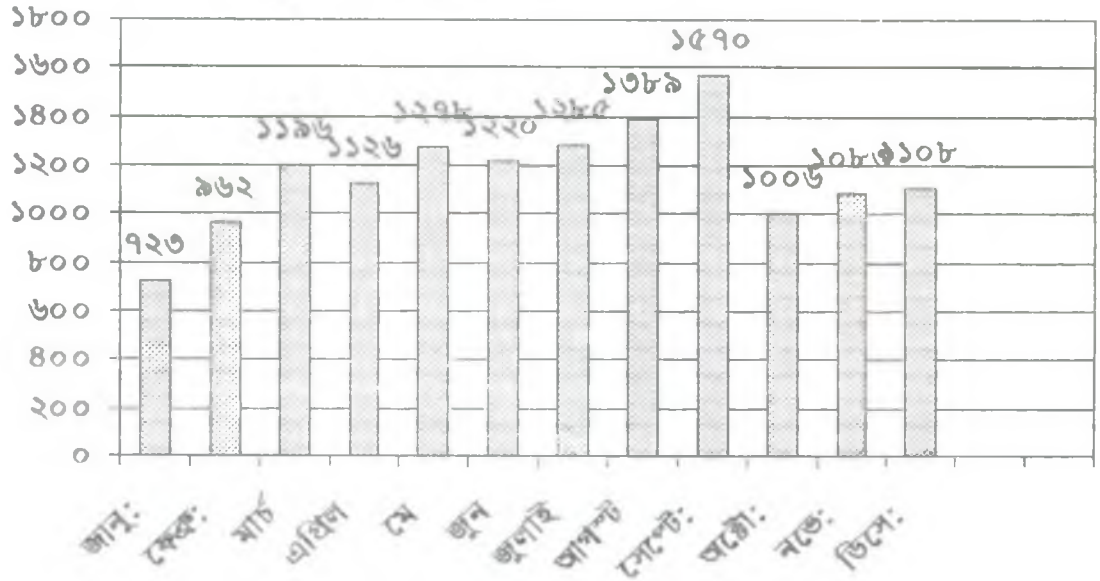

কোন বিষয় কতটুকু মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছেঃ(২০০৩)

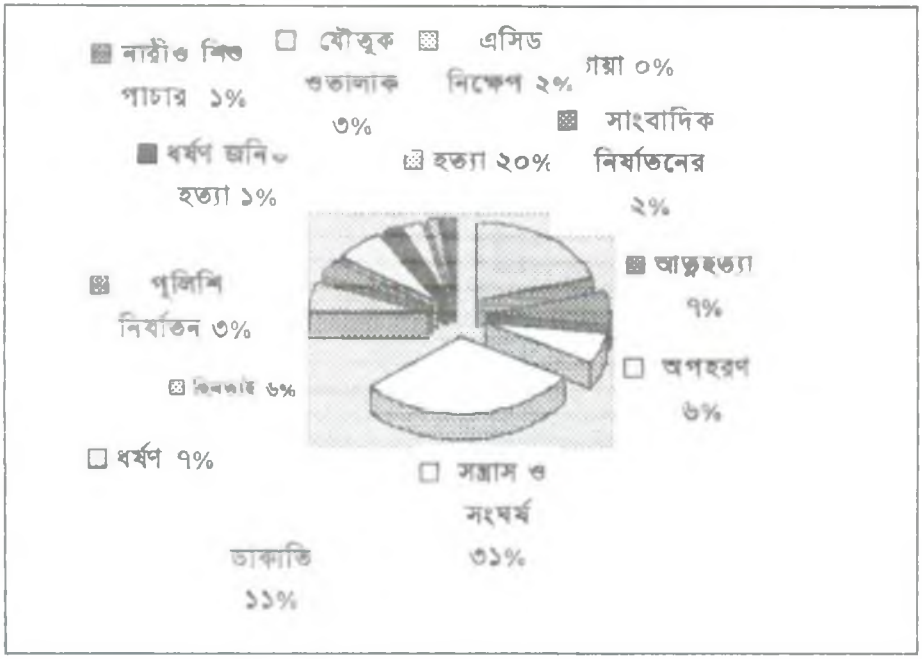

[৩৪] .সংবাদপত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চালচিত্র ২০০৩:ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার ।পৃঃ ৯

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংবাদপত্রে মানবাধিকার লংঘনের মাস ভিত্তিক চিত্রঃ
(জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০০৩)[৩৫]

বিবরণ	জানু:	ফেব্রু:	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে:	অক্টো:	নভে:	ডিসে:	মোট
হত্যা	১১৪	১৬০	২৩৪	২৪৫	২৮২	২১৩	২৫৮	২৬৭	২৯৩	২২৫	২৯৫	২৪৮	২৮৩৭
আত্মহত্যা	৪১	৫১	৭৫	১১০	৯২	১০০	১১২	১০৩	১০৫	৮৬	৩৯	৫৭	৯৭১
অপহরণ	৩৩	৪৫	৬৬	৬৪	৮৯	৭৮	১১১	৮৮	১০১	৬৮	৪১	৮৬	৮৭০
সন্ত্রাস ও সংঘর্ষ	২৫৩	৪০৭	৪০০	২৭৫	২৬৪	৩০২	৩১০	৪৫৭	৫২১	২৬৮	৩৭০	৩৫৩	৪১৮০
ডাকাতি	১৪৪	১২৯	১৫৩	১১৯	১৫৯	১৪৮	১৩৮	১৪১	১৭১	৬৫	৯৩	১১৬	১৫৭৬
ছিনতাই	৫১	৪২	৬৯	৮৭	৮১	৮৫	৬৬	৭৪	৯১	৯৫	৭৭	৮১	৮৯৯
পুলিশি নির্যাতন	২২	৩১	৩৬	৩৮	৪৪	৬০	৩৯	৫৪	৪০	৪৮	২৯	৩৩	৪৭৪
ধর্ষণ	২২	৩৭	৮১	১০০	১৪৪	১০১	১২০	৮৬	১০৩	৭৯	৫৩	৫৬	৯৮২
ধর্ষণ জনিত হত্যা	১০	৮	১৪	১৭	১৩	১১	১২	১৩	১৩	৪	৬	৫	১০৬
নারী ও শিশু পাচার	১	৭	৭	৬	১৮	১৩	১১	১১	১৮	৩	৩	৪	১০৩
যৌতুক ওত্যাগাক	১০	১৭	২৬	৩৭	৫০	৪২	৩৭	৪৬	৬১	১৮	২২	২৪	৩৯৬
এসিড নিক্ষেপ	১১	৯	১৪	১৪	১৯	২৬	২০	৩১	৩২	২১	২৯	১৫	২৪১
ফতোয়া	৪	৩	১		২	১	৪	২	৬	৩	৬	২	৩৪
সাংবাদিক নির্যাতনের	৬	১৬	২০	১৪	১৮	৩০	৪৭	১৬	১৫	১৭	২০	২৫	২৪৪
সর্বমোট	৭২৩	৯৬২	১১৯৬	১১২৬	১২৭৮	১২২০	১২৮৫	১৩৮৯	১৫৭০	১০০৬	১০৮৩	১১০৮	১৩৯৪৩

৩৫ সংবাদপত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চালচিত্র :২০০৩ : ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার। পৃঃ ৮

Dhaka University Institutional Repository

তুলনামূলক চিত্রঃ ২০০২-২০০৩

সাল	হত্যা	আত্মহত্যা	অপহরণ	সন্ত্রাস সংঘর্ষ	ডাকাতি	ছিনতাই	পুলিশি নির্যাতন	ধর্ষণ	ধর্ষণ হত্যা	নারী ও শিশুপাচার	যৌতুক ও তালাক	এসিড নিক্ষেপ	ফতোয়া	সাংবাদিক নির্যাতন	মোট
২০০৩	২৮৩৭	৯৭১	৮৭০	৪১৮০	১৫৭৬	৮৯৯	৪৭৪	৯৮২	১৩৬	১০৩	৩৯৬	২৪১	৩৪	২৪৬	১৩৯৪৩
২০০২	২৭৭৩	৮৬৬	৮৪০	৩৪৭৮	১৩৫১	৮২১	৪৩৯	১০৬০	১১৯	৮৬	২৭১	২৫৯	৪৪	২৯৬	১২৭০২

তুলনামূলক চিত্র সারণীর মাধ্যমে দেখানো হল ঃ

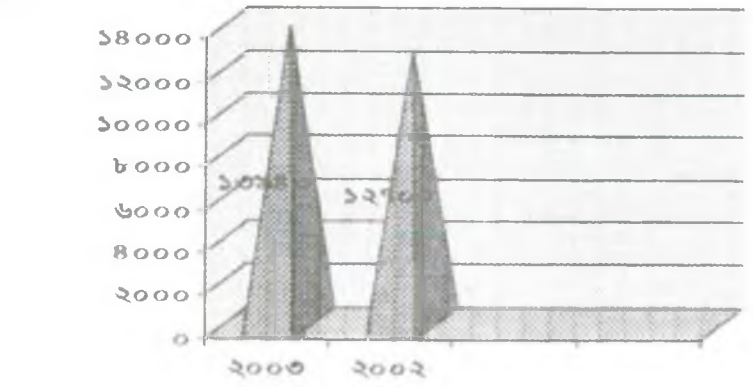

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০০৩ সালে সারাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ১৩৯৪৩টি ঘটনায় ৪৯৯৯১ জন শিকার হয় , পক্ষান্তরে ২০০২সালে ১২৭০২টি ঘটনায় শিকার হয়েছিল ৩৭৮৭৩জন।[৩৬]

---

৩৬. সংবাদপত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চালচিত্র ২০০৩:ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার । পৃঃ১১

Dhaka University Institutional Repository

চার বছরের অপরাধ চিত্রঃ [৩৭]

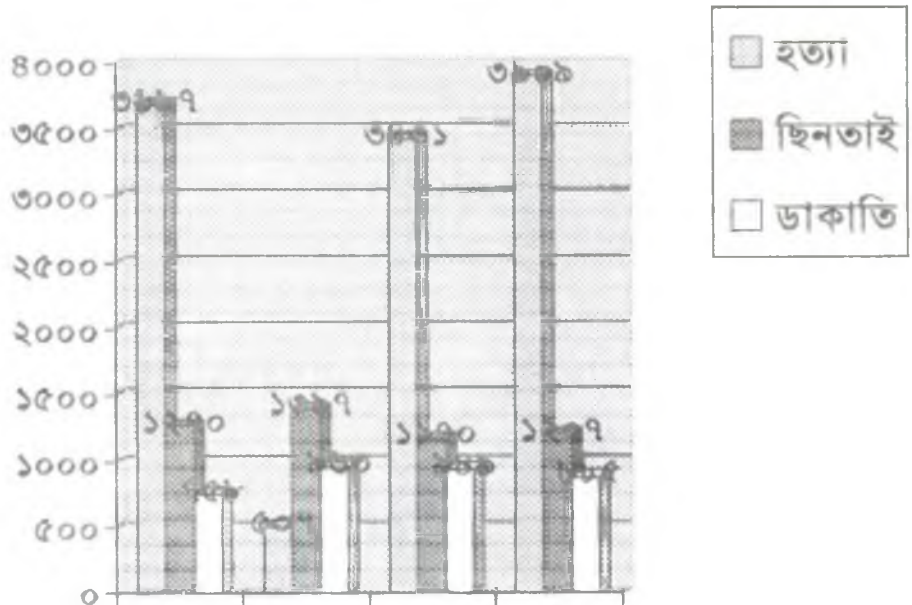

	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪
হত্যা	৩৬৯৭	৫০৭	৩৪৩১	৩৯০৯
ছিনতাই	১২৭০	১৩৯৭	১১৭০	১২০৭
ডাকাতি	৭৫৮	৯৬৩	৯৪৯	৮৮৫

এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ঃ

২০০০ সালের জুন মাসে প্রকাশিত ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয় , সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের যে কৌশলটি ব্যাপক রূপ নিয়েছে তা হলো এসিড নিক্ষেপ এবং তা আশংকাজনক হারে বেড়েছে। ইউনিসেফের হিসাব অনুযায়ী দেশে ১৯৯৬ সালে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ৮০ টি ১৯৯৭ সালে ১১৭ টি , ১৯৯৮ সালে ১৩০ টি , ১৯৯৯ সালে ১৬৮ টি।[৩৮]

মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার' এর এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ২০০০ সালে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ১৮৬ টি, ২০০১ সালে ২৫২ টি ২০০২ সালে ৪০০টি এবং ক্রমান্বয়ে এ সংখ্যা বেড়েই চলছে।[৩৯]

---

[৩৭] .দৈনিক ইত্তেফাক তারিখ: ৮/৪/২০০৫ রোজ শুক্রবার

[৩৮] .ইউনিসেফ প্রতিবেদন ২০০০ইং

[৩৯] . মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'

Dhaka University Institutional Repository

*৫. ইসলামে মানবাধিকার ঃ

ইসলামে মানবাধিকারের প্রবক্তা। মানবাধিকার সম্পর্কিত সুস্পষ্ট নির্দেশনা, নীতিমালা রয়েছে এখানে। মানব কল্যাণে ইসলামের রয়েছে অগ্রগণ্য ভূমিকা। নির্যাতন, নিপীড়ণের বিরুদ্ধে রয়েছে কঠোর হুশিয়ারী। নিম্নে ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার সমূহ আলোচনা করা হল।

☞ *জীবনের নিরাপত্তার অধিকার ঃ

জীবনের নিরাপত্তা লাভ করা প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার। প্রতিটি মানুষ চায় স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে। অথচ পৃথিবীতে আজ খুন, হত্যা, রাহাজানি চরম আকার ধারণ করেছে। মানুষ তার জীবনের নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলেছে। এর একমাত্র কারণ হলো ইসলামী আইনের অনুশাসন মেনে না চলা। ইসলাম মানব জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। হত্যা করাকে সমস্ত মানবকুলের হত্যার সমতুল্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে। আলকুরআনে হত্যা সম্পর্কে কঠোর হুশিয়ারী আরোপ করেছে। মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق

"আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, (ইসলামী আদালাতে হত্যাযোগ্য অপরাধ প্রমানিত হওয়া ছাড়া) যথার্থ অপরাধ প্রমানিত হওয়া ছাড়া তাকে হত্যা করোনা।"[৪০]

আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র এরশাদ করেনঃ

من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعا.

"নর হত্যার অপরাধ প্রমাণিত অথবা সামাজিক জীবনে ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হওয়ার অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ব্যতিরেকে যারা একজন মানুষকে হত্যা করলো, তারা যেন গোটা বিশ্বের সমগ্র জনগোষ্ঠিকে হত্যা করলো।"[৪১]

মানুষের জীবনের নিরাপত্তা হরণকারীর প্রতি গযব ও লানতের ঘোষণা করেছেন।
আল-কুরআনে আছে:

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اليما.

---

৪০. আল কুরআন সুরা বনী ইসরাইল ঃ আয়াত নং ৩৩

৪১. আল কুরআন: সুরা আল -মায়িদা: আয়াত নং ৩২

Dhaka University Institutional Repository

"যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত কোন মুমীনকে হত্যা করলে তার প্রতিদান জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী ভাবে অবস্থান করবে এবং তার প্রতি আল্লাহর গযব ও লানত এবং তার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে মহাশাস্তি।"[৪২]

তিনি আরও বলেন:

ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم.

" দারিদ্রের আশংকায় তোমরা তোমাদের সন্তাদেরকে হত্যা করো না , আমি তোমাদের ও বিশেষতঃ তাদের রিযকের সংস্থান করি।"

তিনি আরও বলেনঃ

ولاتقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق

"ন্যায় সঙ্গত কারন ব্যতীত তোমরা মানুষ হত্যা করো না।"[৪৩]

আল -কুরআনে আরো বলা হয়েছেঃ

ولاتقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم

ان قتلهم كان خطئا كبيرا

"তোমরা খাদ্যের অভাবে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করোনা, আমি তাদের রিযক বিশেষতঃ তোমাদের রিযক প্রদান করি। তাদের হত্যা করা নিশ্চয়ই বড় ধরণের অপরাধ।"[৪৪]

আর ও বলা হয়েছেঃ

ولا تقتلوا انفسكم

" তোমরা আত্ম-হত্যা করোনা।"[৪৫]

واذا الموءدة سئلت باى ذنب قتلت

"আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছে"?[৪৬]

ইসলাম শুধু পৃথিবীতে ভূমিষ্ট সন্তান ও বসবাসকারী মানুষের জীবন রক্ষার অধিকারই ঘোষণা করেনি, বরং গর্ভজাত সন্তান ও সদ্যজাত শিশু, অবৈধ শিশুরও জীবনের নিরাপত্তার অধিকারের নিশ্চয়তা ঘোষণা করেছে।

সম্পদের নিরাপত্তার অধিকারঃ

একজন মানুষের নিকট তার জীবনের পর সব থেকে প্রিয় জিনিস হলো তার ধন-সম্পদ। প্রত্যেক মানুষ চায় তার ধন-সম্পদের নিশ্চয়তা। পৃথিবীর

---

৪২. আল কুরআন: সুরা আন নিসা: আয়াত নং ৯৩

৪৩. আল কুরআন: সুরা বানী ইসরাইল ;আয়াত নং ৩২

৪৪. আল কুরআন: সুরা বানী ইসরাইল : আয়াত নং ৩১

৪৫. আল কুরআন: সুরা আন নিসা: আয়াত নং ২৯

৪৬. আল কুরআন: সুরা আত তাকভীর: আয়াত নং ৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

এমন কোনো বিধান নেই যা মানুষের ধন-সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে । এ ক্ষেত্রে ইসলামই পারে সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। ইসলাম অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, ইয়াতীমের মাল আত্মসাত করা, চুরি করা ইত্যাদি সম্পর্কে কঠোর বিধানের ব্যবস্থা করেছে।

আল্লাহর তায়ালা বলেন : তোমরা শিরক করোনা, চুরি করোনা, ন্যায় ব্যতিত কোন মানুষকে হত্যা করোনা।

ইসলাম মানুষের সম্পদের নিরাপত্তার অধিকার রক্ষার তাগিদ দিয়ে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

"তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস করো না।"[৪৭]

ইসলাম ইয়াতীম ও বিধবাকে দুর্বল ও অসহায় পেয়ে তাদের সম্পদে সম্পত্তিকে আত্মসাৎ করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে কঠোর ভাবে সতর্ক করে বলেছেনঃ

"তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যেয়ো না ।"[৪৮]

রাসুলে করীম (সঃ) তাঁর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি তোমাদের পরস্পরের নিকট পবিত্র , সম্পদের অধিকার রক্ষার গুরুত্ব অনুমেয় হয় রাসুলের (সঃ) নিম্নোক্ত হাদিসে - যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।[৪৯]

৫.৮ ইসলামে এসিড নিক্ষেপের শাস্তিঃ

এসিড দগ্ধ ব্যক্তি মারা গেলে ইসলামের বিধান অনুযায়ী এসিড নিক্ষেপকারী সন্ত্রাসীর শাস্তি মৃত্যু দন্ড।[৫০]

আর মারা না গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামী আইনে এর শাস্তি অর্থদন্ড।এসিড দগ্ধ ব্যক্তির চিকিৎসা প্রয়োজনে প্লাষ্টিক সার্জারির সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করতে হবে । তবে এসিড দগ্ধ ব্যক্তির চোখ নষ্ট হলে,দৃষ্টি শক্তি লোপ পেলে সে ক্ষেত্রে জ্বলন্ত কিছু দ্বারা এসিড নিক্ষেপকারী সন্ত্রাসীর চোখের জ্যোতি ষ্ট করে দেয়ার বিধান ও রয়েছে।[৫১]

***কন্যারূপে নারী:**

আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর

---

৪৭. আল কুরআন: সুরা আল বাক্বারাহ : আয়াত নং ১৮৮

৪৮.আল কুরআন: সুরা বানী ইসরাইল: আয়াত নং ৩৪

৪৯. ইসলাম ও মানবাধিকার : মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম; প্রমিনেন্ট পাবলিকেশন : প্রকাশকাল ৪ জানুয়ারী ২০০২ :পৃঃ ১৩

৫০.ফতোয়ায় আলমগীরি ,৬ষ্ঠ খন্ড,পৃ.৯ শামী ১০ম খন্ড,পৃঃ ১৫৬,হিদায়া ৪র্থ খন্ড,পৃঃ৪৩

৫১ফতোয়ায় আলমগীরি ,৬ষ্ঠ খন্ড,পৃ.৯

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া হত । তাদের জন্মকে অপমানজনক মনে করা হত। নবজাত কন্যা-সন্তান হত্যার রীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল ।

*মান ইজ্জত ওমর্যাদা রক্ষার অধিকারঃ

ইসলাম অন্যদেরকে সম্মান করতে, যার যে মর্যাদা তা রক্ষা করতে বলেছেন। তার কার্যকলাপ দ্বারা যেন অন্যের মর্যাদা ক্ষুন্ন না হয় তার প্রতি সতর্ক করে দিয়েছেন। মানুষের মর্যাদাহান, হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নিন্দা, কুৎসা, রটনা, বিদ্রুপ ও উপহাস করা ও উপাধীকে বিকৃত করাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

لا يسخر قوم من قوم

"তোমাদের কোন সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যেন বিদ্রুপ ও ঠাট্টা না করে।"[৫২]

তিনি আরও বলেনঃ

اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم

"তোমরা বহুবিধ ধারণা থেকে দূরে থাক , নিশ্চয়ই কোন কোন ধারণা পাপ।"[৫৩]

لا يغتب بعضكم بعضا

"তোমরা একে অপরের নিন্দায় লিপ্ত হয়ো না।"[৫৪]

আল্লাহর রাসূল বলেন ঃ

"মুমীনকে গালি দেয়া ফাসেকী আর মুমিনকে হত্যা করা কুফরী।" (বুখারী , মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল (সঃ) আরো বলেন ঃ

তোমাদের কেউ তার অপর ভাইকে অপমানিত , লাঞ্ছিত, সম্মান ও মর্যাদা হানি হতে দেখে তার সাহায্যের জন্য অগ্রসর না হয়, তবে সে পরকালে মহাবিপদের সময় আল্লাহর সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয় , আল্লাহ এমন দিনে তার সাহায্য করবে যে দিন সে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে । (আবু দাউদ)[৫৫]

আল্লাহর রাসূল (সঃ) কোন মানুষের মর্যাদাহানিকরকে ঘৃণতম যুলুম বলে উল্লেখ করেছেন। (আবু দাউদ)[৫৬]

ইসলাম যুদ্ধকালীন অবস্থায় ও নারীর মর্যাদা হরণ , যিনা-ব্যভিচার , নির্যাতন, কারো বিরুদ্ধে নৈতিক অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপনকে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা

---

৫২. আল কুরআন: সুরা আল হুজরাত : আয়াত নং ১১

৫৩ . আল কুরআন: সুরা আল হুজরাত : আয়াত নং ২২

৫৪ .আল কুরআন: সুরা আল হুজরাত : আয়াত নং ১২

৫৫ .আবু দাউদ শরীফ

৫৬ .ইসলামে মানবাধিকার :অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ :প্রাগুপ্ত পৃঃ১৭

Dhaka University Institutional Repository

(রাঃ) চরিত্রের মিথ্যা অপবাদ আরোপের পর আল্লাহ তায়ালা অহী নাযিল করে তা খন্ডন করেন এবং অপবাদ কারীদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়।[৫৭]

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারঃ

মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন। বিভিন্নক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে ইসলামে। ইসলামী নীতি অনুযায়ী কোন উপযুক্ত আদালতে আইনানুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকেও কারদন্ড দেয়া যাবে না । আইনের সুস্পষ্ট বিধান ছাড়া কাউকেও গ্রেফতার, আটক বা বল প্রয়োগ করা যাবে না ।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন;In Islam no man may be imprisoned without justice. সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার বা দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনে সুযোগ থাকবে।[৫৮]

বিচার কার্যক্রমে এ ন্যায়নীতি অনুসরণের ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ-তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়নতার সাথে তা করবে ।[৫৯]

তাইতো ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার দিয়েছে।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাঃ

ইসলাম জনগণক স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে।তারা যাতে নির্বিঘ্নে সত্য প্রকাশ করতে পারে এবং তাদের অভিমত প্রকাশ করতে পারে তার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন । বিভিন্নক্ষেত্রে জনগণের স্বাধীন ভাবে তাদের ভাল মন্দের ব্যাপারে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করতে পারবে । আলকুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

وان تلوا او تعرضوا فان الله بما تعملون خبير

তোমরা যদি প্যাচালো কথার আড়ালে সত্য গোপন করো বা সত্য পাশ কাটিয়ে চলো তাহলে জেনে রাখো , নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সুক্ষ্মভাবে অবহিত।[৬০]

গ্রীক অভিযান কালীন হযরত আমির মুয়াবয়া (রাঃ) উবাদাহ বিন সামীতের অভিমত গুরুত্ব না দেয়ার পর তিনি ক্ষুব্দ হয়ে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) কে বলেন: আল্লাহর শপ থ , আমি যদি এ যুদ্ধে বেঁচে থাকি তাহলে যে ভূখন্ডে তোমার মতো শাসকের কর্তৃত্ব থাকবে সে ভূখন্ডে আমি বসবাস

৫৭.ইসলামে মানবাধিকার ;প্রাগুপ্ত পৃঃ১৭

৫৮.ড. ম.ই. পাটোয়ারী এবং মোঃ আখতারুজ্জামান , মানবাধিকার ও আইনগত সহায়তাদানের মূলনীতি ঢাকা, ১৯৯৩পৃঃ৫

৫৯.আল কুরআন: সুরা আন নিসা: আয়াত নং ৫৮

৬০. আল কুরআন: সুরা আন নিসা: আয়াত নং ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

করবো না। সত্যি সত্যি রোম অভিযান সমাপ্তির পর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন।

খলীফা উমর তাকে ডেকে বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ তুমি ফিরে যাও মুয়াবিয়ার নেতৃত্বাধীন ভূখন্ডে, তুমি বসবাস করো তোমার মত স্বাধীন মত প্রকাশকারী যে ভূখন্ডে থাকবে না-সে দেশের মানুষের কোন কল্যাণ নেই।

হযরত উমর (রাঃ) আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) এর নিকট ফরমান লিখে দিলেন এবং তাতে লিখা ছিল ঃ এ ব্যাপারে উবাদাহ বিন সামীতের অভিমতই সঠিক। আপনি তাই মেনে চলুন। (ইবনে মাযা)[৬১]

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ঃ

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। পারিবারিক ভাবে তারা জীবন যাপন করে। মানুষের রয়েছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অনেক গোপনীয় বিষয়। আর এসব বিষয়ের মধ্যে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা প্রকাশ হয়ে পড়লে অনেক সময় হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। তাই ইসলাম এ গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আল কুরআনে এব্যাপারে বলা হয়েছেঃ

يايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا

وتسلموا على اهلها ذالكم خير لكم لعلكم تذكرون - فان لم تجدوا فيها احدا

فلا تدخلوها لعلكم تذكرون.فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن

لكم وان قيل لكم ارجعوا.فارجعوا هو ازكى لكم.

"হে ঈমানদার গণ, শুনো, তোমরা নিজেদের বাড়ী ছাড়া অন্যের বাড়ীতে মালিকের অনুমতি না নিয়ে ও সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না, এ ব্যবস্থা তোমাদের জন্য যাতে করে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারো, আর যদি বাড়ীতে কাউকে না পাও, তবে তোমরা কদাচ অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করো না, আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় আপনি এখন ফিরে যান, তা হলে তোমরা ফিরে যাবে। আর এ পন্থা তোমাদের জন্য বিশুদ্ধতর।"[৬২]

হাদীস শরীফে আছে ঃ

ولاتجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا

"তোমরা পরস্পর ত্রুপি অন্বেষণ, হিংসা ও শত্রুতায় লিপ্ত হয়ো না, তোমরা যদি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী হও তবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হও।"[৬৩]

হাদীস শরীফে আরও বলা হয়েছে,"তোমরা নিজের গোপন ত্রুটি ও তোমার ভইয়ের ত্রুটি গোপন রাখো।"

---

[৬১].ইবনে মাজাহ

[৬২].আল কুরআন: সুরা আন নুর: আয়াত নং ২৭-২৮

[৬৩].বুখারী শরীফ

Dhaka University Institutional Repository

অপর হাদীসে মহানবী (সঃ) বলেন,
"আল্লাহ গোপনকারী এবং ত্রুটি গোপন করাকে পছন্দ করেন।"

***বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা**

প্রতিটি বিষয়ের প্রতি মানুষের স্ব স্ব বিবেক ,চিন্তা , বিশ্বাস রয়েছে। আর ইসলামী রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের বিবেকের, বিশ্বাসের স্বাধীনতা রয়েছে। সবাই তার আপন বিশ্বাস প্রকাশ করতে পারবে ।আল কুরআনের ঘোষণাঃ দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই । সত্যপথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।[৬৪]

***অমুসলিমের অধিকারঃ**

ইসলাম শান্তির ধর্ম । সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার সুমহান আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতে পারবে নিশ্চিন্তে নির্দিধায়। ঐতিহাসিক মদীনার সনদে স্ব স্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতার কথা নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের জানমাল হিফাজতের অধিকার এবং ধর্মীয় সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও নাগরিক অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। ইসলাম অমুসলিমদের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করেছে।

প্রত্যেক ধর্মের উপাস্যদের নিন্দাবাদ ও গালমন্দকে কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"এরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য দেব দেবীর উপাসনা যারা করে তাদের উপাস্যদের তোমরা গালি দিয়োনা।"[৬৫]

***রুজি রোজগার, উপার্জন ও উৎপাদনের স্বাধীনতা ঃ**

জীবন জিবীকার জন্য রুজি -রোজগার অত্যাবশ্যক । আর এর জন্য দরকার উপার্জন ও উৎপাদন। হালাল জীবিকা অর্জনের জন্য ইসলাম তাগীদ প্রদান করেছে। ইসলাম রুজি-রোজগার, উপার্জন উৎপাদনের স্বাধীনতা প্রদান করেছে। তবে তা বৈধ পন্থায় অর্জনের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হালাল উপার্জনকে ফরয ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছে। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

فاذا قضيت الصلوٰة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله.

আর যখন সালাত আদায় হয়ে যায় তখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো আর আল্লাহর ফরয তথা হালাল রিযিকের সন্ধান করো।[৬৬]
আল্লাহর রাসূল বলেছেন ঃ "হালাল উপার্জন, ফরয ইবাদতের সমতূল্য।"

---

৬৪. আল কুরআন: সুরা আল বাক্বারা: আয়াত নং ২৫৬
৬৫. আল কুরআন: সুরা আল আম: আয়াত নং ১০৮
৬৬. আল কুরআন: সুরা আল জুমআ: আয়াত নং ১০

Dhaka University Institutional Repository

বসবাস , যাতায়াত ও স্থানান্তরের অধিকারঃ

অন্য, বস্ত্র,খাদ্য, বাসস্থান জনগণের মৌলিক অধিকার। নাগরিকগন যে কোন স্থানে বসবাস করার অধিকার আছে। তারা যে কোন জায়গায় (রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত) বসবাস করতে পারবে, যাতায়াত করতে পারবে, স্থানান্তর করতে পারবে। ইসলাম তাদের এ অধিকার দিয়েছে। কুরআন মাজীদে নাগরিকদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদকে মারাত্মক অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে। ইসলাম জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প।

গণতান্ত্রিক অধিকার ঃ

গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার, সতরকারের সমালোচনা করার অধিকার, বিরোধীদলের উপস্থিতি, রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের অধিকার প্রভৃতি ইসলামে অস্বীকৃত নয়। যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে বক্তব্য প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছে।[৬৭]

আইনের দৃষ্টিতে সমতাঃ

সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় ইসলামে রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা । ইসলামী রাষ্ট্রে সকল নাগরিক সুবিচার পাবে, আইনের গ্রহণযোগ্য সমান অধিকার পাবে। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান।সকল সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি আইন সমান ভাবে প্রযোজ্য হবে। হত্যা করলে সকলের শাস্তি একই হবে। কুরআন-হাদীসে সামাজিক সুবিচার প্রাপ্তি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকারের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কালজয়ী বিধান উপহার দিয়েছে।

ইসলামে শুধু আইনের শাসনের নির্দেশই দেয়া হয়নি কেননা আইন যদি পক্ষপাত দুষ্ট হয় আইন যদি স্বৈরচারী রাজা বাদশাহর স্বার্থে রচিত হয়, আইন যদি দলীয় স্বার্থে ব্যক্তির প্রভাব ও মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রণয়ন করা হয়, সে আইন মানব সমাজে ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করতে পারেনা।[৬৮]

ইসলাম দাসপ্রথাকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে । তাদেরকে সমানাধিকার প্রদান করেছে। তাদেরকে অন্যান্যদের মত সম্মান প্রদান করেছে। রাসুলে কারীম (সঃ) এর সময়ের এককালের দাস ছিলেন জায়েদ-বিন-উসমান।তিনি পরবর্তীতে মুসলিম সেনাপতি হয়েছিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) ইসলামী রাষ্ট্র মদীনার প্রথম মুয়াজ্জীন হয়েছিলেন ।

সমতা বিধানে ইসলামের এ অনুপম ভূমিকায় মুগ্ধ হয়ে Dr. Ahmad Golwash তার The Religion of Islam গ্রন্থে বলেন ঃ

---

৬৭. রেবা মন্ডল ও মোঃ শাহজাহান মন্ডল , মানবাধিকার আইন, সংবিধান ইসলাম,এনজিও ; পৃঃ ১০৯

৬৮. ইসলামে মানবাধিকার ;প্রাগুক্ত পৃঃ১৯

Dhaka University Institutional Repository

"Equality of right was the distinguishing feature of the Islamic Commonwealth. A cover from a humble clan enjoyed the same rights and privileges as one who belonged to the noblest Koraish."[৬৯]

সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে আইন অবশ্যই ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক হতে হবে। আর ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা একমাত্র আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রদান করে বলা হয়েছে ঃ

ان الله يأمر بالعدل والاحسان-

"আল্লাহ তায়ালা সুবিচার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন।"[৭০]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وانزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

"নবী ও রাসুলগণের সাথে কিতাব ও মানদন্ড অবতীর্ন করা হয়েছে যাতে করে মানব সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়।"[৭১]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেনঃ

ولا يجرمنكم شنآن قوم على الاتعدلوا فاعدلوا هو اقرب للتقوى

"কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন অবিচার করার দিকে প্ররোচিত না করে, তোমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করো।"[৭২]

তাই আমরা বলব যে, একটি সুশৃঙ্খল ও কল্যাণকামী এবং আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হতে হলে সেখানে অবশ্যই আইনের সমতা থাকতে হবে। আর ইসলাম এ আইনের সমতা প্রদান করেছেন।

*** পারিতোষিক ও বিনিময় লাভের অধিকারঃ**

শ্রমিক তাদের শ্রমের বিনিময় পারিশ্রমিক লাভ করে। তাদের কষ্টার্জিত অর্থ হাতে পেলে তারা অত্যন্ত খুশী হন। তাই ইসলাম শ্রমিকদের সকল অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলামের নীতি হল ঃ বিনা পারিশ্রমিকে কেউ কোন শ্রমিকদের খাটাতে পারবে না। সামর্থের বাইরে তাদের ওপর কাজের বোঝা চাপানো যাবেনা। শ্রমিকের পারিশ্রমিক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের কাছে দিয়ে দিতে হবে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ নবী করীম (সঃ) বলেন, "শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার মজুরী দিয়ে দাও।"[৭৩]

---

৬৯. ড.ম.ই. পাটোয়ারী এবং মোঃ আখতারুজ্জামান, 'মানবাধিকার ও আইনগত সহায়তা দানের মূলনীতি' ঢাকা : ১৯৯৩,পৃঃ৪

৭০. আল কুরআন: সুরা আন নহল: আয়াত নং ৯০

৭১. আল কুরআন: সুরা হাদীদ: আয়াত নং ২৫

৭২. আল কুরআন: সুরা মায়িদাহ: আয়াত নং ৮

৭৩. বায়হাকী, ইবনে মাজাহ

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরও বলেন, "কর্মচারীদের তাদের কাজের লভ্যাংশ দাও। কেননা আল্লাহর শ্রমিকদের বঞ্চিত করা যায় না।" (মুসনাদে আহমাদ)

নারীর অধিকার ঃ

সৃষ্টির আদি থেকেই মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির বংশবিস্তার ও প্রজন্ম রক্ষার দুটো মূল উৎস নির্ধারণ করে দিয়েছেন ; নর ও নারী। শারীরিক সামর্থ্য, মেধাগত যোগ্যতা এবং বৈষয়িক ক্রিয়াকান্ডে কোনসময়ই নারীরা উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা রাখতেই পারেনি বলেই, নারীদের উপর নর বা পুরুষের আধিপত্য প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই চলে আসছে। এ আধিপত্য হিন্দু ধর্মসহ বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন ধর্মে এবং প্রাক-ইসলামী যুগে আরব সমাজে এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, তাদেরকে মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হত না।

এসব অমানবিক ও গ্রহসনমূলক অবস্থা থেকে ইসলাম নারী জাতিকে মুক্তি দিয়ে, তাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক মানদন্ড ও মর্যাদা -সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে, সমাজে বসবাস কারী প্রত্যেককে তাদের অবস্থান-মর্যাদা-সম্পর্ক-অধিকার অনুযায়ী আচরণ করতে মুসলমানদেরকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এভাবেই ইসলামে নারীর মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে।ইসলামে নারীর মর্যাদার ক্ষেত্রগুলো পৃথক ভাবে দেখানো হল।

১.জননী হিসেবে নারীঃ

জননী মা হিসেবে একজন নারীর মর্যাদা সর্বোচ্চ যতটুকু বেশী হতে পারে তার সবটুকু ইসলাম নারীকে দিয়েছে।মহানবী (সঃ)বলেনঃ

الجنة تحت اقدام امهاتكم

"মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত।"[৭৪]

২.কন্যা হিসেবে নারীঃ

প্রাক-ইসলামী যুগে যে কন্যা সন্তানকে অমর্যাদাকর মনে করে জন্মের পরই জীবন্ত কবর দেয়া হতো, সে কন্যা সন্তানের নিরঙ্কুশ বাঁচার ও মর্যাদার অধিকার ইসলাম ঘোষণা করেছে। *মহানবী (সঃ)এর বাণীঃ

من كانت له انثى فلم يادها ولم يهنها ولم يؤثر ولده

عليها يعنى الذكور ادخله الله الجنة.

"যার কন্যা সন্তান হয়েছে অথচ তাকে জীবন্ত কবর দেয়নি বা তাকে লাঞ্ছিত ও করেনি কিংবা কন্যা সন্তানের তুলনায় পুত্র সন্তানকে বেশী আদর যত্ন করেনি, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"

৭৪.মাযমাউয যাওয়ায়েদ ও মামবাউল ফাওয়ায়েদ: হাফিজ নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবি বাকর আল-হায়সামী:(দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন, ১৪০৮/১৯৮৮)কতাবুর বিরর ওয়াসিলাহ বাব- মা জাআ ফিল বিররি ওয়া হাকিল ওয়ালিদাউন, ৮ম খন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

৩.স্ত্রী হিসেবে নারী ঃ

মূলতঃ প্রাক-ইসলামী যুগে নারীদেরকে স্ত্রী হিসেবেই বেশী অমানবিক নিপীড়ণের শিকার হতে হয়েছিল। তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকরণের কঠোর নির্দেশ আল্লাহ ও তার রাসুল দিয়ে গেছেন।

আল্লাহর বাণীঃ

هن لباس لكم وانتم لباس لهن.

'তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের ভূষণ আর তোমরা তাদের ভূষণ।'[৭৫]

واتقوا الله فى النساء

'তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে।'

لزوجك عليك حق

'তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে।'

خياركم خياركم لنسائكم

'স্ত্রীদের কাছে যারা উত্তম ,তারাই তোমাদের মধ্য উত্তম'

৪. *মানবিক মর্যাদাঃ*

ইসলাম পুরুষের সঙ্গে নারীকে একই মর্যদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাদের রক্ষাকবচ হিসেবে বহু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে।

আল্লাহর বাণীঃ

يايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.

"হে মানব সম্প্রদায় , তোমাদের প্রভুকে তেমরা ভয় কর ,যিনি তোমাদের একটি মানুষ হতে সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় হতে বহু সংখ্যক স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি করেছেন"[৭৬]

৫.ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষাঃ

ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা নারীকে সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে এবং স্ত্রী ,কন্যা, মাতা, আত্মীয় হিসাবে তার ব্যক্তিগত মর্যদা,অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে

৬.মৌলিক অধিকার সংরক্ষণঃ

ইসলাম পুরুষের মতো নারীরও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রে অন্ন-বাসস্থান ও মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে শুধু উপদেশের মাধ্যমেই নয় বরং পালনীয় আইন সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৭.রাজনৈতিক মর্যাদা ঃ

পুরুষের মতো নারীদেরও রাজনৈতিক অধিকারগুলো ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত। যেমন তাদের অবাধে মত প্রকাশের , ভোট প্রদানের কিংবা সমালোচনার অধিকার ইসলাম দিয়েছে।প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাই

---

৭৫. আল-কুরআন : সুরা আল বাকারাহ ঃ আয়াত নং ১৮৭

৭৬. আল-কুরআন : সুরা আন নিসা ঃ আয়াত নং ১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী রাষ্ট্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

৮.জীবনের নিরপত্তার নিশ্চয়তাঃ

ইসলাম একজন নারীকে জীবন, সম্পদ,মান-সম্ভ্রম ও সামাজিক মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করেছে।

৯.শিক্ষার অধিকার ঃ

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, ইসলামী জ্ঞানার্জন অপরিহার্য হিসেবে ঘোষণা করেছে যা ধর্মীয় জীবনের পাশাপাশি বৈষয়িক ক্ষেত্রসমূহে ও প্রযোজ্য। মহানবী (সঃ) বলেছেনঃ

طلب العلم فريضة على كل مسلم

"জ্ঞানান্বেষণ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপরই ফরজ।"

১০.জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ঃ

কোন মহিলা যদি সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষা শেষ করে উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী হয় , ইসলাম তাকে উৎসাহিত করে এবং এ ব্যাপারে কোন বৈষম্য রাখেনি।

১১.সামরিক ক্ষেত্রে অধিকার ঃ

ইসলাম সামরিক ক্ষেত্রেও জ্ঞানার্জন ও দক্ষতার্জনে নারীকে উৎসাহিত করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে যখন নিজ সম্ভ্রম ও শরীরের উপর আক্রমন আসে তখন নারী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে । এছাড়া ও ওহুদ যুদ্ধে হযরত আয়েশা ও উম্মে আওফা যোদ্ধাদের পানি পান করিয়েছিলেন যা নারীকে সহযোদ্ধা হিসেবে ইসলাম মর্যাদা দিয়েছে।

১২.অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেঃ

প্রাক-ইসলামী যুগের বঞ্চিত নারীকে ইসলামই প্রথম অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাদের এসব অর্থনৈতিক অধিকার নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিহত এবং হস্তক্ষেপের যোগ্য নয়।

১৩.উত্তারিধকার অর্জনেঃ

প্রাক-ইসলামে যুগে কিংবা (বর্তমানে) হিন্দু ধর্মে যে নারীরা সম্পত্তির অধিকারই পেত না, সে ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদেরকে পিতা, মাতা, নিকট আত্মীয় ও স্বামীর পক্ষ থেকে উত্তারাধিকার অর্জনের অধিকার দিয়েছে।

১৪.ভরণ-পোষণের অধিকারঃ

নারীরা বিয়ের পূর্বে অভিভাবক এবং বিয়ের পরে স্বামীর কাছ থেকে ভরণ-পোষণ লাভ করবে এ অধিকার ইসলাম নিশ্চিত করেছে।

১৫.নিজস্ব সম্পদ অর্জনঃ

ব্যক্তিগত ভাবে অর্জিত টাকা পয়সা দিয়ে নারী ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। এতে স্বামী কিংবা তার অভিভাবকরা কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না । তার সম্পদের একক মালিকানা তার নিজেরই।

১৬.স্বামী নির্বাচনের অধিকার ঃ

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় স্বামী নিজ পছন্দ মতো নির্বাহন করা স্ত্রীদের

(ক). মিশকাতুল মাছাবীহ: শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ : কিতাবুল ইলম : পৃঃ ৩৪ : মাকতাবা মাবেফুল কুরআন :চকবাজার ঢাকাঃ ১২১১

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়াকে মহানবী (সঃ) নিরুৎসাহিত করেছেন।

১৮.তালাক গ্রহণঃ

অযোগ্য ও অপদার্থ স্বামীর কাছ থেকে মুক্তি নিয়ে নারীর বিবাহ বিচ্ছেদকরণের অধিকার ইসলামে স্বীকৃত । কোন নারীকে ইসলাম নিগৃহীত হতে উৎসাহিত করেনি।

১৯.পুর্ণবিবাহের অধিকার ঃ

কোন নারীর স্বামী মারা গেলে কিংবা তালাক প্রাপ্তা হলে, তার দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইসলাম কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি। এটি ইসলামে স্বীকৃত ।

২০.মোহরানা ঃ

বিয়ের পর স্ত্রীরা নিজ অধিকারেই স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা প্রাপ্য হিসেবে পাবেন। এটি প্রত্যেক বিবাহিত মুসলমানকে অবশ্যই আদায় করতে হবে । এটা কখনো মাফ হয়না।

২১.সদাচারণ পাবার অধিকার ঃ

স্বামীর পক্ষ থেকে কিংবা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে নারীরা সদাচারন পাবার অধিকারী । এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وعاشروهن بالمعروف

তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর।[৭৭]

২২.ধর্মীয় মর্যাদা ঃ

পরিশেষে ইসলামী জীবন ধারায় মৌলিক উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসুল (সঃ)নর কিংবা নারীর মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য সৃষ্টি করেননি। নারী -পুরুষ প্রত্যেকেই আল্লাহর উপাসনার মাধ্যমে পৃথকভাবে পারলৌকিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হতে পারেন। নিজ নিজ কৃতিত্বের জন্যে যেমনি ভাবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে , তেমনি অপকর্ম এবং অপারগতার জন্যে পৃথক জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর বাণীঃ

وسن يعمل من الصلحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك

يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا

"পুরুষ বা স্ত্রী যে লোকই নেক আমল করবে।ঈমানদার হয়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে , এ ব্যাপারে কারো প্রতি এক বিন্দু জুলুম ও করা হবে না।"[৭৮]

---

[৭৭].আল-কুরআন : সুরা আন নিসা ঃ আয়াত নং ১৯

[৭৮].আল-কুরআন : সুরা আন নিসা ঃ আয়াত নং ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

*অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও কর্ম সংস্থানের অধিকার ঃ

ইসলাম জাতি ,ধর্ম,নির্বিশেষে সকল মানুষ তথা প্রাণী কুলের খাদ্যের নিরাপত্তার অধিকার প্রদান করেছে।ইচ্ছা ও সামর্থ অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি যে কোন পেশা ও চাকরী গ্রহণ করতে পারে।

দুঃস্থ, পঙ্গু, ইয়াতীম মিসকিন ও সকল শ্রেণীর মানুষের জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদান ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যবস্থার অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেছেন ঃ "যাদের অভিভাবক নেই , তাদের অভিভাবক আমি"

*শিক্ষার অধিকার ঃ

ইসলাম সকল স্তরের মানব সমাজের উপর জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করে মানবাধিকারকে সমুন্নত করেছে। ইসলাম বলে ঃ জ্ঞানী ও মূর্খ সমান হতে পারেনা । ইসলাম বলে জ্ঞানীর মর্যাদাই সমুন্নত । ইসলামে জ্ঞানের কালিকে শহীদের রক্তের চেয়েও উত্তম বলে ঘোষণা দিয়েছে। ইসলাম প্রত্যেক নর-নারীর জন্য জ্ঞানার্জন ফরয করেছে।

*৬.সার্বজনীন আদর্শঃ

বিশ্ব সভ্যতার আলোক দিশারী,সাম্যের বাহক, বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক মহানবী (সঃ) এর প্রবর্তিত ইসলাম মানবতাকে শান্তি ও কল্যাণের দিশা দেখিয়েছে।ইসলাম সকল উত্তম আদর্শের এক মডেল বা নমুনা। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই রাহাজানি , ধর্ষণ সহ সকল অপরাধের বিরুদ্ধে ইসলামের রয়েছে অগ্রগণ্য ভূমিকা । আজ বিশ্বে সর্বত্র মানবাধিকার লংঘনের ভয়াল চিত্র আমরা পত্র-পত্রিকা খুললেই দেখতে পাই।

বিচারের বাণী আজ নিভৃতে কাঁদে। মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে ইরাকে, আফগানিস্তানে,মানবাধিকার লংঘনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে কিউবার গুয়ানতানামো বের মার্কিন বন্দীশালায় । যৌন নির্যাতন, প্রচন্ড তাপে রাখা, ইলেকট্রিক শক দেয়া, প্রহার করা , মাদক গ্রহণ করানো , ধর্মীয় নির্যাতন, সম্প্রতি কুরআন অবমাননার অভিযোগ উঠেছে সেখানে। মার্কিন বন্দীশালায় গুয়ানতানামো বে তে ২৮ টি দেশের শত শত নাগরিক বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে; অমানুষিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে ।

বাংলাদেশে চলছে নানা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা।হত্যা, ছিনতাই, ধর্ষণ, নির্যাতন মানবাধিকার লংঘনের পর্যায় পড়ে। মানবাধিকার লংঘনের সচিত্র প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন দেখলেই বুঝা যায় মানবাধিকার লংঘনের ভয়াবহ পরিস্থিতি।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের পরিস্থিতিটি উপলব্ধির জন্য আবারও একটি চিত্র পুনরায় উল্লেখ করা হলঃ

চার বছরের চিত্রঃ

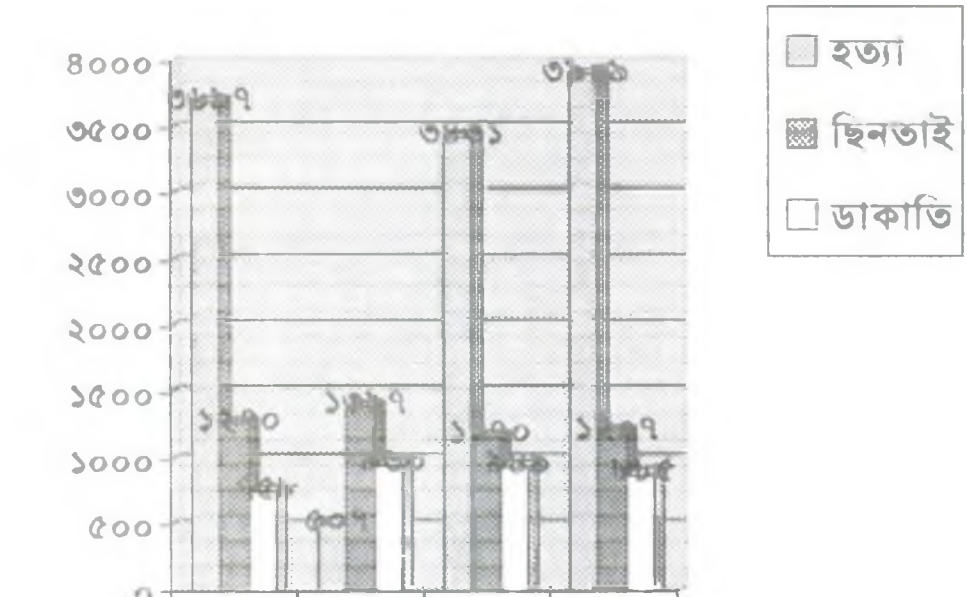

	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪
হত্যা	৩৬৯৭	৫০৭	৩৪৩১	৩৯০৯
ছিনতাই	১২৭০	১৩৯৭	১১৭০	১২০৭
ডাকাতি	৭৫৮	৯৬৩	৯৪৯	৮৮৫

ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেছে। যেমনঃ

*জীবনের নিরাপত্তার অধিকার *সম্পদের নিরাপত্তার অধিকার
*মান ইজ্জত ওমর্যাদা রক্ষার অধিকার
*ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার *মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা
*ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার
*বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা *অমুসলিমের অধিকার
*রুজি রোজগার, উপার্জন ও উৎপাদনের স্বাধীনতা
*বসবাস , যাতায়াত ও স্থানান্তরের অধিকার ।

বিষয়টি সার্বজনীন কিনা তা বিশ্লেষণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর একটু দৃষ্টিপাত করি ঃ

Dhaka University Institutional Repository

*এ বিধানের কোন ক্ষতিকর প্রভাব আছে কি?
*এ আইন সকলের জন্য মঙ্গলজনক কিনা ?
*এ বিধান প্রযোজ্য হলে কি প্রভাব পড়বে?
*জাগতিক সমস্যার কোন সমাধান হবে কিনা;
*অন্যান্য ধর্মে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে কিনা।

উপরে ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ে লিখতে গিয়ে অত্র বিষয় শিরোনামের প্রত্যেকটির উপর আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম প্রবর্তিত বিধানগুলো আজ সর্ব স্তরে গ্রহণ করতে হয়েছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ ইসলাম প্রদত্ত বিধানের মধ্যেই নিহিত । ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার আইন সারা বিশ্বের জন্য এক কল্যাণময়ী আদর্শ। যা সকলের জন্য সুফল বয়ে নিয়ে আসবে। এ বিধান কোন ক্রমেই ক্ষতিকর নয় ।আর ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকার সকল ধর্মের,গোত্রের জন্যই ভাল ।তাইতো বলব যে ইসলাম প্রদত্ত আইন হল সার্বজনীন ।

ইসলামের এ সুমহান আদর্শ অর্থাৎ মানবাধিকারের জন্য প্রদত্ত বিধানাবালী চির অমর । যুগে যুগে এর প্রয়োজনীয়তা এবং যথার্থতা যুগের মণীষীগণ, বুদ্ধিজীবীগণ উপলব্ধি করেছে। বুঝতে পেরেছে এ আদর্শ সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য । অতএব ইসলামের এ বিধান সার্বজনীন, সর্বজনের নিকট অত্যন্ত গ্রহণীয়, অনুকরণীয়। মানবাধিকার সম্পর্কিত বিধানবালী অনুসরণ করলে দেশ থেকে সকল অনাচার বিলুপ্ত হবে।সন্ত্রাস নির্মূল হবে। ধর্ষণ, নির্যাতন বন্ধ হবে। এসিড নিক্ষেপ, হত্যা থেকে দূরে থাকবে । দেশ হবে শান্ত। পাবে সুফল সকল বর্ণ , গোত্র, জাতি।

সমাপ্ত

আল্লাহ মহান।

Dhaka University Institutional Repository

৫ম অধ্যায়
উপসংহার

ইসলাম শান্তি আনায়ন, অশান্ত দূরীকরণ এবং অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহান বাণী, মূল মন্ত্র নিয়ে এসেছে। অজ্ঞতা আর কুসংস্কার বিদূরীত করে আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে এসেছে। ইসলাম মানবাতর মুক্তির সনদ। ইহকালীন এবং পরকালীন সফলতার হাতিয়ার। এর ধারক ও বাহক হলেন বিশ্ব মানবতার মুক্তির কান্ডারী, সমাজ সংস্কারক, বিপ্লবী রাষ্ট্রনায়ক, মহান আদর্শ নেতা, সাম্য ও সংহতির বাহক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। তিনি হলেন আদর্শের মূর্ত প্রতীক বা মডেল। তার প্রবর্তিত আদর্শে আজ দিশেহারা মানবজাতি মুক্তির তন্ত্র মন্ত্র খুজে পায়। সকল জাতিই তার আদর্শে আদর্শবান হওয়ার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হয়। ইসলামী আদর্শ সার্বজনীন।

দীর্ঘ ত্যাগ-তিতিক্ষা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং আবাল-বৃদ্ধা-বণিতা, জাতি-গোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফসল এ স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতার আজ দীর্ঘ ৩৪ বছর উদযাপন করছি। নানা সমস্যার আবর্তে জর্জরিত আমাদের এ দেশ। এ সমস্যা দূরীকরণে ইসলামী আহকাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক রাখতে পারে। বাক স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে মহল বিশেষ ইসলাম ও ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে বিষেদাগার ছড়াচ্ছে। অথচ ইসলামই অন্যায়ের মূলোৎপাটন কারী, সন্ত্রাসের নির্মূল কারী, জাগতিক লোভ-লালসা থেকে বিমুক্ত হতে প্ররোচিত করে। আমাদের প্রিয়ভূমির আর্থ-সামাজিক সমস্যা নিরসনে ইসলামী আদর্শ অসামান্য অবদান রাখতে পারে। সার্বজনীন কালজয়ী আদর্শ ভুক্তভোগী শ্রেণীদের মাঝে রেখাপাত করতে পারে।

আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারী এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীর অবমূল্যায়ন, নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের বলী, স্বামীর ঘরে নির্যাতন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে,অফিস আদালতে নির্যাতন, এ এক অহরহ ঘটনা। ইসলামে এ সকলের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আবার অনেক ধর্মে বিবাহকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। একাধিক বিবাহের অনুমোদন না দেয়ার কথা বলা হয়েছে। ইসলাম অত্যন্ত যৌক্তিক সাপেক্ষে এর বিধান প্রবর্তন করেছে।অত্র গবেষণার ১ম অধ্যায় এ ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের জীবন-ব্যবস্থায় বিভিন্ন আর্থিক সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়। সমাজে সুদ, ঘুষ এক অভিশাপ হয়ে প্রভাব বিস্তার করছে। কলঙ্ক লেপন করছে আমাদের সুশীল সমাজকে। এ থেকে জাতি আজ মুক্তির দিশা

Dhaka University Institutional Repository

খুজছে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত আমাদের এ দরিদ্রতম দেশ বাংলাদেশ। দিন দিন বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল পত্র প্রণয়ন করেছে। পুঁজিবাদী আর সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অর্থমুক্তির চাবিকাঠী নয়। আলিফ লায়লার আলাদীনের চেরাগ নয় যে, বললেই অর্থনৈতিক মুক্তি পাবে। তবে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক মুক্তির অন্যতম অনুকুল। ইসলামের সার্বজনীন রূপরেখা আমাদের সার্বিক মুক্তির সন্ধান দিতে পারে।

সংখ্যালঘু আর সংখ্যাগুরুর নির্যাতনের কল্পকাহিনী অথবা বাস্তব কাহীনি আজ বেশ জনবিশ্রুত। ইসলামতো সুমহান আদর্শের প্রতীক। সংখ্যালঘুদের অধিকার ইসলাম দিয়েছে সার্বিকভাবে। তাদের মৌলিক অধিকারের উপর ইসলাম আঘাত করেনি।

ইসলামে পররাষ্ট্রনীতির বাস্তব মডেল দেখিয়ে গেছেন বিশ্বের বিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক,মহানবী মুহাম্মদ (সঃ)। তিনি ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন । মদীনার সনদে তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত পাই।

মানবাধিকার সংস্থা, বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লংঘনের চিত্র তুলে ধরেছে। আফগানিস্তান, ইরাক কাশ্মীর, সুদানের দারফুর অঞ্চল সহ অনেক দেশের মানবাধিকার লংঘনের তথ্য উপস্থাপন করছে। মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে আমাদের স্বীয় ভূমি বাংলাদেশে। এর বিরুদ্ধে ইসলাম কি ব্যবস্থা রেখেছে ; তার অনেক বিষয় মানবাধিকার অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

বিশ্বমানবতা আজ মুক্তি চাচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক অবক্ষয় থেকে, রাজনৈতিক অস্থিরতা আর অশান্তি থেকে,অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে। ইসলাম এ সব বিষয়ে সার্বিক মুক্তির পথ দেখিয়েছে। ইসলামের সুমহান আদর্শ সার্বজনীন। অত্র অভিসন্দর্ভটিতে এরই চিন্তার বহিপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জাতীয় জীবনে সামাজিক কল্যাণ দান করুণ, আমাদের মুক্তির পথে চলার তওফিক দান করুণ, আল্লাহ আমাদের কবুল করুক ।

আমিন।।

মুহাঃ গোলাম ছরোয়ার
এম.ফিল. গবেষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ পঞ্জি

বাংলা

*ডঃ মুস্তফা আস-সায়াফী ঃ ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার), ঢাকা-১৯৮১।

* সুগত চাকমা ঃ বাংলাদেশের উপজাতি (প্রথম প্রকাশ : ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫)

*আনু মোহাম্মাদ ঃ নারী ,পুরুষ ও সমাজ,সন্দেশ (বইপাড়া, ঢাকা, খ্রি.১৯৯৭)

*আঃ খালেক ঃ নারী ও সমাজ

*আসমা জাহান হেমা ঃ ইসলামের ছায়াতলে নারী , (আল এতহাক প্রকাশনী ,২/৩, প্যারিদাস রোড, বাংলা বাজার , ঢাকা ১০০০,অক্টোবর ২০০২)

*ড.হাসান মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন ঃ প্রধান দাওয়াহ ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ ;দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা;প্রকাশিত পত্রিকা ;দৈনিক ইনকিলাব।

*সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ ঃ নারী নির্যাতনের রকমেরফের : প্রকাশক ; বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ। প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর, ২০০২।

*ডঃ মুস্তফা আস-সায়াফী ঃ ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী ; (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা :১৯৮১

*মাঃ আব্দুর রহীম ঃ পরিবার ও পারিবারিক জীবন :

*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

* নদভী এ সুলাইমান ঃ হিরোইক ডিডস অব মুসলিম উম্যান , ইসলামিক পাবলিকেশন লিঃ লাহোর পাকিস্তান। সিদ্দিকী, উম্যান ইন ইসলাম , ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক কালচার, লাহোর , পাকিস্তান, ১৯৫৯।

*ড. হায়াৎ মামুদ ঃ উচ্চতর স্বনির্ভর বিশুদ্ধ ভাষা- শিক্ষা;দি এটলাস পাবলিশিং হাউস : ষষ্ঠ সংস্করণ : জুন ২০০৪

*মাওঃ মুহাম্মাদ বুরহান উদ্দীন সাম্ভলী ঃ পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম।

*মোঃ আলতাফ হোসেন ঃ হিন্দু আইন।

*.মনুস্মৃতি ঃ ৮ম খন্ড।

*.ডঃ জামাল বাদাবী ঃ ইসলামের সামাজিক বিধান।

Dhaka University Institutional Repository

*মাঃ আশরাফ আলী থানভী(রহঃ) ঃ যুক্তির আলোকে শরয়ী আহকাম।

*ডঃ মোহাম্মদ জাকির হুসাইন ঃ আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ। প্রকাশক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ; প্রকাশকাল ঃ আগস্ট,২০০৪

*মো আতিকুর রহমান ঃ সামাজিক সমস্যা ও উন্নয়নঃ নীতি - পরিকল্পনা ও কর্মসূচী(ঢাকাঃ কোরআন মহল ও অনার্স পাবলিকেশন্স, ২০০০ইং)

* আসমা জাহান হেমা ঃ ইসলামের ছায়াতলে নারী . (আল এতহাক প্রকাশনী ,২/৩,প্যারিদাস রোডা, বাংলাবাজার . ঢাকা ১০০০, অক্টোবর, ২০০২)

*সাইমন ডি বিভোর ঃ দ্য সেকেন্ড সেক্স ,(এশিয়াটিক পাবলিকেশনস ঢাকা খ্রিঃ২০০১)

*বাংলাদেশ নারী নির্যাতন ঃ কিছু পরিসংখ্যান ;আর্ন্তজাতিক নারী দিবস

*মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'

*সংবাদপত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চালচিত্র ২০০৩ ঃ ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার।

*আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী ঃ মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার . (আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা, জুলাই , ২০০৩)

* মাওলানা হিফজুর রহমান ঃ ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

*মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফ ঃ ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং -এর রূপরেখা, এমদাদিয়া বুক হাউজ, ঢাকা ৩য় সং ১৯৯৯

*মাওলানা মুহাম্মদ আঃ রহীম ঃ ইসলামের অর্থনীতি , খায়রুণ প্রকাশনী, ঢাকা,৪র্থ সং ১৯৮৭

*মোহাম্মদ লুৎফর হক ও প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান ঃ আধুনিক অর্থনীতি।

*ড.এম.এ.মন্নান,ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ ঃ (অনুবাদ ঃ আলী আহমাদ রুশদী) ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা,১৯৮৩

*প্রফেসর খুরশীদ আহমদ ঃ Islamic Economics.

*এ.জেড. এম.শামসুল আলম ঃ ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, ইফাবা.ঢাকা.২য় সং ২০০৩

*শেখ মাহমুদ আহমদ ঃ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ।

*ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড ঃ অর্থনীতিবিদদের যুগ।

Dhaka University Institutional Repository

*ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ ঃ ডঃ এম . এ মন্নান ।

*গোলাম মোস্তফা ঃ ইসলাম ও কমিউনিজম ।
*বাইবেল ঃ মাত্তা ; ৬ষ্ঠ অধ্যায় , ২৪-২৬ আয়াত।
*লোকা ঃ ১২শ অধ্যায়, ১৫-২১ আয়াত।
*বাংলাদেশ অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ঃ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ;২০০৪
*মোহাম্মদ লুৎফুল হক ও প্রফেসর মোতাফিজুর রহমান ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি
*মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী ঃ পুঁজিবাদ বনাম ইসলাম ; আধুনিক প্রকাশনী।
*ড. মুজিবুর রহমান খান ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর একুশ বছর পুর্তি সংখ্যা।
*প্রিমিয়াম সাধারণ জ্ঞান ঃ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ।
*বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরিপ, ২০০০ (প্রাথমিক প্রতিবেদন)
*বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩
*BIDS রিপোর্ট ঃ ১৯৯৬,১৯৯৯,২০০১
*কবি কাজী নজরুল ইসলাম ঃ দারিদ্র্য কবিতা
*বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ঃ ২০০০।
*২০০৩-০৪অর্থ বছরের বাজেট
* অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা ঃ দৈনিক ইনকিলাব ১০ জুন ২০০৫
*মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ঃ আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৫৫ইং)
*অধ্যক্ষ হাওলাদার আব্দুর রাজ্জাক ঃ মহানবী (সঃ) এর অর্থনৈতিক সাম্য ওবর্তমান বিশ্ব, অগ্রপথিক (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ .জুন , ১৯৯৫ ইং)
*আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী ঃ কানযুল উম্মাল ;(বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫ ইং) খঃ ৪
*অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন ঃ সুদ সমাজ অর্থনীতি ; ঢাকা ঃ ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯২
*সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী ঃ সুদ ওআধুনিক ব্যাংকিং,অনুবাদ: আব্বাস আলী খান ও আবদুল মন্নান তালিব । (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯ ইং)
*শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ঃ ইসলামী অর্থনীতি ঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ (রাজশাহীঃস্কয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬ ইং) পৃঃ ৩২
*সাইয়্যেদ হাসান মুসান্না নদভী ঃ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা(ঢাকাঃ

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

*মোঃ আবু সিনা ও খন্দকার জিয়াউল হক ঃ যাকাত ; ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠনের অন্যতম উপাদান ,দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ , (কুষ্টিয়া ঃ ১৯৯৭ ইং) ডিসেম্বর , খ, ৬

*অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন ঃ যাকাত কি ও কেন (ঢাকা ঃ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫ইং)

*আদম শুমারী ঃ ২০০১ ইং রিপোর্ট

*অধ্যাপক গোলাম আযম ঃ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ:আধুনিক প্রকাশনী।

* বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ঃ ২০০৫ ইং

*সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার : আহসান পাবলিকেশন

*প্রাইভেট ইন্টারন্যাশনাল অফ ইসলাম লেকচার সিরিজ ঃ দি হেগ: ১৯৩৩ সুত্র : ইসলাম পরিচয়: ডঃ মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ :ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

*প্রফেসরস বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ।

* মাওলানা আব্দুর রহীম ঃ ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা : খায়রুণ প্রকাশনী : ১৩ , কারকুন বাড়ী লেন, প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ; ১৯৮৭

*অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাশেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ ঃ ইসলামে মানবাধিকার : আর আই এস পাবলিকেশন্স ঢাকা ।

* গাজী শামছুর রহমান ঃ মানবাধিকার ভাষ্য

*এ কে ব্রোহী ঃ ইউনাইটেড নেশনস এন্ড হিউম্যান রাইটস ।

*প্রটেরশন অফ হিউমেন রাইটস আন্ডার ইজি যিওকোর ঃ সুত্র: ইসলামে মানবাধিকার

*মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম ঃ ইসলাম ও মানবাধিকার এমিনেন্ট পাবলিকেশন :প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী , ২০০২

*ড. ম.ই. পাটোয়ারী এবং মোঃ আখতারুজ্জামান ঃ মানবাধিকার ও আইনগত সহায়তা দানের মূলনীতি :ঢাকা, ১৯৯৩

*রেবা মন্ডল ও মোঃ শাহজাহান মন্ডল ঃ মানবাধিকার আইন, সংবিধান ইসলাম এনজিও ।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি

*Nazhat Afza and khurshyid Ahmad : The position of woman in Islam. Islamic Book publishers, Kuwait 1982
*A.C. Pigou : Economics Welfare.
*Encyclopedia Britannica
*Bible : Genesis 3.16 New York. 1973.
* Sexual Behaviour in Human Male : p. 552.
*Germaine Greer : The female Eunuch .P:242 MccRAW IIILL-1971
*Encyclopedia of Religion and Ethic : ৮ম খন্ড
* Klansmen. Joseph : From Jesus to Paul , London 1964
* Bible -1, Corinthians .7: 1,26,28,29,32
* Report of the Commission : Marriage .Divorce and the Church, London 1971
*Every man's Encyclopedia : Vol- 16 ;Said Abdullah self Al-Hastily Woman in Islam.
*Dr. Mustafa as-Sibaajy : Al-Mana Bina al-Fiqh wal Qaanun.
* The world Book Encyclopedia : Polygamy.
India status of women in Ancient India.
*William kelly Wright : Philosophy of Religion.
*James C.Coleman : Abnormal Psychology and modern life 5th edition .
*Larry laudan : Danger Ahead .
*J. E. Clare Me Faarlane : The case for polygamy. Quoted in Islam; The First and final Religion.
*Will Laurent : The story of civililzation.
*Fida Hussain Malik : Wives of the Prophet.
*Adm Smith : An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nations.
*J.S. Mill : Principles Of Political Economics
* Moulana Fariduddin Masuod : Workers Right in Islam. (Dhaka: Islamic Islamic Foundation Bangladesh 1987)First Ed.
*Dewey Robert E. Freedom : The Macmillan Company, 1970
*Alfred Marshall : Principles Of Economics.
*Leonel Robbins : An Essay on the Nature and Significance

Dhaka University Institutional Repository

of Economics of Enterprise.

* Davenport : Economics of Enterprise

*Tabor Scitorsky : Wealth and Welfare.

*Cannon : Elementary Political Economy Ch. 1

*J.L Hanson : A Dictionary of Economics and Commerce, (London: 1975)

*Charles Booth : Labour and life of the People in London, (London: 1902)

* Rose Michael : The Relief of Poverty, (London: Macmillan, 1989)

*Robert Chambers : Poverty in India ; Concepts, Research and Reality, (Delhi: Concept Publishing Co. 1996).

* Dr. Anwar Iqbal Quraishi : Islam and the Theory of Interest (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh. 1987)

*Table developed from BBS Statistical Year Book 1992. Statistical Year Book -1992

* A Board of Editors : Thoughts on Economics; The Quarterly journal of Islamic Economics Research Bureau, (Dhaka : December, 1994),vol . 4

* Mcllwain Charles. Howard : Constitutionalism. Great Seal Books, New York , B,1947

আরবী ও অন্যান্য গ্রন্থঃ

*আল কুরআন ঃ সূরা আল-বাকারা, সূরা আলে-ইমরান, সূরা আন নিসা, সূরা আল-মায়িদা, সূরা আল-আন'আম, সূরা আল আ'রাফ, সূরা আত তওবা, সূরা আন নহল, সূরা বনী ইসরাইল, সূরা আল-আম্বিয়া,সূরা আন-নুর সূরা আশ শুয়ারা,সূরা রূম, সূরা আল আহযাব ,সূরা আল ফাতির, সূরা মুহাম্মদ, সূরা আশ শুরা, সূরা আল আহকাফ, সূরা আল হুজরাত, সূরা আল হাদীদ, সূরা আল জুমু'আ,সূরা মুযযামিল, সূরা রা'দ ,সূরা

Dhaka University Institutional Repository

আদ দাহার, সূরা যারিয়াত,সূরা আত তাকবীর ।

*হাদীস গ্রন্থ ঃ-

* বুখারী শরীফ ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী: জামে আস-সহীহ (মাকতবা রশীদিয়া ,দিল্লী,তা,বি,)

*মুসলিম শরীফ ঃ ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মাকতাবা রশীদিয়া দিল্লী) খ্রী ঃ ১৯৩৮

* আল-জামে আতরিমিযী ঃ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা (মাকতাবা রশীদিয়া,দিল্লী,তা,বি,)

*সুনানে আবু দাউদ ঃ আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস ইবনে ইসহাক (মাকতাবা রশীদিয়া ,দিল্লী,তা,বি,)

*সুনানে ইবনে মাজাহ ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ : (মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী,তা,বি,)

*নাসাঈ শরীফ ঃ আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব।

*বাদায়া ঃ ৭ম খন্ড

*শরহু সিয়ারিল কবীর ঃ ৩য় খন্ড

*ফতোয়ায় আলমগীরি ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড

*শামী ঃ ১০ম খন্ড

*হিদায়া ঃ ৪র্থ খন্ড

*ইনায়া শরহে হিদায়া ঃ ৮ম খন্ড

*বুরহান ঃ ২য় খন্ড

*দররুল মুখতার ঃ ৩য় খন্ড

*আল-মাবসুত ঃ ১৩শ খন্ড .

* মাযমাউয যাওয়ায়েদ ও মামবাউল ফাওয়ায়েদ ঃ হাফিজ নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবি বাকর আল-হায়সামী:(দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা , বৈরূত , লেবানন, ১৪০৮/১৯৮৮) ৮ম খন্ড।

* মুসনাদে আহমদ

*ফতোয়ায় আলমগীরি ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড

*বায়হাকীর নূর আল ঈমান , মিশকাত থেকে উদ্ধৃত , দামেশক ১৩৮১ খৃঃ ২য় খন্ড

*মুশকিলাতুল ফাকরি ওয়া কাইফা আলজাহাল ইসলাম ঃ ডঃ ইউসুফ

Dhaka University Institutional Repository

আল-কারযভী, (কায়রোঃ মাকতাবায়ে ওহাবা, ১৯৮৬ইং)

*আল-হুকমাতুল ইসলামিয়্যাহ ঃ আহমাদ শালাবী, (কায়রো: দারুল আরব, ১৯৯১ইং)পৃঃ৫৩০।

* বায়হাকী ঃ আবুবকর আহমদ ইবন্ হুসাইন আল - আস-সুনানুল কুবরা (বৈরত ঃ দারুল মাআরিফ , ১৪০৬ হি.) শুআবুল ঈমান ।

*আত-তবাকাতুল কুবরা ঃ মুহাম্মদ ইবনু সাদ : , (বৈরত ঃ দারুল ফিকর , ১৩২৬ হি)

পত্রিকা

*প্রফেসর'স মাসিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স .কারেন্ট নিউজ.কারেন্ট ওয়ার্ল্ড।

* ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ৪৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা পৃঃ ২১৩

*সাপ্তাহিক রোববার , (ঢাকা ঃ২০মে, ১৯৯০ ইং)

* দৈনিক সংবাদ, ঢাকা ঃ১৪ জুলাই,১৯৯৯ ইং

*দৈনিক ইত্তেফাক ,

*দৈনিক প্রথম আলো ,১০ সেপ্টেম্বর ,২০০৩

*দৈনিক ইনকিলাব ১জানুয়ারী ২০০৫:পৃঃ১৫

*দৈনিক যুগান্তর

*দৈনিক সংগ্রাম

*দৈনিক দিনকাল